www.AmarIslam.com

মাওয়ায়িয্-ই নঈমিয়্যাহ

হাকীমূল উম্মত আল্লামা মুফ্তী
আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ্

মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দিন

মাওয়ায়িয্-ই নঈমিয়্যাহ

মুফ্তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

০১. যিকর-ই জামীল
০২. যিকর-ই হাসীন
০৩. সফীনা-ই নূহ আলাইহিস্ সালাম
০৪. মি'রাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
০৫. ইতিহাসের বিরল কাহিনী
০৬. গুলযার-ই দোয়া
০৭. সওয়াবুল ইবাদাত
০৮. মাযহার-ই জামালে মোস্তাফায়ী
০৯. আজমালুল ফাতাওয়া
১০. তাওজীহুল মুফরাদাত

প্রাপ্তিস্থান

- মুহাম্মদী কুতুবখানা
- ত্বো-হা লাইব্রেরী
- মাকতাবাতুল মদীনা
- রেজভী কুতুবখানা
- আরমান লাইব্রেরী
- মাকতাবায়ে আত্তারিয়া
- আল-মদীনা কুতুবখানা

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

- উজ্জীবন লাইব্রেরী

মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

জান্নাত প্রকাশন
চট্টগ্রাম।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.comwww.AmarIslam.com

মাওয়ায়িয-ই নঈমিয়্যাহ

প্রথম খন্ড

মূল

হাকীমুল উম্মত আল্লামা
মুফতী আহমদ ইয়ারখান নঈমী
রাহমাতুল্লাহি আলাইহ

ভাষান্তর

মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দিন
মুহাদ্দিস
ফয়জুল বারী সিনিয়র (ফাযিল) মাদ্রাসা
শাহামীরপুর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
মোবাইল ঃ ০১৮১৮৬৪৯৪৬৮

জান্নাত প্রকাশন
চট্টগ্রাম।

www.AmarIslam.comwww.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাওয়ায়িয-ই নঈমিয়্যাহ

প্রথম খন্ড

প্রকাশনায়
জান্নাত প্রকাশন
শাহামীরপুর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল
রজব - ১৪২৯ হিজরী
জুলাই - ২০০৮ ইংরেজী
শ্রাবণ - ১৪১৫ বাংলা

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে
এট্যাচ
কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
Call # 01816-607269

অভেচ্ছা বিনিময়
১০০.০০ (একশত) টাকা মাত্র

MAWAIZ-E NAYEEMIAH.
Written by: Allama Mufti Ahmad Yar Khan Nayeemi (Roh)
Translated by: Moulana Muhammad Mohiuddin.
Published by: Jannat Prokashan. Chittagong, Bangladesh.
Price: 100.00 Taka Only.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় মেঝ বাবা মরহুম
আবদুল মুত্তালিবের মাগফিরাত কামনায়।
যিনি ০৯-০৪-২০০৮ ইংরেজীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।
আল্লাহ তাঁকে জান্নাতাবাসী করুন।

-অনুবাদক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনুবাদকের আরজ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়া'লার জন্য ; যিনি তাঁর আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাহেরী ও বাতেনী তা'লীম চালু রাখার জন্য ওলামা ও পীর-মাশায়েখের ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন। হক্কানী রাব্বানী ওলামায়ে কেরাম তাঁদের জবান ও কলম দ্বারা, পীর-মাশায়েখ তাঁদের রূহানী ফুয়ূযাত দ্বারা মানুষের আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সত্যের সন্ধান দান করত ওরাসাতুল আম্বিয়ার মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। তাঁদেরই পরশে এসে যুগে যুগে হিদায়তের পরম সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়ে আসছে সত্য সন্ধানীরা। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে যাদের ক্ষুরধার লিখনী, সুদক্ষ অধ্যাপনা ও গঠনমূলক ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে ইসলামের বাগান হয়েছে সুজলা-সুফলা। তাদের মধ্যে হাকীমুল উম্মত, মুফাস্সিরে কুরআন মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ অন্যতম। একদিকে তিনি তাফসীরে নঈমী, নঈমুল বারী ফী ইনশিরাহিল বুখারী, মিরআত শরহে মিশকাত, জা-আল হক, শানে হাবীবুর রহমান ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করে মুসলিম উম্মাহর জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন অপরদিকে তথ্য ও তত্ত্বনির্ভর, বিশ্লেষণধর্মী ওয়াজ ও নসীহতের মাধ্যমেও দেখিয়েছেন আলোর পথ। বিভিন্ন মাহফিলে তিনি যে তাকরীর পেশ করেছেন ওই বিক্ষিপ্ত মুক্তাগুলো একত্রিত করে গ্রন্থকারে উপহার দিয়েছেন গুজরাত পাবলিক হাই স্কুলের স্বনামধন্য ফার্সী শিক্ষক হাফেজ মুহাম্মদ আরেফ সাহেব।

এটাও মুফতী সাহেবের স্বহস্তে লিখিত গ্রন্থাবলীর ন্যায় জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। এর বিষয় ভিত্তিক তাকরীরগুলো ফুয়ূযাতে রাব্বানী, জ্ঞানগত বিশ্লেষণ, মাসআলা সমূহের দলীল, বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত আপত্তি সমূহের অপনোদন এবং আউলিয়ায়ে কেরামের বাস্তব ঘটনাবলীর প্রস্রাবণ। আল্লাহ তায়া'লার রহমত ও হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নজরে করমের উপর নির্ভর করে উর্দু ভাষা থেকে বাংলায় রূপান্তর করে এ গ্রন্থ খানা প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছি। অনুবাদের ক্ষেত্রে কোন ভুলত্রুটি সম্মানিত পাঠক সমাজের দৃষ্টিগোচর হলে অধমকে অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব। মুদ্রাজনিত কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে পাঠক সমাজ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। রাহমানুর রাহীম তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসীলায় ইলম ও মারেফাতের নূর দ্বারা আমাদের অন্তর জগতকে আলোকিত করুন। আমীন!

মুহাম্মদ মহিউদ্দিন
২৭ রজব, ১৪২৯ হিজরী,
৩১ জুলাই, ২০০৮ ইংরেজী,
১৬ শ্রাবণ, ১৪১৫ বাংলা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচিক্রম

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১।	মি'রাজ শরীফ	০৭
০২।	যিক্‌র-ই ইলাহী	১৫
০৩।	রাসূলের অনুগত্য	২০
০৪।	খতমে নবুওয়াত	২২
০৫।	খোদার দরজা	২৮
০৬।	দরূদ শরীফের ফযীলত	৩২
০৭।	ঐক্যের গুরুত্ব	৩৭
০৮।	কাওছারের বিশ্লেষণ এবং আওলাদে রাসূলের ফযায়েল	৪০
০৯।	রোযার ফযীলত	৪৫
১০।	নামাযের ফযীলত	৫০
১১।	মুহাজিরদের বর্ণনা	৫৩
১২।	সাদকার ফযীলত	৫৬
১৩।	ইবাদতের ফযীলত	৬০
১৪।	শবে ক্বদরের বর্ণনা	৬৪
১৫।	না'ত শরীফ	৬৮
১৬।	নবুওয়াতের প্রয়োজনীয়তা	৭৭
১৭।	শাফায়াতের বর্ণনা	৮০
১৮।	কবরের প্রশ্নোত্তরের বর্ণনা	৮৬
১৯।	যিক্‌র-ই মোস্তফার উচ্চতার বর্ণনা	৯২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
২০।	ইস্তিকামত (অবিচলতা)'র বর্ণনা	৯৭
২১।	পয়গাম্বরের আনুগত্য	১০৩
২২।	ঈসালে সওয়াব	১১০
২৩।	নুর নবীর বাশারিয়ত	১১৮
২৪।	ইস্তিগফার ও তাকওয়া	১২৭
২৫।	ইসলামের যথার্থতা	১৩৩
২৬।	রহিতকরণের বর্ণনা	১৪১
২৭।	হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের জীবন	১৪৯
২৮।	হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব	১৫৮
২৯।	ফযায়েলে কা'বা	১৬৬
৩০।	মীলাদ শরীফ	১৭৩-১৭৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ مُحَمَّدِنِ الْمُصْطَفٰى وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ التُّقٰى.

মি'রাজ শরীফ

سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

অর্থ: পবিত্র তিনি যিনি রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছেন তাঁর প্রিয়তম বান্দাকে মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসায়, যার আশেপাশে আমি (প্রচুর) বরকত নাযিল করেছি, যেন আমি তাঁকে আমার কুদরতের নিদর্শনাবলী দেখাই; তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-১)

এই আয়াতে করীমা নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসার ভান্ডার। এতে রয়েছে মি'রাজের ঘটনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এখানে তিনটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য:

১. মি'রাজ কেন হল? ২. কিভাবে হল? ৩. এতে শিক্ষণীয় বিষয় কি পাওয়া গেল?

যে সব কারণে মি'রাজ হয়েছে:

প্রথমতঃ সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামকে যে সমস্ত মর্যাদা পৃথক পৃথকভাবে দান করা হয়েছে তার সব কটি একত্রে দান করা হয়েছে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্সালামকে। হযরত খলীলের জন্য আগুন পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়েছে। অতএব যে দস্তরখানে হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হাত মোবারক পরিষ্কার করেছেন তা চুলোতে জ্বলেনি। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম মৃতলোকদের জীবিত করেছেন, অতএব হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সালামের নামে হযরত জাবিরের দু'সন্তান জীবিত হয়েছে। (দেখুন খারপূতী) হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম মৃতদেরকে জীবিত করে তাঁর সাক্ষ্য নিয়েছেন, অতএব হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম শুষ্ক কাঠ ও কংকরসমূহ দ্বারা তাঁর কলেমা পড়িয়েছেন। হযরত কলীম আলাইহিস্ সালাম লাঠি মেরে পাথর থেকে পানি বের করেছেন, অতএব হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের আঙ্গুলসমূহ থেকে পানির ফোয়ারা সৃষ্টি হয়েছে। হযরত জাবিরের ঘরে স্বল্প খাদ্যে একটু দম করেছেন তখন গুরবা, গোশত ও আটার মধ্যে বরকত হয়েছে। বরং হযরত জাবিরের স্ত্রীর হাতে এই ক্ষমতা হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামেরই কৃপাদৃষ্টিতে এসেছে যে, শত শত মানুষের খাবার (একাই) তৈরী করেছেন। যেহেতু হযরত কলীম (মূসা আ.) তূর পর্বতে মহান রবের সাথে সরাসরি কথা বলেছেন, হযরত মাসীহ (ঈসা আ.) দ্বিতীয় আসমানে তাশরীফ নিয়ে গেছেন; সুতরাং হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের আরো উর্ধ্বদেশে তশরীফ নিয়ে যাওয়া চাই, যা হবে সর্বাপেক্ষা বড় মু'জিযা।

কলীমুল্লাহ (মূসা আ.) তূর পর্বতে কলেমাতুল্লাহ (ঈসা আ.) দ্বিতীয় আসমানে এবং কলেমা'তুল্লাহ অর্থাৎ হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সাল্লাম আরশের উর্ধ্বে তশরীফ নিয়ে যান। কলেমা'তুল্লাহর বরকতসমূহে রয়েছে অনন্য উত্থান।

দ্বিতীয়তঃ সমস্ত নবীগণ খোদার যা'ত (সত্তা) ও সিফাত (গুণাবলী), জান্নাত ও দোযখের সাক্ষ্য দিয়েছেন; কিন্তু কেউ চোখে দেখেননি। অথচ সাক্ষ্যের পূর্ণাঙ্গতা আসে তখনই যখন সাক্ষী ঘটনা স্বচক্ষে দেখে, কিংবা যারা স্বচক্ষে দেখেছে তাদের নিকট থেকে শুনে। অতএব নবীগণের মধ্যে এমন এক বিশেষ সত্তারও প্রয়োজন ছিল যিনি এসব কিছু স্বচক্ষে দেখে আসেন। اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا (আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে) আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এইজন্য হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে 'খাতামুল আম্বিয়া' তথা শেষ নবী বলা হয়েছে। (তাঁর মাধ্যমে) এ সাক্ষ্য চূড়ান্ত ও শেষ হয়েছে। যেন পূর্ববর্তী নবীগণের সাক্ষ্যদান ছিল (اسناد) পরম্পরীণ এবং এই পরম্পরা (اسناد) শেষ হয়েছে হুজুরের মাধ্যমেই।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ তায়া'লা ফরমায়েছেন:

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

(আল্লাহ মো'মিনদের নিকট হতে তাদের প্রাণ ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে)। আল্লাহ ক্রেতা, মুসলমান বিক্রেতা এবং বেচাকেনা হয়েছে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের মাধ্যমে। যার মাধ্যমে বেচাকেনা হয় তার জন্য পণ্য ও মূল্য স্বচক্ষে দেখা প্রয়োজন। সুতরাং বলা হয়েছে- হে মাহবুব! আপনি মুসলমানদের প্রাণ ও সম্পদ প্রত্যক্ষ করেছেন, এখন আসুন, জান্নাত ও দোযখও ঘুরে দেখুন। আমি আপনাকে দেখেছি আপনিও আমাকে দেখে যান। আর হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের দেখা মুসলমানদেরই দেখা। (কেননা তিনি ইমাম যেমন) قِرَاءَةُ الْاِمَامِ قِرَاءَةٌ لَّهٗ (ইমামের ক্বিরাত মুকতাদীর ক্বিরাত)।

চতুর্থতঃ আসমান, জমীন ও সমগ্র সৃষ্টি জগত হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে দান করা হয়েছে اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ (আমি অবশ্যই আপনাকে কাউসার দান করেছি) এই কারণে জান্নাতের দরজায়, পাতায়-পাতায় ও ডাল-পালায় লিপিবদ্ধ রয়েছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। অর্থাৎ এ সব কিছুই সৃষ্টি হয়েছে সর্বশক্তিমানের কুদরতের কারখানায় আর ওগুলো দান করা হয়েছে 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ'র মালিকানায়। নিয়ম হল-যার বস্তু তারই নাম থাকে ওতে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার অভিপ্রায় হল-মালিককে তাঁর মালিকানায় প্রদত্ত সব কিছু দেখাবেন।

পঞ্চমতঃ

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا

جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود

অর্থাৎ হে হাবীবে খোদা! যখন স্বয়ং আল্লাহ তায়া'লা আপনার নিকট থেকে গোপন থাকেননি, তখন এমনই কি আছে যা আপনার নিকট থেকে গোপন থাকতে পারে? আপনাকে জানাই লক্ষ-কোটি দরূদ।

মি'রাজ কিভাবে হল:

নবুওয়াত প্রকাশের এগার বছর ছ'মাস পর রজবের সাতাশ তারিখ সোমবারের রজনীতে হযরত উম্মে হানী (রা.)'র গৃহ থেকে হয়েছে পবিত্র মি'রাজ। এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা যা বুখারী, মুসলিম ইত্যাদিতে বর্ণিত হয়েছে এই- রজবের সপ্তবিংশ রজনীর শেষ ভাগ, বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচাত বোন উম্মে হানী বিনতে আবু তালেবের গৃহে বিশ্রাম করছিলেন তখন হযরত জিবরীল আমীন বোরাক ও যাত্রীদলসহ আল্লাহর পয়গাম নিয়ে উপস্থিত হন। তার কর্পূরী পাখা পা মোবারকের তালুতে ঘষে হুজুর আলাইহিস্ সালামকে জাগ্রত করলেন এবং আল্লাহ তায়ালার পয়গাম পৌছালেন। বক্ষ মোবারক বিদীর্ণ করতঃ যমযমের পানি দ্বারা ক্বলব

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মোবারককে ধৌত করলেন। অতঃপর ফয়েযের ভান্ডার ঐ বক্ষকে হিকমত ও নূর দিয়ে পূর্ণ করলেন। তারপর কাউসারের পানি দিয়ে গোসলের ব্যবস্থা করলেন। হুজুরকে বেহেশতী পোশাক পরিয়ে বর সাজালেন। আরোহণের জন্য বোরাক পেশ করা হল যার বিদ্যুৎ গতি আমাদের বিবেক-উপলব্ধির বাইরে।

تھا براق نبی یا کہ نور نظر　　یہ گیا وہ گیا اور نہاں ہو گیا

অর্থাৎ প্রিয়নবীর বোরাক ছিল নূরের একটি ঝলক, এই এল এই গেল, দেখতে না দেখতেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

হযরত জিবরীল লাগাম ধরলেন ইস্রাফীল আলাইহিস্ সালাম পিছনে অবস্থান নিলেন। চতুর্দিক থেকে বোরাককে ঘিরে ধরল ফেরেশতাগণ। মক্কা মোয়াজ্জমা থেকে মহাসমারোহে রওয়ানা হল হুজুরের সওয়ারী। মুহূর্তের মধ্যে এসে পৌছল বায়তুল মোকাদ্দাস। ওখানে সমস্ত নবী, রাসূল ও ফেরেশতাগণকে দেখতে পেলেন যাঁরা অভ্যর্থনার জন্য হাজির রয়েছেন এবং নামাযের প্রস্তুতি চলছে। ইমামুল আম্বিয়ার (নবীদের ইমাম) অপেক্ষায়। হুজুর এসে পৌছার সাথে সাথেই সবাই জানালেন ইসলামী অভিবাদন। সমস্ত নবী ও ফেরেশতাগণ মুকতাদী হয়ে পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যান। ইমামত করলেন হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম। সোবহানাল্লাহ! কি অনুপম নামায, নবীগণ মুকতাদী ইমামুল আম্বিয়া ইমাম, প্রথম কেবলা জায়নামায মুকাররব ফেরেশতাগণ প্রচারক। আযান ও ইকামত বললেন জিবরীল আলাইহিস্ সালাম।

نماز اسری میں تھا یہ ہی سر　　عیاں ہو معنی اول و آخر

کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر　　جو سلطنت پہلے کر گئے تھے

অর্থাৎ মি'রাজের নামাযে নিহিত ছিল এই রহস্য-প্রিয়নবীর দু'টি নাম 'আওয়াল' (প্রথম) ও 'আখির' (শেষ)'র অর্থ যেন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইতোপূর্বে যারা রাজত্ব করে গেছেন আজ তাঁরা হাত বেঁধে (বিনীতভাবে) পিছনে দন্ডায়মান।

এই নামায থেকে অবসর হওয়ার সাথে সাথে আকাশ ভ্রমণের প্রস্তুতি। সেই বোরাক, সেই যাত্রীদল, সেই বর, সেই বরযাত্রী। মুহূর্তের মধ্যে প্রথম আসমানে এসে পৌছেন। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর সন্তানকে আদর করলেন। দীর্ঘদিন পর আশা পূরণ হল, বললেন, মারহাবা (স্বাগতম)! একের পর এক আসমানসমূহ অতিক্রম করতে থাকেন দ্বিতীয় আসমানে হযরত য়াহয়া ও ঈসা আলাইহিস সালাম, তৃতীয় আসমানে হযরত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

য়ূসুফ আলাইহিস সালাম, চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্রীস আলাইহিস সালাম, পঞ্চম আসমানে হযরত হারূন আলাইহিস সালাম, ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম, সপ্তম আসমানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হুজুরের সাক্ষাত লাভে ধন্য হন। ওখান থেকে অতিক্রম করার পর সামনে এল সিদরা যা হযরত জিবরীল আলাইহিস সালামের শেষ প্রান্ত। তারপর অবস্থা হল এই–

بغور صدا سایہ بندھا　　یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا

صفوف سامنے سجدہ کیا　　ہوئی جو اذان تمہارے لئے

ইয়া রাসূলাল্লাহ! মি'রাজের রজনীতে আসমানী জগতে আপনার জন্য যে আযান প্রচারিত হয়েছে তাতে আসমানে গভীরভাবে গুঞ্জন উঠে, সিদরায় উঠার পর আরশ ঝুকে পড়ে এবং আসমানের সারিগুলো সাজদাবনত হয়ে যায়।

জিবরীল আমীন সম্মুখে যেতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। হুজুর ফরমালেন, জিবরীল! এটা সফরসঙ্গীর নিয়ম নয় যে, সঙ্গ ছেড়ে দিবে। তিনি আরজ করলেন–

اگر یک سر موئے برتر پرم　　فروغ تجلی بسوزد پرم

অর্থাৎ যদি এক চুল পরিমাণও অগ্রসর হই তা হলে আল্লাহর তাজাল্লীর নূরে আমার পাখা জ্বলে যাবে।

অতঃপর যিনি নিয়েছেন (আল্লাহ) তিনি জানেন এবং যিনি গমন করেছেন (মাহবূব) তিনি জানেন-কোথায় গমন করেছেন। ওখানে গমন করেছেন যেখানে 'কোথায়' ছিল না।

کسے ملے گھاٹ کا کنارہ　　کدھر سے گذرے کہاں اتارا

بھرا جو مثل نظر طرارا　　وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے!

অর্থাৎ কে পাবে এ ঘাটের কূল কিনারা? কোন দিক দিয়ে গমন করলেন কোথায় নামলেন? পূর্ণ ব্যাপারটাই যেন দৃষ্টির লাফ ঝাঁপ। তিনি তো তাঁর চক্ষু থেকেও লুক্কায়িত ছিলেন।

আল্লাহ কি দিয়েছেন, মাহবূব কি নিয়েছেন? আল্লাহ কি বলেছেন, মোস্তফা কি শুনেছেন; হাবীব ও মাহবূব প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে কি গোপন আলাপ হয়েছে তা ঐ দাতা এবং এই গ্রহীতাই জানেন। কুরআন করীমেও এই রহস্য খুলে বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে– فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (অতঃপর তিনি তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করবার তা ওহী করলেন) তবে এতটুকু জানা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গেছে যে, ওখানে গুনাহগার উম্মতদের আলোচনাও এসেছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দিন-রাতের মধ্যে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের মোবারক তোহফা পাওয়া গেছে। প্রত্যাবর্তনের সময় হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের আবেদনের প্রেক্ষিতে পাঁচ ওয়াক্ত করে কমতে কমতে কেবল পাঁচ ওয়াক্ত অবশিষ্ট রইল। তা ছাড়া এই ভ্রমণে জান্নাত ও দোযখও পরিদর্শন করেছেন। যে ঘটনাবলী কিয়ামতের পর সংঘটিত হবে তা ওই রজনীতে প্রত্যক্ষ করেছেন। অতএব একদল লোক দেখতে পেলেন যারা গরম পাথর খাচ্ছে। জিবরীল আলাইহিস্ সালাম আরজ করলেন, এরা কৃপণ ধনী যারা সম্পদের যাকাত আদায় করতো না। এক দলকে দেখলেন যারা রক্তের সাগরে দাঁড়িয়ে আছে। জিবরীল আলাইহিস সালাম আরজ করলেন, এরা সুদখোর যারা গরীবদের রক্ত চুষে খেতো। একদলকে দেখতে পেলেন যাদের জিহবা ও ওষ্ঠ কাঁচি দ্বারা কেটে ফেলা হচ্ছে। জিবরীল আলাইহিস্ সালাম আরজ করলেন, এরা বেআমল আলেম যাদের কথা ও কাজের মিল ছিল না। কতেক লোককে দেখতে পেলেন যাদের নখ ছিল তামার, যা দিয়ে তারা তাদের শরীর ও চেহারায় আঁচড় দিচ্ছে। হযরত জিবরীল (আ.) বললেন, এরা চোগলখোর ও পরনিন্দাকারীগণ।

মি'রাজের ঘটনায় নিহিত সূক্ষ্ম রহস্যাবলী:

এক. নবুওয়াতের মিয়াদকাল ২৩ বছর। তার অর্ধেক সাড়ে এগার বছরে মি'রাজ হয়েছে। নবুওয়াতের সন রবিউল আউয়াল থেকে শুরু যার ঠিক মাঝখানে রয়েছে রজব। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সপ্তাহ শুরু হয় জুমাবার থেকে। সোমবার ঠিক তার মধ্যখানে অবস্থিত। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই নবীর ধর্ম মধ্যপন্থী ধর্ম এবং এই নবীর উম্মত মধ্যপন্থী উম্মত। وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ (এইভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হও) অতএব মি'রাজ রজব মাস ও সোমবারের রজনীতে হয়েছে।

দুই. হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের জন্ম, হিজরত, মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ, নবুওয়াত প্রকাশ, মি'রাজ ও ওফাত যাবতীয় বিষয় সোমবারে হয়েছে। এই জন্য এই দিনের নাম يوم الاثنين (দ্বিতীয় দিন) এবং হুজুরের স্তর হল–

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

অর্থাৎ আল্লাহর পর আপনিই মহান (আপনারই স্থান), কথা শেষ। মোটকথা, দ্বিতীয় স্তর বিশিষ্টকে দ্বিতীয় দিনে প্রত্যেক নে'মত দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে। এইজন্য উর্দূভাষীরা এই দিনকে বলে পীর। সপ্তাহের সমস্ত দিন এই দিনের ফয়েয গ্রহীতা এবং এই দিন ফয়েযদাতা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিন. মি'রাজ রাত্রিবেলায় হয়েছে, তাও সপ্তবিংশ রজনীর শেষ ভাগ। না শত্রুরা জানতে পেরেছে না বন্ধুরা। এর দু'টি কারণ। প্রথমতঃ মি'রাজে রয়েছে মিলন এবং মিলনের জন্য রাতই উপযোগী। এইজন্য ইবাদত-বন্দেগী ও গোপন আলাপের জন্য রাতকেই উপযোগী মনে করা হয়। দ্বিতীয়তঃ আজ হাকীকতে মুহাম্মদিয়া মূলরূপে প্রকাশিত হয়েছে কোন্ চোখের এমন ক্ষমতা যে, তাঁকে দেখতে পারবে? হ্যাঁ এই জলওলা ধারণ করতে সক্ষম ছিল ফেরেশতাদের চোখই। তাদের মধ্যেও সঙ্গলাভ করতে পেরেছে শক্তি অনুযায়ী।ওই রজনীতে হুজুরের উপমা ছিল সূর্যের মত। যতই উপরে উঠতে থাকে ততই কিরণ (নূর) বাড়তে থাকে।

معراج کی شب ہمراہ ہیں سب سدرہ آیا کوئی نہ رہا
سدرہ سے بڑھے جبریل رہے تنہا ہیں جو عرش خدا پایا

অর্থাৎ মি'রাজের রজনীতে যারা হুজুরের সাথে ছিলেন সিদরা পর্যন্ত আসতে আসতে কেউ ছিল না। যখন সিদরা থেকে অগ্রসর হলেন তখন জিবরীলও ছিলেন না। তিনি একাই আল্লাহর আরশে গিয়ে পৌছেন।

চার. বায়তুল মুকাদ্দাসে নবীদের ইমামতি করেছেন। কারণ তিনি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে নবীয়্যুল আম্বিয়া ও ইমামুল হারামাইন উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। আরো ইরশাদ হয়েছে هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ আজ তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যে, পূর্ববর্তী বাদশাহগণ মুকতাদী হয়ে পিছনে উপস্থিত রয়েছেন।

পাঁচ. আসমানসমূহে আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হল-বোরাক এত দ্রুতগামী হওয়া সত্ত্বেও তার গতি ছিল শ্লথ। আম্বিয়ায়ে কেরাম এখনই বায়তুল মুকাদ্দাসে ছিলেন এবং এখনই অভ্যর্থনার জন্য আসমানের স্ব স্ব স্থানে পৌছে যান। এ থেকে প্রতীয়মান হল–আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আরওয়াহে মুকাদ্দাসার (পবিত্র আত্মাসমূহ) গতি দৃষ্টির গতির চেয়েও দ্রুততম।

ছয়. প্রথমতঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর সায়্যিদুনা মূসা আলাইহিস্ সালামের বারবার আবেদনের প্রেক্ষিতে পাঁচ ওয়াক্তই বাকী রইল। এতে কিছু রহস্য (হিকমত) রয়েছে। প্রথমতঃ মানুষ যেন জানতে পারে যে, আরওয়াহে মুকাদ্দাসা মৃত্যুর পরেও জীবিতদের সাহায্য করতে পারে। মূসা আলাইহিস্ সালামের সাহায্যে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত রয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ মূসা আলাইহিস্ সালাম যেন প্রত্যক্ষ করেন- হুজুরকে সেই মর্যাদা দান করা হয়েছে যে, তিনি নির্বিঘ্নে আল্লাহর দরবারে হাজির হচ্ছেন, না

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আছে রোযার শর্ত, না জুতা মোবারক খোলার নির্দেশ। তৃতীয়তঃ আরশে মুআল্লা যেন বার বার নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চরণের বরকত লাভের সুযোগ পায়। চতুর্থতঃ মূসা আলাইহিস্ সালাম আরজ করেছিলেন رَبِّ أَرِنِيْ (প্রভু আমাকে দর্শন দাও) তখন তো সুযোগ হয়নি। আজ মোস্তফা আলাইহিস্ সালামের মাধ্যমে যেন ভালভাবে খোদার দর্শন লাভ করেন।

সাত. মি'রাজ প্রসঙ্গে অনভিজ্ঞ লোকদের কিছু আপত্তি রয়েছে। প্রথমতঃ ভারী শরীর শূন্যে উপরের দিকে উঠতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ মাঝখানে অগ্নিমণ্ডল ও হিমমণ্ডল রয়েছে, তা অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ আসমানে দরজা নেই, প্রবেশ কিভাবে হল? চতুর্থতঃ হাজার বছরের পথ এত স্বল্প সময়ে কিভাবে অতিক্রম করলেন যে, প্রত্যাবর্তনের পর দেখা গেল শিকল নড়তে আছে এবং বিছানা মোবারকও গরম রয়েছে। এসব কিছুর জবাব ফকিরের পাথরের ন্যায় একটাই যে, হুজুর নূর এবং নূরের জন্য এগুলো কোন বিষয় নয়। দৃষ্টির নূর দরজা ছাড়া চশমা দিয়ে বের হয়ে যায়; মুহূর্তের মধ্যে আসমানে গিয়ে ফিরে আসে, না জ্বলে যায় না শীতল হয়ে পড়ে।

আয়াতের গূঢ় তত্ত্বাবলীঃ

এই আয়াতকে 'সোবহানাল্লাযী' দ্বারা এইজন্য শুরু করা হয়েছে যে, পরবর্তী বিষয় অত্যন্ত বিস্ময়কর।

আরবের নিয়ম হল-আশ্চর্য বিষয়কে সোবহানাল্লাহ দ্বারা শুরু করা হয়। তা ছাড়া উদ্দেশ্য এও রয়েছে যে, কেউ যেন উল্লেখিত আপত্তিসমূহের ভিত্তিতে মি'রাজকে অস্বীকার না করে। এর প্রতি যেন দৃষ্টি দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা অক্ষমতা ও অপারগতা থেকে পবিত্র এবং এই কর্ম তাঁরই।

এখানে হুজুরকে 'আবদিহী' বলেছেন 'রাসূলিহী' কিংবা 'নাবিয়্যিহী' বলেননি কেননা স্থান অনুযায়ী উপাধি দ্বারা স্মরণ করা হয়। আল্লাহর নিকট থেকে পৃথিবীতে আগমন করবেন তখন রাসূল হিসেবে, এবং পৃথিবী থেকে আল্লাহর দরবারে হাজির হবেন তখন শানে আবদিয়ত নিয়ে। তা ছাড়া আবদ ফানা ফিল মাওলা হয়ে থাকে যে, তার জান ও মাল সব কিছুই মবিবের। হুজুরকে 'ফানাফিল্লাহ'র মাকাম দান করা হয়েছে যা বেলায়তের সর্বোচ্চ মাকাম। মি'রাজ ভ্রমণের শুরু مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এবং শেষ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى, অর্থাৎ দূরবর্তী মসজিদ, ওটা বায়তুল মুকাদ্দাস হোক কিংবা বায়তুল মা'মুর। লক্ষ্য لِنُرِيَهٗ (যেন আমি তাঁকে দেখাই)।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যিক্‌র-ই ইলাহী

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়। (সূরা রা'দ, আয়াত-২৮)

প্রত্যেক রোগের একটা চিকিৎসা আছে। কুরআন করীম যা জগতের জন্য شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ (অন্তরের ব্যাধির উপশম) যাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ববাসীকে দান করেছেন; দিচ্ছেন অন্তরের অস্থিরতার চিকিৎসা। যে কারণে রোগ হয় ওই কারণ দূরীভূত করার নামই চিকিৎসা। অন্তরের অস্থিরতা কেন হয়? অনেক সময় অধিক গুনাহের কারণে অন্তরের অস্থিরতা হয়ে থাকে। মাসনভী শরীফে রয়েছেঃ

ہرچہ آید بر تو از ظلمات و غم　　ایں ز بے باکی و گستاخی ست ھم

ابر نہ آید از پے منع زکوۃ　　وز زنا افتد وبا اندر جہات

অর্থাৎ তোমার প্রতি যে অমানিশা ও চিন্তা এসে পৌঁছে ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্যই তার কারণ। যাকাত না দেয়ার ফলে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্যভিচারের কারণে দিগ্বিদিক মহামারী ছড়িয়ে পড়ে।

কুরআন করীমে ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

(তোমাদের যে বিপদ আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন)

এবং আল্লাহর যিক্‌র গুনাহের জন্য এইরূপ যেমন ময়লার জন্য পানি।

ذکر حق پاکی ست چو پاکی رسید　　رخت بربندد برون آید پلید

অর্থাৎ আল্লাহর যিকির হচ্ছে পবিত্রতা, যখন পবিত্রতা এসে পৌঁছে তখন ময়লা বের হয়ে যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতএব গুনাহর ময়লা দ্বারা ক্বলবের দুর্ভাবনা সৃষ্টি হয় এবং যিক্‌রের পবিত্রতা দ্বারা ক্বলবে প্রশান্তি আসে। ইসলাম মুসলমানদের জীবনকে আল্লাহর যিক্‌র দ্বারা এভাবে পরিবেষ্টন করে দিয়েছে যে, কোন সময় তা থেকে খালি নেই। যখন শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন তার কানে আযান দাও, তাকবীর বল। মা শিশুকে কোলে নিয়ে খাওয়াবে তখন আল্লাহর নাম নিয়ে খাওয়াবে। যখন শিশু বোধসম্পন্ন হবে তখন সে আল্লাহকে স্মরণ করবে।

ذکرش کردن از بے خردی است وصفش کردن از کم عقلی است

অর্থাৎ জ্ঞান হওয়ার পূর্ব থেকেই আল্লাহর যিক্‌র করতে হবে, একটু একটু বিবেক-বুদ্ধি হতেই তার গুণগান করতে হবে।

সকালে উঠবে তখন প্রথমে নামায পড়বে। শয়ন করার সময় নামায পড়ে শয়ন করবে মোটকথা সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করবে। মৃত্যুবরণ করার সময় খোদার নাম নিয়ে মৃত্যুবরণ কর। গোসল, কাফন ও দাফনের সময় আল্লাহর যিক্‌র কর। মোটকথা, জীবনকে আল্লাহর স্মরণে পরিবেষ্টিত করে রাখো। যেন শুরুও আল্লাহর স্মরণের উপর হয় এবং শেষও।

প্রত্যেক অঙ্গের যিক্‌র আলাদা আলাদা। জিহবার যিক্‌র আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা, কুরআনের তিলাওয়াত ও সত্য বলা। অন্তরের যিক্‌র ভাল ইচ্ছা ও ক্বলব জারী হওয়া, চোখের যিক্‌র আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা, আল্লাহর নিদর্শনসমূহ দেখা, পরনারী ও পরসম্পদে প্রতি দৃষ্টিপাত না করা। হাতের যিক্‌র দুর্বলদের সাহায্য করা, কুরআন করীম স্পর্শ করা। পায়ের যিক্‌র হল আল্লাহর প্রীতিভাজনদের যেয়ারত, মসজিদ ও বরকতপূর্ণ স্থানসমূহে গমন করা। মোটকথা প্রত্যেক অঙ্গের যিক্‌র আলাদা আলাদা, এর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

যিক্‌র তিন প্রকার। ১. যিক্‌রে আ'ম (সাধারণ যিক্‌র) ২. যিক্‌রে খাস (বিশেষ যিক্‌র) ৩. যিক্‌রে খাসুল খাস (অতীব বিশেষ যিক্‌র)।
যিক্‌রে আ'ম হল মৌখিক যিক্‌র, যিক্‌রে খাস হল ক্বলব জারী হওয়া (মৌখিক যিক্‌রের পাশাপাশি ক্বলবের যিক্‌রও চলা) এবং খাসুল খাস হল পূর্ণ কল্পনাই যিক্‌রে রূপান্তরিত হওয়া।

تجھے ہی کو دیکھنا، تیری ہی سننا، تجھے میں گم ہونا
حقیقت، معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ তোমাকেই দেখা, তোমারই কথা শোনা, তোমার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া তরীকতপন্থীগণ এটাকেই বলে হাকীকত ও মা'রেফাত।

হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের পবিত্র নামসমূহের মধ্যে একটি নাম রয়েছে 'যিকরুল্লাহ'। যদি তা উদ্দেশ্য হয় তখন অর্থ হবে–আমার মাহবূবের বরকতে অশান্ত অন্তরে প্রশান্তি আসে।

ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو
جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں

অর্থাৎ তাঁর কোন প্রেমিক যতই দুঃখে থাকুক না কেন যখন তাঁর কথা স্মরণ হয় তখন সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হয়ে যায়। এটা কেন? এটা এইজন্য যে, মাহবূবে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে প্রত্যেক আত্মার সম্পর্ক ও ভালবাসা রয়েছে এবং প্রেমাস্পদের স্মরণ রোগের মহৌষধ لِقَاءُ الْخَلِيْلِ شِفَاءُ الْعَلِيْلِ তা ছাড়া পবিত্র হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

اَنَا نُوْرٌ مِّنْ نُوْرِ اللّٰهِ وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِنْ نُوْرِىْ

(আল্লাহর নূর হতে আমার নূর সৃজিত আর সমস্ত সৃষ্টি আমার নূর হতে সৃজিত)। এ থেকে প্রতীয়মান হল– অস্তিত্বশীল প্রত্যেক কিছুর মূল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

تو اصل وجود آمدی از نخست دگر ہر چہ موجود شد فرع تست

অস্তিত্বের মূলরূপে আদি থেকে আপনি হয়ে আছেন বিরাজিত,
অন্যান্য যা কিছু অস্তিত্বময় আপনার শাখা-প্রশাখা রূপে প্রসারিত।

প্রত্যেক কিছু তার মূলে পৌছে শান্ত হয়। এই জন্য মূল জন্মভূমিতে পৌছে প্রত্যেক ব্যক্তি শান্তি লাভ করে। এই কারণে ভারী বস্তু তার কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয় এবং কেন্দ্রে পৌছে স্থিতিশীল হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জগতের কেন্দ্রবিন্দু।

এই আমল পরীক্ষিত-হৃৎকম্প রোগীর বুকে যেন লিখে দেয়া হয়:

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তাছাড়া অস্থির এবং যার উপর জিনের প্রভাব পড়েছে তার কানে যেন আযান দেয়া হয়। যাতে তাঁর নামের বরকতে প্রশান্তি আসে। এইজন্য দাফনের পর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কবরের উপরও আযান দেয়া হয়, যেন জিন ছেড়ে যায়, মূর্দার অন্তরে প্রশান্তি আসে এবং মুনকার ও নকীরের উত্তরদানে সহায়ক হয়।

কাহিনী: মাসনভী শরীফে রয়েছে-এক বাদশাহ সুন্দরী এক দাসী ক্রয় করেছিল এবং তার রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু দেখা গেল যে, দাসী অসুস্থ। অনেক ধরনের চিকিৎসা করল কিন্তু যতই ঔষধ প্রয়োগ করছে ততই রোগ বাড়তে আছে। বাদশাহ বলল, যদি এই দাসী মারা যায় তা হলে আমার বেঁচে থাকাও অর্থহীন। একদিন সে স্বপ্নে দেখল যে, কোন উক্তিকারী বলছে-অমুক পথ দিয়ে তোমার এখানে একজন সিদ্ধপুরুষ আসবেন যিনি কুলবের ডাক্তার। তার হাতে এই দাসী আরোগ্য লাভ করবে। তারপর তো বাদশাহর জন্য রাত কাটা কঠিন হয়ে পড়ল। অতি প্রত্যুষে বাদশাহ ওই পথে গিয়ে অবস্থান নেয় যা স্বপ্নে দেখেছিল। হঠাৎ নূরানী আকৃতির এক বুযর্গ আসতে দেখল। বাদশাহ তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে নিয়ে এল। আপ্যায়ন করার পর মনের বাসনা ব্যক্ত করল। তিনি রোগিনীর শিয়রে বসে জানতে পারলেন যে, এটা প্রেমের রোগী। তার শিরায় হাত রেখে একজনকে বলল, দেশসমূহের নাম নিতে শুরু কর। যখন সে বুখারা দেশের নাম উল্লেখ করল, তখন বললেন, বেশ, থামো। এখন ওই এলাকার জনপদগুলোর নাম বলে যাও। সে বলতে আরম্ভ করল, একটি জনপদের নাম যখন উল্লেখ করল তখন রোগিনীর চেহারা লাল হয়ে যায়। বললেন, থামো! ওই জনপদের মহল্লাগুলোর নাম উল্লেখ কর। একটি মহল্লার নাম উল্লেখে রোগিনীর অবস্থায় আরো পরিবর্তন দেখা দেয়। বললেন,এই মহল্লার ঘরগুলো উল্লেখ কর। একটি ঘরের নাম উল্লেখ করতেই রোগিনী চোখ খুলে দেয়। অতঃপর বললেন, ওই ঘরের মানুষগুলোর নাম উল্লেখ কর। এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতেই রোগিনীর মুখ হতে হঠাৎ 'উহ্' শব্দ বের হল এবং চক্ষু দিয়ে অশ্রু বয়ে পড়ে। অতঃপর ডাক্তার বাদশাহকে বললেন, এটা প্রেমের রোগী সে বোখারার অমুক জনপদের অমুক ব্যক্তির প্রেমে পড়েছে। কেননা বোখারার নাম শুনে তার শিরার নড়াচড়ায় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তারপর ওই জনপদ, মহল্লা ও ব্যক্তির নাম শুনে সে স্পন্দিত হয়ে উঠে।

হে মুসলমান! এতো এক রূপক প্রেমের কাহিনী। যদি তুমি আরবের নাম শুনে হর্ষোল্লাসিত না হও, যদি হেজাযের নাম শুনে তোমার মধ্যে স্পন্দন সৃষ্টি না হয়, যদি মদীনা পাকের নাম এবং ওখানকার রাস্তাঘাট ও হাট-বাজারের আলোচনা শুনে তোমার মধ্যে তেজ না আসে, যদি মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আলোচনা শুনে তোমার মধ্যে স্পন্দন না আসে তা হলে তুমি এই রূপক প্রেমিক নারীর চেয়েও দুর্বল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মানুষ তো বিবেকসম্পন্ন, প্রাণীরা যেমন, উট, হরিণ ইত্যাদিও হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের নিকট ফরিয়াদ করেছে। তাঁর বিচ্ছেদে ক্রন্দন করেছে শুষ্ক কাঠ এবং মিলনে লাভ করেছে শান্তি ও আরাম। যেমন উস্তনে হান্নানা।

রূহের দেশ আলমে আরওয়াহ (আত্মার জগৎ) শরীরের দেশ আলমে আজসাম (জড় জগৎ)। দেশের চিঠি এলে প্রত্যেকে আনন্দ পায়। অতএব আল্লাহর যিক্র রূহের দেশের যিক্র, এতে তৃপ্তি ও শান্তি পাওয়াই স্বাভাবিক।

মাওলানা আহমদ আশরফ সাহেবের নিকট তাবিজ লিখার সময় জনৈক ওহাবী আপত্তি করল। তিনি বললেন, পেঁচা, গাধা, শুকর। এটা শুনে রাগে ওহাবীর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন মাওলানা বললেন নিকৃষ্টতম সৃষ্টির নামের মধ্যে যদি এইরূপ প্রভাব থাকে যে, আপনার রাগ এসে যায় তাহলে সৃষ্টিকর্তার নামের মধ্যেও অবশ্যই প্রভাব রয়েছে যে, এ দ্বারা রোগ সরে যায় এবং আরোগ্য আসে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাসূলের আনুগত্য

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

হে হাবীব! বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৩১)

প্রত্যেক কিছুর পরীক্ষা ও আজমায়েশ হয়ে থাকে। এই আয়াতে ওই ভ্রান্ত দাবীদারদের পরীক্ষা রয়েছে যারা বলতো نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ (আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়)। তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের এ দাবীর দলীল পেশ কর। আমার অনুসরণ কর। আনুগত্য ও অনুসরণ তিন ধরনের হয়ে থাকে। ১. ইতাআত বিল খাওফ (اطاعت بالخوف) অর্থাৎ ভয়ে আনুগত্য করা। ২. ইতাআত বিল গরয (اطاعت بالغرض) অর্থাৎ কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আনুগত্য করা। ৩. ইতাআত বিল মুহাব্বত (اطاعت بالمحبت) অর্থাৎ প্রেম ভক্তি সহকারে আনুগত্য করা। এই তিন প্রকার আনুগত্যের মধ্যে ইতাআত বিল মুহাব্বতই উত্তম। কারণ তা অন্তর থেকে হয়ে থাকে এবং স্থায়ী। এইজন্য আয়াতকে 'মুহাব্বত' (ভালবাসা) দ্বারা শুরু করা হয়েছে। এটা বলা হয়নি যে, اِنْ كُنْتُمْ تَخَافُوْنَ اللّٰهَ (যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর)। তাছাড়া আনুগত্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। অনুসৃত ব্যক্তির ভালবাসা লাভ করার জন্য, অনুসৃত ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইত্যাদি। এখানে আনুগত্য হবে ভালবাসা লাভ করার জন্য। মুহাব্বত (ভালবাসা)ও দু'ধরনের হয়ে থাকে। ১. মুহাব্বতে ত্বারয়ী (স্বভাবগত ভালবাসা) ২. মুহাব্বতে সববী (কারণগত ভালবাসা)। ত্বাবয়ী সববী থেকে উন্নততর। যেমন, সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার ভালবাসা। ওই ভালবাসাই এখানে প্রয়োজন। যেমন, ইরশাদ হয়েছে–

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

(তোমাদের মধ্যে কেউ মো'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি (রাসূল) তার কাছে নিজের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তর হব না) এখানে বিপরীতে মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততির কথা উল্লেখ করা তা-ই

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রমাণ করছে। আল্লাহ তায়া'লার ফজলে এটা প্রত্যেক মুসলমানের রয়েছে। প্রত্যেক মা তার আদরের সন্তানকে ধর্মত্যাগী হওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। اِتَّبِعُوْنِىْ এর অর্থ হল-পদাঙ্ক অনুসরণে পিছনে পিছনে চলে এসো। অর্থাৎ ভাই হয়ে সাথেও এসো না এবং পিতা হয়ে আগেও এসো না। বরং গোলাম হয়ে পিছনে পিছনে চলে এসো। ওই বগিগুলোই ভ্রমণ করতে পারে যেগুলো ইঞ্জিনের পিছনে থাকে। যদি কিছু বগি রেল বিন্যাসের সময় ইঞ্জিনের সম্মুখে লেগে যায়। তা হলে ওগুলো ওখানেই বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকে যাবে। এ থেকে প্রতীয়মান হল–ঈমান ও আমল দু'টোই প্রয়োজন। অনুসরণ (ইত্তেবা') দ্বারা যাহেরী (বাহ্যিক) ও বাতেনী (প্রচ্ছন্ন) উভয় ধরনের অনুসরণকে বুঝানো হয়েছে। বাতেনী ইত্তেবা' তো ধ্যান ধারণা, আক্বীদা ইত্যাদিকে নিরাপদ রাখা। যাহেরী ইত্তেবা হল প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ প্রকাশ পাওয়া।

ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا
تصور میں تیرے رہنا عبادت اسکو کہتے ہیں

অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার দরবারে যাতায়াত করাকে বলা হয় রেয়াযত (সাধনা) এবং আপনার ধ্যানে মগ্ন থাকাকে বলা হয় ইবাদত।

এই আয়াতে يُحْبِبْكُمُ কে اِتَّبِعُوْنِىْ দ্বারা এবং اِتَّبِعُوْنِىْ কে تُحِبُّوْنَ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ভালবাসা তিন প্রকার। ১. মাহাত্ম্য সহকারে ভালবাসা (محبت مع عظمت) যেমন, পিতার প্রতি সন্তানের ভালবাসা। ২. ছোট জ্ঞানে ভালবাসা (محبت مع تحقير) যেমন, সন্তানের প্রতি পিতার ভালবাসা যাকে মমতা বলা হয়। ৩. সাম্য জ্ঞানে ভালবাস (محبت مع مساوات) যেমন, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা এবং বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালবাসা। اِتَّبِعُوْنِىْ বাতলে দিয়েছে যে, এখানে মাহাত্ম্য সহকারে ভালবাসার প্রয়োজন যার মধ্যে অনুসরণ থাকে। ভালবাসার দাবী করে সাম্যের বুলি যেন না আওড়ায়।

قل کہہ کر اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی
اتنی ہے تیری گفتگو اللہ کو پسند

অর্থাৎ 'কুল' বলে আল্লাহ তাঁর কথাও আপনার মুখ হতে শুনেছেন, আপনার কথা তাঁর এতই পছন্দ।

'কুল' বলে ইঙ্গিতে ফরমায়েছেন যে, হে মাহবুব! কথা তো আমার কিন্তু (প্রকাশের জন্য) আপনার মুখ চাই। আমার পয়গাম আপনার মুখে বান্দা পর্যন্ত পৌছে দিন। কেননা, আপনার মুখ নিঃসৃত না হলে তা সৃষ্টির জন্য 'ওয়াজিবুল আমল' (আমল করা অপরিহার্য) নয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খতমে নবুওয়াত

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا.

মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষনবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সূরা আহযাব, আয়াত-৪০)

এই আয়াতের শানে নুযুল হল এই যে, হযরত যায়দ ইবনে হারেসা (রা.) তাঁর স্ত্রী যয়নবকে তালাক দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। যার আলোচনা এই আয়াতে রয়েছে– فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا (অতঃপর যায়দ যখন যয়নবের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে আপনার সাথে পরিণয় আবদ্ধ করলাম)। সোবহানাল্লাহ! সমস্ত নারীদের বিবাহ তো হয়েছে পৃথিবীতে, কিন্তু হযরত যয়নব সেই সৌভাগ্যবতী স্ত্রী যার বিবাহ হয়েছে রাব্বুল আলামীন কর্তৃক আসমানে। হযরত যায়দ যেহেতু হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের পোষ্যপুত্র ছিলেন এইজন্য কাফিরগণ আপত্তি তুলল, হুজুর তাঁর পুত্রবধূকে বিবাহ করেছেন। তাদেরকে উত্তর দেয়া হয়েছে–আমার মাহবূব তো কোন পুরুষের পিতা নন, অতঃপর যায়দের স্ত্রী তাঁর পুত্রবধূ কিরূপে হলো? কাউকে মুখে পুত্র বললে সে পুত্র হয় না। না তর্কা পায়, না অপরাপর বিষয়ে পুত্রের বিধান চালু হয়।

এই আয়াতে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে:

এক. সমগ্র কুরআনে কোন স্থানে হুজুর আলাইহিস্ সালামকে তাঁর মোবারক নাম ধরে ডাকা হয়নি।

یا آدم است باپدر انبیاء خطاب　　　یا ایها النبی خطاب محمد است

অর্থাৎ পিতা আদম আলাইহিস্ সালামকে সম্বোধন করা হয়েছে 'ইয়া আদমু' বলে এভাবে অপরাপর নবীগণকেও। আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে 'ইয়া আয়্যুহান্নাবীয়্যু' বলে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চারটি স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও হুজুরকে নাম মোবারক দ্বারা স্মরণ করা হয়নি। হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের গুণাবলী দ্বারাই আলোচনা ও ডাকা হয়েছে। এক স্থান তো এখানে, দ্বিতীয়তঃ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ সূরা আলে ইমরানে, তৃতীয়তঃ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ সূরা মুহাম্মদে, চতুর্থতঃ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ সূরা ফাতহে। এটা কেন? এটা এই জন্য যে, কুরআন করীমের কোনখানে যদি এইরূপ না হতো তা হলে পবিত্র কুরআন দ্বারা তাঁর পূর্ণ পরিচিতি হতো না। কারণ পূর্ণ পরিচয় নাম দ্বারাই হয়ে থাকে। এইজন্য বিবাহের মধ্যে বর কনের নাম উল্লেখ করা হয়। এটা কিরূপে হতে পারে যে, হুজুর তো খোদার পূর্ণ পরিচয় দান করবেন এবং খোদা হুজুরের পরিচয় দান করবেন অসম্পূর্ণ? তা ছাড়া কুরআন পূর্ণাঙ্গ ঈমান শিক্ষা দিয়েছেন এবং ঈমানের জন্য হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের নাম জানা জরুরী। এইজন্য কলেমায়ে তৈয়বায় নামই আসে। যদি কেউ নামের স্থলে অন্য কোন গুণবাচক নাম দিয়ে কলেমা পড়ে এবং তাঁর নাম না জানে তা হলে সে মো'মিন হবে না। (রূহুল বয়ান, এই আয়াত প্রসঙ্গ) অতএব ঈমানের পূর্ণাঙ্গতার জন্য নাম মোবারক আসার প্রয়োজন ছিল।

এছাড়াও যদি দ্ব্যর্থহীনভাবে নাম মোবারক না আসতো তা হলে কোন বেদ্বীন এটা বলার সুযোগ পেয়ে যেতো যে, এই কুরআন হুজুরের উপর অবতীর্ণ হয়নি। বরং এই গুণাবলীর বুযর্গ অন্য কেউ অন্য কোন দেশের ছিল। এইজন্য পরিষ্কার হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যেন কোন বেদ্বীনের জন্য এই সুযোগ না হয়। যেহেতু محمد এর মধ্যে চারটি বর্ণ রয়েছে সেহেতু চার স্থানে নাম মোবারক বর্ণনা করা হয়েছে।

দুই. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম আল্লাহ তায়া'লার নামের ন্যায় অধিক। এমনকি রূহুল বয়ানের গ্রন্থকার উভয়ের নাম এক হাজার এক হাজার বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সত্তাগত (ذاتی) নাম হল মুহাম্মদ ও আহমদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আল্লাহর সত্তাগত নামের সাথে محمد শব্দের অধিক মিল রয়েছে। ওখানে বর্ণ ৪টি, হরকত রয়েছে ৩টিতে এবং একটি তাশদীদযুক্ত এখানেও একই ধরনের। তবে ওখানে তাশদীদের উপর রয়েছে খাড়া জবর কিন্তু এখানে নেই যা থেকে প্রতীয়মান হল-তিনি বাদশাহ, ইনি প্রধানমন্ত্রী।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর মধ্যে বারটি বর্ণ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এর মধ্যে বারটি বর্ণ। অনুরূপভাবে ابو بكر الصديق (আবু বকর আস সিদ্দীক), عمر ابن الخطاب (ওমর ইবনুল খাত্তাব), عثمان ابن عفان (উসমান ইবনে আফফান), علی ابن

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ছয়. যে ব্যক্তির শুধু কন্যা সন্তানই হয় কোন পুত্র সন্তান হয়না কিংবা সন্তান জীবিত থাকে না, সে যেন গর্ভাবস্থায় নিয়ত করে যে, আমি এই শিশুর নাম মুহাম্মদ রাখব। ইনশাআল্লাহ তার পুত্র সন্তান হবে এবং জীবিত থাকবে। অনুরূপভাবে অন্তঃসত্তা স্ত্রীর পেটের উপর যেন প্রতিদিন আঙ্গুল দ্বারা লিখে দেয়- هٰذَا الْبَطْنُ فَاسْمُهٗ مُحَمَّدٌ

যে খাবার টেবিলে মুহাম্মদ নামের কোন ব্যক্তি থাকবে ওই খাবারে বরকত হবে। যে ব্যক্তি হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের ভালবাসায় সন্তানের নাম মুহাম্মদ রাখবে সে জান্নাতী। হযরত সোলতান মাহমূদ একবার আয়াযের পুত্রকে যার নাম ছিল মুহাম্মদ, নাম ধরে ডাকেননি বরং ইবনে আয়ায (আয়াযের পুত্র) বলে ডাকলেন আয়ায আরজ করল, আজ গোলামের কি অপরাধ হল যে, আমার পুত্রকে নাম ধরে ডাকেননি। তিনি বললেন, তখন আমার অযু ছিল না এবং তোমার ছেলের নাম মুহাম্মদ। আদবের খাতিরে এই নাম মুখে উচ্চারণ করিনি।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের যুগে এক ব্যক্তি একশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছে। লোকেরা তাকে অপরাধী জেনে জানাযার নামায ছাড়াই দাফন করে দিয়েছে। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের প্রতি নির্দেশ হল-আপনি তার নামায পড়ান তারপর তাকে দাফন করুন। কেননা সে তাওরাতের মধ্যে মুহাম্মদ শব্দ দেখলে চুম্বন করত। এইজন্য আযানের মধ্যে মুহাম্মদ শব্দ শুনলে বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করা হয় যা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের সুন্নাত। ফাতাওয়া শামীর মধ্যে এর অনেক ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। (বিস্তারিত জানার জন্য আমার গ্রন্থ জা'আল হক দেখুন)

সাত. এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হল-কারো অধিকার নেই যে, হুজুর আলাইহিস্ সালামকে পিতা বলে ডাকবে, ভাই বলা তো দূরের কথা। কুরআন করীমে ইরশাদ হচ্ছে, لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (রাসূলের আহবানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহবানের মত গণ্য কর না)। এ থেকে প্রতীয়মান হল-যে উপাধিসমূহ দ্বারা একে অপরকে আহবান করে, আব্বা, ভাইয়া, চাচা ইত্যাদি বলে আহবান কর না। তা ছাড়া পিতার ছেলে মেয়েরা হারাম হয়ে থাকে এবং পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়ে থাকে সন্তান। কিন্তু হুজুর আলাইহিস্ সালামের সন্তানগণও হারাম নয় এবং কেউ হুজুরের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও নয় (যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে)। এছাড়া পিতার সাক্ষ্য সন্তানের বেলায় গ্রহণযোগ্য নয় কিন্তু হুজুর উম্মতের সাক্ষী وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا (রাসূল তোমাদের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জন্য সাক্ষী স্বরূপ হবেন) এ থেকে প্রতীয়মান হল-নবী আলাইহিস্ সালাম পুরুষদের পিতা নন। এ ছিল বাহ্যিক (যাহেরী) বিধান। নচেৎ প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সমস্ত পিতা তাঁর চরণে উৎসর্গ। যেখানে পিতা পুত্রের খবর নিবে না ওখানে তিনি সাহায্য করবেন।

جب ماں اکلوتے کو بھولے آ آ کہہ کے بلاتے ہیں یہ

অর্থাৎ কিয়ামতের কঠিন মুহূর্তে যখন মা তার একমাত্র সন্তানকে ভুলে যাবে তখন আয় আয় বলে ডাকবেন এই প্রিয়নবী।

নবী উম্মতের জন্য হুকমী পিতা হয়ে থাকেন। এইজন্য তাঁদের স্ত্রীগণ সবার জন্য হারাম। সুতরাং আয়াতের মর্ম হল এই-আমার নবী শারীরিক দিক থেকে কোন পুরুষের পিতা নন। তবে আত্মিক (রূহানী) দিক থেকে খাতামুন নাবিয়্যীন অর্থাৎ রূহানী পিতা। এইজন্য তাঁর পুত্র সন্তান বাকী রাখা হয়নি। যদি থাকতেন নবী হতেন এটা তো সম্ভব নয় কারণ হুজুর শেষ নবী। তা ছাড়া তাঁর উত্তরাধিকার এইজন্য বণ্টন করা হয়নি যে, তা দেয়া হলে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমানকে দিতে হবে, এটা সম্ভব নয়। যদি কতেককে দেয়া হয় তাহলে রূহানী আওলাদ তো সবাই, কতেককে উত্তরাধিকার কেন দেয়া হবে? এইজন্য হুজুরের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কারণ সন্তানকে যাকাত দেয়া জায়েয নেই। যদি মুসলমানদেরকে দেন তারা তো হুকমী আওলাদ। যদি কাফিরদেরকে দেন, তারা তো কাফির, যাকাতের ব্যয়খাত নয়।

খতম (خَتْم) এর অর্থ-মোহর অথবা শেষ। মোহরও যুক্ত হয় শেষে। তা ছাড়া মোহর যুক্ত হওয়ার পর কোন কিছু পার্সেল ইত্যাদিতে ঢুকানো যায় না। হযরত আদম ও অন্যান্যদের উদ্দেশ্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং উদ্দেশ্য বস্তুর অস্তিত্বের কারণ হয়ে থাকে কিন্তু আত্মপ্রকাশে বস্তুর পরে। যেমন সিংহাসনের জন্য অধিষ্ঠান এবং বৃক্ষের জন্য ফুল। এইজন্য হুজুর প্রথমও এবং শেষও। هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ (দেখুন, মাদারিজুন নবুওয়াতের ভূমিকা) তা ছাড়া পরিবর্তনশীল বস্তুর শেষ অবশ্যই থাকে। যেমন মানবদেহের জন্য বার্ধক্য। নবুওয়াত নবীদের মধ্যে পরিবর্তন হতে থাকে এবং তা শেষ হয়েছে হুজুর আলাইহিস্ সালামের উপর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খোদার দরজা

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا.

যখন তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে তখন তারা আপনার নিকট আসলে ও আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে (সুপারিশ করলে) তারা আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে। (সূরা নিসা, আয়াত-৬৪)

রোগীকে আরোগ্যের জন্য ডাক্তারের নিকট যেতে হয় এবং ব্যবস্থাপত্র (প্রেসক্রিপশন) অনুযায়ী চলতে হয়। এই আয়াতে গুনাহের রোগীদেরকে দো'জাহানের ডাক্তার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। যে হাসপাতালের অবস্থা হল এই-রোগী আসলে কেউ সিদ্দীক হয়ে, কেউ ফারুক, কেউ যুন্নূরাইন, কেউ হায়দরে কাররার আসাদুল্লাহ হয়ে বের হয়। যাকে যেখানে ধর্মপ্রচারের জন্য পাঠানো হতো ওই দেশের সীমান্তে পৌঁছতেই ওখানকার ভাষা আপনা আপনি আয়ত্বে এসে যেতো। (দেখুন, খরপূতী)

এই আয়াতে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে:

এক. هُمْ এর ব্যাপকতা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে-প্রত্যেকের জন্য ওখানকার উপস্থিতি অপরিহার্য। ظَلَمُوْا এর ব্যাপকতা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে-যে কোন ধরনের জুলুম হোক, শিরক হোক, কুফর হোক, ধর্মত্যাগ হোক, যে কোন গুনাহ হোক না কেন ওখানকার উপস্থিতি অপরিহার্য। এটা হাসপাতাল নয় যেখানে শুধু চোখ-কান কিংবা হাত-পায়ের চিকিৎসা হয়। এটা তো সেই হাসপাতাল যেখানে ক্বলব, আত্মা, হাত, পা, নাক, কান ইত্যাদি সব কিছুরই চিকিৎসা হয়। এক বহমান সাগর, যতই ময়লাযুক্ত মানুষ আসবে এবং এখানে ডুব দিবে পরিষ্কার হয়ে যাবে। اِذْ এর ব্যাপকতা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে-এই নির্দেশ কেবল তাঁর জীবদ্দশায়ই ছিল না। বরং কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত রোগীদের জন্য সাধারণ ঘোষণা যে, উপস্থিত হলে আরোগ্য লাভ করবে। এই হাসপাতাল কখনো বন্ধ হয় না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুই. এ থেকে এও প্রতীয়মান হল-ওফাতের পরেও হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম তাঁর উম্মতের অবস্থাদির জ্ঞান রাখেন। নচেৎ কুরআন করীম কি এমন দরবারে পাঠাচ্ছে দেওয়ালের পিছনের জ্ঞানও যার নেই? এ থেকে আরো প্রতীয়মান হল-ওফাতের পরেও পবিত্র আত্মাসমূহ ফয়েয পৌঁছান।

তিন. جَاؤُكَ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে-গুনাহ্ মার্জনার জন্য প্রিয়নবীর দরবারে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সবার তো ওখানে যাওয়ার শক্তি নেই। তাঁর রহমতের ব্যাপকতায় এটা অকল্পনীয় যে, কেবল মদীনাবাসী ও ধনী লোকেরাই ওখানে যাবে এবং তাদের মধ্যেই রহমত সীমাবদ্ধ থাকবে! তিনি তো এমন দয়ালু যে, একদা নারীদের সমাবেশে যখন শিশুদের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারীদের সওয়াবের কথা বর্ণনা করছিলেন তখন এক মহিলা যার কোন শিশু মারা যায়নি; তার প্রশ্নের উত্তরে ফরমায়েছিলেন, তাঁকে বেহেশতে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমার। অতএব এই আয়াতে جَاؤُكَ দ্বারা অন্তরের উপস্থিতিকে বুঝানো হয়েছে। আবু জাহল মক্কায় অবস্থান করা সত্ত্বেও দূরে ছিল। আর হযরত ওয়াইস ক্বরনী ইয়েমেনে থাকা সত্ত্বেও নিকটে ছিলেন। নিজের সন্তান যতই দূরের থাকুক না কেন; অন্তরেই থাকে। শত্রু যতই নিকটে থাকুক না কেন; দূরেই থাকে।

گرچه صد مرحله دورم زبہ پیش نظرم
وجهه فی نظری کل غداة وعشی

অর্থাৎ যদিও শত শত মাইল দূরে কিন্তু চোখের সামনেই আছি, তার চেহারা প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যা অর্থাৎ, সবসময় আমার দৃষ্টিতেই আছে।

دوران باخبر در حضور   نزدیکان بے بصر دور

দূরে থেকেও যারা খোঁজ খবর রাখে মূলতঃ তারা নিকটেই পক্ষান্তরে নিকটে থেকেও যারা চোখ তুলে তাকায় না মূলতঃ তারা দূরে।

হাদীস مَدِيْنَتُنَا كِيْرٌ يَنْفِيْ خُبْثَهٗ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ (আমাদের মদীনা একটি হাপর যা তার জংকে সেভাবে দূরীভূত করে দেয় যেমন কামারের হাপর লোহার মরিচাকে দূরীভূত করে দেয়) দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। যদি কোন অসৎলোক মদীনা পাকে মৃত্যুবরণও করে দাফনের পর তাকে বের করে দেয়া হবে। যেমন মুহাম্মদ হোসাইন হযরত শাহ আবদুল হক মুহাজিরে এলাহাবাদীকে জিজ্ঞেস করেছিল এবং স্বপ্নে জান্নাতুল বকী'র মধ্যে এই দৃশ্য দেখেছিল। (যে, কতেক লাশকে জান্নাতুল বকী' থেকে বের করে কোথাও নিয়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যাওয়া হচ্ছে এবং কতেক লাশকে বাইর থেকে এনে ওখানে দাফন করা হচ্ছে) এর আরো প্রমাণ রয়েছে জৌনপুরের ছেলেদ্বয়ের ঘটনা–একজন ডেপুটি হয়েছিল এবং একজন সাধারণ শিক্ষক। ডেপুটি হজ্বে গমন করে। মাওলভী সাহেবকে নিয়ে যায়নি। তিনি একজন ইংরেজের গৃহে যার স্ত্রী ছিল মুসলমান; তার কন্যাকে পড়ানোর জন্য গৃহশিক্ষকের দায়িত্ব নেন। তারপর যখন তিনি হজ্বে যান তখন দেখতে পান মদীনা মুনাওয়ারায় ডেপুটি সাহেবের কবরে রয়েছে ওই ইংরেজ কন্যা এবং জৌনপুরে ইংরেজ কন্যার কবরে ছিল ডেপুটি সাহেব।

চার. কতেক জ্ঞানশূন্য লোক বলে থাকে, ফজরের নামাযের পর মুসাফাহা (কমমর্দন) করা নিষেধ। কারণ মুসাফাহা সাক্ষাতের সময় করতে হয় আর এটা তো বিদায়ের সময়। কিন্তু তারা এটা জানে না যে, সাক্ষাৎ তো হয় অনুপস্থিত থাকার পর। অনুপস্থিতি দু'প্রকার–শারীরিক ও আত্মিক।

নামাযীগণ যদিও একই স্থানে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছে কিন্তু আত্মিকভাবে অনুপস্থিত। তাদের জন্য কথা বলা, পানাহার করা ইত্যাদি সবই হারাম। এইজন্য নামাযে সালামের নির্দেশ রয়েছে–ইমাম মুক্তাদীগণকে সালাম করার নিয়ত করবে এবং মুক্তাদী ইমাম ও অপরাপর নামাযীগণকে। বলুন, এ সালাম কিসের? সালামও তো সাক্ষাতের সময় হয়ে থাকে। প্রতীয়মান হল–এরা অন্যজগত থেকে আসছে, অতএব সালামও হল, মুসাফাহাও।

পাঁচ. এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হল–সবাই শাফাআতের মুখাপেক্ষী। কেননা গুনাহ তো করেছে আল্লাহর কিন্তু উপস্থিত হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে মোস্তফা আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের দরবারে এবং বলা হয়েছে فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ অর্থাৎ আপনার দরবারে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর নিকট নিজ নিজ গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং আপনিও আপনার নূরানী ওষ্ঠদ্বয় নাড়া দিয়ে তাদের জন্য সুপারিশ করবেন, তা হলে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। প্রতীয়মান হল–কেবল আমল যথেষ্ট নয়, কেননা ইসতেগফারও তো একটি আমল। কিন্তু এটা সত্ত্বেও নবীর দরবারের উপস্থিতি আবশ্যক। এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হল– কেবল আমলের অসীলা যথেষ্ট নয়। আমল তো ক্ষমা লাভের অসীলা এবং হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম আমল কবুল হওয়ার অসীলা।

ছয়. এ দ্বারা বুযর্গানে দ্বীন হতে সাহায্য প্রার্থনার মাসআলাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, পৃথিবীতে অভাবী ধনীর নিকট, রোগী ডাক্তারের নিকট, প্রজা রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। আ'কায়ে দো'জাহান হলেন দানশীল ও দাতা, আমরা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁর মুখাপেক্ষী। তা হলে কেন তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হবে না? এইজন্য হযরত মা'ইয সম্বোধন করতঃ আরজ করেছেন, يَارَسُوْلَ اللّٰهِ طَهِّرْنِيْ (ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন) হযরত রবীআহ ইবনে কা'ব আসলামীকে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম ফরমায়েছেন, سَلْ চাও তিনি আরজ করলেন اَسْئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ (আমি জান্নাতে আপনার গোলামী চাই)। হুজুরের দরজা আল্লাহরই দরজা এবং দরজায় দাঁড়িয়েই তো ভিক্ষা করা হয়। এইজন্য গুনাহ তো করেছে আল্লাহর এবং পাঠানো হয়েছে নবীর দরজায়। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر!
جو وہاں سے ہوں یہیں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

অর্থাৎ, খোদার কসম! এটাই খোদার দরজা, আর কোন পালাবার স্থান ও ঠাঁই নেই। ওখান থেকে যা পাওয়া যাবে তা এখানে এসে পাওয়া যাবে এবং যা এখানে নেই তা ওখানেও নেই।

گربا منی دور یمنی پیش منی گربے منی و پیش منی در یمنی

অর্থাৎ, অন্তরঙ্গতা নিয়ে সুদূর ইয়েমেনে থাকলেও সম্মুখে এবং অন্তরঙ্গতা বিহীন সম্মুখে থাকলেও সুদূর ইয়েমেনে। ফরমায়েছেন جَاؤُكَ (আপনার নিকট আসলে) جَاؤُا الْمَدِيْنَةَ (মদীনায় আসলে) বা جَاؤُا عِنْدَكَ (আপনার সমীপে আসলে) বলেননি। এ থেকে প্রতীয়মান হল–গুনাহগার যখনই গর্দান ঝুকিয়ে নিবিষ্ট হবে নবীর দরবারে হাজির হয়ে যাবে। তা ছাড়া হুজুর প্রত্যেক মুসলমানের নিকট রয়েছেন لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ (তোমাদের নিকট রাসূল এসেছেন)। এইজন্য জনশূন্য ঘরে যখন যাবে তখন হুজুরকে সালাম দিবে। কিন্তু আমরা হুজুর হতে অনুপস্থিত, নির্দেশ দেয়া হয়েছে তোমরাও উপস্থিত হয়ে যাও।

এই আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, ওই গুনাহগার আপনার নিকট এসে আল্লাহকে পেয়ে যাবে এবং পাবে কি হিসেবে কাহ্হার হিসেবে নয়, জাব্বার হিসেবে নয় বরং তাওয়াব (ক্ষমাশীল) হিসেবে। তখন وَجَدَ অর্থ হবে اَصَابَ যা মুতাআদ্দী বয়েক মাফউল (এক কর্ম সম্বলিত সকর্মক ক্রিয়া) এবং توابا رحيما হবে حال (যা কর্মের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য এসেছে)।

اللہ کو بھی پایا مولیٰ تیری گلی میں

অর্থাৎ, আ'কা! আল্লাহকেও পেয়েছি আপনার দরবারে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দরূদ শরীফের ফযীলত

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)'র প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। হে মো'মিনগণ! তোমরাও নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর এবং তাঁর প্রতি যথাযথভাবে সালাম প্রেরণ কর। (সূরা আহযাব, আয়াত-৫৬)

কুরআন করীমে আল্লাহ্ অনেক বিধান দিয়েছেন কিন্তু কখনো এটা বলেননি-এ কাজ আমিও করি, ফেরেশতাগণও করে এবং তোমরাও তা কর। কিন্তু দরূদ শরীফ কেমন নির্দেশ? এর জন্য এসব কিছুই ইরশাদ করা হয়েছে। ব্যাপার হল-যে বিষয়ের নির্দেশ গুরুত্ব সহকারে দিতে হয় তখন বাদশাহ্ প্রজাগণকে বলেন, আমিও এইরূপ করি, আমার মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীগণও, হে প্রজাবৃন্দ! তোমরাও কর। অধিকন্তু এমন কোন কাজ নেই যা স্রষ্টারও হবে, সৃষ্টিরও হবে। আমাদের কর্মসমূহ থেকে আল্লাহ্ পবিত্র, তাঁর কর্মসমূহ আমরা করতে পারিনা। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত আমাদের কাজ এবং সৃষ্টি করা, মৃত্যু ঘটানো, রিযিক দান করা আল্লাহ্র কাজ। তবে দরূদ শরীফই এমন কাজ যা আল্লাহ্রও এবং সৃষ্টিরও। এইজন্য নির্দেশের পূর্বে তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। হুজুর সেই চন্দ্র যার প্রতি রয়েছে স্রষ্টার দৃষ্টি এবং যার প্রতি তাকায় সৃষ্টিও। এই আয়াতে প্রথমতঃ রহমত নাযিল করার সংবাদ রয়েছে, তারপর রহমতের তরে দোয়া করার নির্দেশ। প্রশ্ন হল-ওই বস্তু চাওয়া হয় যা অর্জিত হয়নি, যখন প্রতিটি ক্ষণে প্রতিটি মুহূর্তে রহমত নাযিল হচ্ছে যেমন এই বাক্য স্থায়িত্ব (دوام و استمرار) ও নতুনত্ব (تجدد) কে চাই, আবার তার জন্য দোয়া করা তো ভরাপাত্র ভরা (تحصيل حاصل) কিন্তু ব্যাপার হল এই- ভিক্ষুকদের নিয়ম হচ্ছে তারা ধনী লোকের দরজায় গিয়ে গৃহবাসীর জান ও মালের হিফাজত ও উন্নতির জন্য দোয়া করে, উদ্দেশ্য ভিক্ষা। অনুরূপভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে-হে ফকীরগণ! যখন তোমরা আমার দরবারে আসবে আমি তো সন্তান-সন্ততি থেকে পবিত্র, ঘর-বাড়ি থেকে পবিত্র; তবে আমার একজন মাহবুব রয়েছেন তাঁর মঙ্গল প্রার্থনা করতঃ আসবে। তা হলে যে রহমতের বর্ষণ তাঁর প্রতি হচ্ছে তোমাদের প্রতিও এক ছিটা [illegible] দেয়া হবে, তোমাদের কপাল ফিরে যাবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দরূদ শরীফ কেন পড়ি? এর কতিপয় কারণ রয়েছে। হাদীস শরীফে আছে-যখন তোমরা কারো গৃহে দাওয়াত খেতে যাবে তখন গৃহবাসীকে দোয়া করবে। প্রতীয়মান হল-দোয়াও ইহসানের (উপকার) শুকরিয়া। হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের কোটি কোটি ইহসান রয়েছে, তার শুকরিয়া হল এই দোয়া যা দরূদ শরীফে রয়েছে। এইজন্য বলা হয়েছে-যে ব্যক্তি হুজুরের পবিত্র নাম শুনবে এবং দরূদ পড়বেনা সে কৃপণ। যখন কেউ দরূদ পড়ে তখন ফেরেশতাগণ হাদিয়াস্বরূপ তার দরূদ হুজুরের মহান দরবারে এই বলে পেশ করেন যে, ইয়া হাবীবাল্লাহ! আপনার অমুক গোলাম, অমুকের পুত্র, অমুক দেশের অধিবাসী দরূদের হাদিয়া পেশ করছে। এ অপেক্ষা বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে যে, মনিবের দরবারে আমরা ফকিরদের নাম উল্লেখ করা হবে? হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)কে একদা হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম ফরমায়েছেন, খোদা ওয়ান্দ কুদ্দুস আমাকে ফরমায়েছেন যে, আমি তোমার মুখ থেকে পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত শুনব। তিনি আরজ করলেন, রাব্বুল আলামীন কি আমার নাম নিয়েছেন? হুজুর ফরমালেন, হ্যাঁ, তখন তিনি ক্রন্দন করতে শুরু করেন।

চার. যদি কোন ব্যক্তি কোন দোয়া না করে সর্বক্ষণ দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকে তা হলে ইনশাআল্লাহ তার দোয়া করার কোন প্রয়োজনীয়তাই দেখা দিবে না। কোন দোয়া ও নামায দরূদ ছাড়া কবুল হয়না। এইজন্য দোয়া করা হয় মধ্যখানে এবং আগে পরে থাকে দরূদ শরীফ। কেননা দরূদ শরীফ নির্ঘাত কবুল হয়, খোদার রহমতে আশা করা যায় যে, তিনি মাঝখানের দোয়াও ফেরত দিবেন না।

পাঁচ. নামাযের মধ্যে আত্তাহিয়্যাত ও দরূদ পড়া থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে-হুজুরের ধ্যানে নামায ভঙ্গ হয়না। বরং তাঁর স্মরণ ছাড়া নামাযই হয়না, কারণ আত্তাহিয়্যাত এর মধ্যে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং দরূদের মধ্যে হুজুরের জন্য দোয়া। এটা কিরূপে হতে পারে যে, তাঁকে সম্বোধন করা হবে, তাঁর সাথে কথা বলবে কিন্তু তাঁর খেয়াল আসবে না। আশিয়্যাতুল লুমআতে রয়েছে- নামাযী এটাই খেয়াল করবে যে, হুজুরকে সালাম দিচ্ছি এবং হুজুর স্বয়ং শুনছেন। কেননা জগতের প্রতিটি অণুকণাতে তিনি বিরাজমান।

কতেক আলেমগণ বলেন, যদি কোন নামাযীকে হুজুর তলব করেন তা হলে তার জন্য নামায ত্যাগ করে হুজুরের আনুগত্য করা ওয়াজিব। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(হে মো'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আহবানে সাড়া দিবে যখন রাসূল তোমাদেরকে আহবান করেন) ব্যাপক। অধিকন্তু এতে নামাযীর নামায নষ্ট হবে না। কেননা সে কথা বলেছে তো কার সাথে বলেছে? যার সাথে কথা বলা নামাযের মধ্যে ওয়াজিব এবং কা'বা থেকে ফিরে গেছে, তো কোনদিকে ফিরেছে? যিনি কা'বারও কা'বা।

ছয়. সমস্ত দোয়া দ্বারা অভাব পূরণ হয়। কিন্তু দরূদ দ্বারা হুজুরকে পাওয়া যায় যিনি অভাব পূরণকারী। একদা সোলতান মাহমূদ নির্দেশ দিলেন-এখানকার সমস্ত কিছু তোমরা লুটে নাও। সবাই তো মাল কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে যায় কিন্তু আয়ায সোলতানের মাথায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। সোলতান বললেন, আয়ায! তুমি মাল কুড়াচ্ছনা কেন? সে বলল, আমি হুজুরকে নিয়েছি। যখন আমি আপনাকে পেয়ে গেলাম, সব কিছুই পেয়ে গেলাম।

دنیا کو مبارک ہو دنیا اللہ کرے وہ مجھ کو ملیں
ہر سر میں جن کا سودا ہے ہر دل جن کا شیدائی ہے

অর্থাৎ, পৃথিবী বরকতময় হোক, আল্লাহ করুন-আমি যেন পৃথিবীতে তাঁকেই পাই যার অনুরাগ রয়েছে প্রত্যেক মাথায় এবং যার প্রেম রয়েছে প্রতিটি অন্তরে।

সাত. সোলতান মাহমূদ গাযনভীর যুগে এক ব্যক্তির কর্জ তার ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। (কর্জদারগণ কাযীর দরবারে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। কাযী দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে ওই দিনেই কর্জ আদায় করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে) লোকটি অনন্যোপায় হয়ে বেশী করে দরূদ শরীফ পাঠ করতে লাগল। স্বপ্নে হুজুরের যিয়ারত লাভে ধন্য হয়। নিদের্শ হল-সোলতানের নিকট গিয়ে বল; হুজুর বলেছেন, আমার কর্জগুলো আদায় করে দিন। (এটা যে হুজুরের কথা তার) নিদর্শন হল এই যে, তুমি ফজরের পূর্বে আমার উপর যে দরূদ পাঠ কর যা কেউ জানে না; তা কবুল। সে রাজ দরবারে গমন করল এবং নিজের স্বপ্নের বৃত্তান্ত সোলতানের নিকট ব্যক্ত করল। সোলতান ভাবাবেগের (وجد) মধ্যে এসে তাকে এভাবে তাওয়াফ করতে লাগলেন যেভাবে হাজী কা'বাকে তাওয়াফ করে। অতঃপর লোকটি তার কর্জের ঘটনা বর্ণনা করল। বাদশাহ কোষাধ্যক্ষকে নির্দেশ দিলেন-তার সমুদয় কর্জ আমার পক্ষ থেকে আদায় করে দাও। কোষাধ্যক্ষ কারণ জিজ্ঞেস করল। বাদশাহ পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন। কোষাধ্যক্ষ আরজ করল, এই কর্জ আমি আদায় করে দেব। যখন কাযীর নিকট এই সংবাদ পৌছল তখন সে বলল, আমি আদায় করব। কর্জদারগণ শুনে [illegible]। মোটকথা, কর্জও মাফ হয়ে গেল এবং

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উল্লেখিত ব্যক্তিত্রয় হতে টাকাও পাওয়া গেল। ফলে লোকটি প্রচুর মালদার হয়ে গেল।

جب آ گئی ہیں جوش رحمت پر ان کی آنکھیں
جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں

অর্থাৎ, যখন তাঁর নয়নযুগল রহমতের তরঙ্গে এসে গেলো তখন (মর্মজ্বালায়) জ্বলন্তকে নিভিয়ে দিল, ক্রন্দিতের মুখে হাসি ফুটালো।

হযরত সুফয়ান সাওরী (রহ.) বলেন, আমি হজ্বের মধ্যে এক ব্যক্তিকে প্রত্যেক স্থানে শুধু দরূদ পড়তে দেখলাম। কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম। পথের মধ্যে তার পিতা ইন্তেকাল করেছিল। চেহারা (বিকৃত হয়ে কালো হয়ে যায়। তখন এ ছিল জঙ্গলের মধ্যে নিঃসঙ্গ ও চিন্তিত-স্বপ্নে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের যিয়ারত লাভে ধন্য হয়। হুজুর তাওয়াজ্জুহ দিয়ে মাইয়েতকে (মৃতদেহ) ভাল করে দিলেন। সে (এর কারণ) জিজ্ঞেস করল। ইরশাদ হল- তোমার পিতা ছিল বড় গুনাহগার কিন্তু বেশী করে দরূদ শরীফ পড়তো। (রূহুল বয়ান)

এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে-সমস্ত ফেরেশতা দরূদ পড়ে। কিন্তু বিশেষভাবে সত্তর হাজার ফেরেশতা সারাদিন এবং এই পরিমাণ ফেরেশতা সারা রাত রওযা শরীফে হাজির হয়ে দরূদ সালাম পাঠ করে।

কতেক স্থানে দরূদ শরীফ পড়া নিষেধও রয়েছে। অনুরূপভাবে নবীগণ ছাড়া অন্য কারো প্রতি স্বতন্ত্রভাবে দরূদ পড়া নিষেধ। صَلُّوْا এর ব্যাপকতা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে-সব ধরনের দরূদ পড়া জায়েয, যদিও (হাদীসে) বর্ণিত দরূদ উত্তম। যেমন كُلُوْا وَاشْرَبُوْا এর ব্যাপকতা থেকে প্রত্যেক খাদ্যের বৈধতা প্রমাণিত, যদিও (হাদীসে) বর্ণিত খাদ্য যবের রুটি, খেজুর ইত্যাদি খাওয়া উত্তম। অনুরূপভাবে ঔষধ ও সওয়ারী যা বর্ণিত হয়েছে তা উত্তম, যা বর্ণিত হয়নি তা বৈধ। দরূদ শরীফের বরকতে বিধ্বস্ত কাজ ভাল এবং ভালকাজ আরো ভাল হয়ে যায়। এইজন্য প্রত্যেক ঔষধের শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ পড়া উচিৎ। মাসনভী শরীফে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শরীরে কখনো মাছি বসেনি। কিভাবে বসবে, সে তো ভবঘুরে, আবর্জনায়ও বসে। আর এই দরবারে ভবঘুরের কোন স্থান নেই। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি প্রত্যেক সভার শোভায় পরিণত হয় ভাল মন্দ প্রত্যেক সাহচর্যে বসে, তাকেও এখান থেকে বের করে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেয়া হয়। কিন্তু মৌমাছি হুজুরের দরবারে উপস্থিত হতো, কোন সময় পোশাক মোবারকে কুরবান হতো এবং কোন সময় শরীর মোবারকে উৎসর্গ হতো। একবার মৌমাছি হুজুরের খেদমতে উপস্থিত ছিল। হুজুর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মৌমাছি! বল, তোমরা মধু কিভাবে তৈরী কর? তারা বলল, ইয়া হাবীবাল্লাহ! আমরা বেল, চাঁপা, গোলাপ, জুঁই ইত্যাদি সব ধরনের ফুলের রস চুষে নিই। যখন আমাদের ঘরে এসে উগরে ফেলি তখন তা মধু হয়ে যায়। এতে প্রশ্ন করলেন, ওই ফুলগুলোর রস তো পানসে এবং মধু মিষ্ট। বল, এই পানসে রসগুলোতে মিষ্টত্ব কোত্থেকে আসে? সে উত্তর দিল–

گفت چوں خوانیم بر احمد درود می شود شیریں و تلخی را ربود

ইয়া হাবীবাল্লাহ! আমাদের পেট কিংবা মুখে চিনি নেই। বরং আমরা যখন বাগান হতে ফুলের রস চুষে চলে আসি তখন আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করতে করতে আমাদের ঘরে আসি। মধুর এই মিষ্টত্ব ওই দরূদ শরীফেরই বরকত।

সুবহানাল্লাহ! যখন দরূদ শরীফের বরকতে ফুলের পানসে রস মিষ্ট হতে পারে, আমরা গুনাহগারদেরও আশা যে, দরূদ শরীফের বরকতে আমাদের পানসে ও নিঃরস আমলসমূহ মধুর ও গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে সেই মুখ দান করুন যার দরূদের এই কার্যকারিতা হয়। একই আহার কারো মুখে গিয়ে মধু হয় এবং কারো মুখে গিয়ে বিষে পরিণত হয়। আল্লাহ তায়া'লা ভালকাজ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঐক্যের গুরুত্ব

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا.

তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩)

মানুষ ছাড়া সমস্ত প্রাণীকে সবখানে সর্বকালে সকল দিক দিয়ে একই রকম করে সৃষ্টি করা হয়েছে। গরু, ছাগল, কাক, ব্যাঙ ইত্যাদি সকল পশু-পাখি রঙ, আওয়াজ, বুলি ও খোরাকে সারা পৃথিবীতে একই রকম। যে রঙ, বুলি ও খোরাক এখানকার কাকের, অন্যদেশের কাকেরও তাই। মোটকথা, এক আল্লাহ এই সমুদয় প্রাণীকে তাঁর একত্বের শান প্রকাশের ক্ষেত্র বানিয়েছেন যে, সবখানে একই রঙ ও ঢং। লাট সাহেবের ছাগল যা খায় গরীবের ছাগলও তাই খায়। মোটকথা, সকল প্রাণী সব জায়গায় একই রকম। কিন্তু মানুষই সেই জাত যা كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَأْنٍ (তিনি প্রত্যেহ কোন না কোন কাজে রত) এর বিকাশস্থল। তাদের মধ্যে রঙ, ভাষা, খোরাক, পোশাক, জীবনযাপনের ধারা মোটকথা সব কিছুই দেশ ও কালের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন। এই ভিন্নতা সত্ত্বেও আল্লাহর অভিপ্রায় ছিল এই-এই মানবজাতির মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হোক এবং রঙ বেরঙের সকল মানুষের মধ্যে একতা পরিলক্ষিত হোক। তাদেরকে এক করার জন্য ওই একক সত্তা তাঁর একক মাহবূবকে পাঠিয়েছেন যিনি অনুপম ও অতুলনীয়।

بے مثلی حق کے مظہر ہو، پھر مثل تمہارا کیو نکر ہو
نہ کوئی تمہارا ہم رتبہ نہ کوئی ہمپایہ پایا

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো আল্লাহর অনুপমত্বের বিকাশস্থল, অতএব আপনার উপমা কিরূপে হবে? আপনার সমমর্যাদাসম্পন্ন কেউ নেই এবং আপনার সমকক্ষ কাউকে পাওয়া যায়নি।

এই মাহবূব আল্লাহর রজ্জু, তাঁকে ধরে ওখানে পৌছা যায় এবং তিনি এসেছেন বিক্ষিপ্তদেরকে একত্রিত করার জন্য। যেমন বিক্ষিপ্ত আসবাবপত্রকে এক রশি দ্বারা একত্রিত করা হয়। এই সঙ্গতির কারণে তাঁকে حَبْلُ اللّٰهِ বলা হয়েছে। হযরত বূসীরী (রহ.) বলেন:

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

دَعَا اِلَى اللّٰهِ فَالْمُسْتَمْسِكُوْنَ بِهٖ
مُسْتَمْسِكُوْنَ بِحَبْلٍ غَيْرُ مُنْفَصِمٍ

তিনি আল্লাহর প্রতি আহবান করেছেন। অতঃপর যারা তাঁকে ধারণ করেছে তারা এমন রজ্জুকে ধারণ করেছে যা ছিন্ন হবার নয়।

আল্লাহর এই রজ্জু বিক্ষিপ্তদেরকে এক করে দিয়েছেন। যেমন শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আকৃতি ও প্রকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন, প্রত্যেকের কাজ আলাদা। কিন্তু রূহের সম্বন্ধ এই সমুদয়কে এভাবে এক করে দিয়েছে যে, পায়ে যদি আঘাত লাগে মাথার তা জানা হয়ে যায়। কিন্তু মৃত্যুর পর যেহেতু রূহের সম্বন্ধ চলে গেছে তখন মাথায় আঘাত করলে চোখও তা অনুভব করতে পারে না। এই আয়াত শরীফ ওই 'হাবলুল্লাহ' অর্থাৎ দ্বীনুল্লাহ (আল্লাহর ধর্ম) ও রাসূলুল্লাহকে ধরার নির্দেশ দিয়েছে। এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হল-মুসলমানদের জন্য ঐক্যের প্রয়োজন কিন্তু কি বিষয়ে ঐক্য? ঐক্যের প্রয়োজন ইসলাম প্রসঙ্গে, ইসলামী বিধি-বিধান প্রসঙ্গে। অমুসলিম যদি পিতাও হয়, আমাদের আপন নয় পক্ষান্তরে মুসলমান ভিনদেশী হলেও সে আমাদের ভাই।

ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد　　فداء یک تن بیگانہ کآشنا باشد

হাজারো আপন হলেও যখন খোদার সাথে সম্পর্কহীন হবে তখন সে পর এবং যার মধ্যে আল্লাহর পরিচিতি থাকবে সেই পরের তরেও কুরবান।

মুসলমান পরস্পরে মধুর ন্যায়-মধুর প্রত্যেকটা ফোঁটা পৃথক ফুলের রস। কিন্তু এখন সবটাকে বলা হচ্ছে মধু। কেউ বলছে না যে, এটা গোলাপের রস, এটা চাঁপা ফুলের রস। অনুরূপভাবে আকায়ে দো'জাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবশা (আবিসিনিয়া) থেকে বেলাল (রা.)কে রোম থেকে হযরত সোহাইবকে, পারস্য থেকে হযরত সালমানকে মোট কথা, প্রত্যেক দেশের মানুষকে এভাবে একাকার করে দিয়েছেন যে, তাদের মধ্যে ভূখণ্ড ও বর্ণগত কোন পার্থক্যই নেই।

لگایا تھا مالی نے اک باغ ایسا　　نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا
کنیز اور بانو تھیں آپس میں ایسی　　زمانہ میں ماں جائی بہنیں ہوں جیسی

মালী অর্থাৎ বিশ্বনবী এমন এক বাগান রচনা করেছেন যার চারাগুলোতে বড়-ছোট কোন পার্থক্য নেই। ক্রীতদাসী ও রাণীর পরস্পরে এমন সম্পর্ক গড়ে উঠে যেন সহোদর বোন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিভিন্ন ধরনের কাঠ জ্বলে যাওয়ার পর ওগুলোকে ছাই বলা হয়। (অনুরূপভাবে বিভিন্ন ভাষা, পেশা, দেশ ও গোত্রের মানুষ নবীপ্রেমে জ্বলে যাওয়ার পর তাদেরকে বলা হচ্ছে মুসলমান) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য ঐক্যের প্রয়োজন। ঝাড়ুর সামান্য শলা (একত্রিত হয়ে থাকার কারণে) অনেক বিক্ষিপ্ত আবর্জনাকে ঝেড়ে ফেলে দেয়। এইজন্য হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মদীনা মুনাওয়ারায় তশরীফ নিয়ে প্রথম যে কাজটা করেছেন তা ছিল ভ্রাতৃত্ব স্থাপন।

বর্তমানেও ইসলামী ব্যবস্থাপনায় যেমনটা রয়েছে কোন সম্প্রদায়ে নেই। খ্রিষ্টানদের কবরস্থান, গির্জা আলাদা আলাদা তাদের মধ্যে রয়েছে বর্ণগত বিরাট পার্থক্য। কিন্তু ইসলামে ধনী-গরীব সবাই এক। মুসলমানদের খোদা এক, রাসূল এক, কুরআন এক, কা'বা এক। অতএব কি কারণ যে, মুসলমান এক হবে না? আমাদের মসজিদ, কবরস্থান সবই তো এক।

ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے محمود و ایاز
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز

নামাযের সময় এক সারিতে দাঁড়িয়ে যায় মাহমূদ ও আয়ায। এখানে কেউ ক্রীতদাস কেউ মহারাজ এইরূপ কোন পার্থক্য নেই।

বংশ ও সম্বন্ধগত পার্থক্য কেবল পরিচয়ের জন্য, সম্মান ও অপমানের জন্য নয়। যেমন সাগরের পানি বিভিন্ন নদীতে গিয়ে গঙ্গা ও যমুনা নাম ধারণ করে। সা'দাতে কেরাম (রাসূলের বংশধর) নিঃসন্দেহে আমাদের শাহযাদা। তাঁদের জন্য রেওয়ায়ত এসেছে كُلُّ نَسَبٍ وَّ سَبَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلَّا نَسَبِىْ وَ سَبَبِىْ (কিয়ামতের দিন আমার বংশ পরিচয় ব্যতীত সমস্ত বংশ পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে যাবে) এইজন্য আমীরুল মো'মেনীন হযরত ফারূকে আযম (রা.) হযরত কুলসুম বিনতে ফাতেমা যাহরা (রা.)কে বিবাহ করেছেন। অন্যান্য সমস্ত বংশ ও গোত্র ইসলামের মধ্যে সমান। اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ (তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী) এখানে রজ্জু বলেছেন, চাদর বলেননি। কেননা রজ্জু দ্বারা উপরে আরোহণ করা যায়, পড়ে যাওয়ার সময় ধরা হয়। তা দ্বারা ঝাড়ু বেঁধে অনেক আবর্জনা অপসারণ করা হয় এবং তা দ্বারা নৌকা চলে। পক্ষান্তরে চাদর দ্বারা অনেক কিছু বাঁধা যায় বটে কিন্তু ওতে শক্তি আসে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'কাওছার'র বিশ্লেষণ এবং আওলাদে রাসূলের ফযায়েল

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.

আমি অবশ্যই আপনাকে কাওছার দান করেছি, সুতরাং আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন। নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ। (সূরা কাওছার)

হযরত ইবরাহীম (রা.) কিংবা হযরত কাসেম (রা.)'র ইন্তেকালে কুখ্যাত কাফির আ'স ইবনে ওয়ায়িল একদিন তার গোত্রকে বলল: আমি এই আবতারের নিকট থেকে আসছি। (নাউযুবিল্লাহ) 'আবতার'র অর্থ নির্বংশ। তা ছাড়া কাফিরদের ধারণা ছিল হুজুরের ওফাত শরীফের পর তাঁকে স্মরণ করার কেউ থাকবে না। একথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ণগোচর হল। এতে তাঁর পবিত্র অন্তরে কিছুটা দুঃখ এল, তখন এই সূরা নাযিল হয়। যার মধ্যে ইরশাদ হয়েছে, হে মাহবুব! আমি তো আপনাকে কাওছার দান করেছি। সুতরাং তার শুকরিয়ার্থে নামায ও কুরবানী আদায় করুন। আপনার দুর্নামকারীই নির্বংশ।

এ থেকে প্রতীয়মান হল- আল্লাহর দরবারে হুজুরের সেই মর্যাদা রয়েছে যে, কোন বে আদব যদি তার বেআদবী দ্বারা হুজুরকে কষ্ট দেয় তখন আল্লাহ পাক কষ্ট পান এবং আল্লাহ তায়া'লা স্বয়ং তার জবাব দেন যেমন تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু'হস্ত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও) দ্বারা প্রমাণিত যে, তার পূর্ব ও পরের সূরা সমূহে قل (বলুন) রয়েছে কিন্তু এখানে قل বলেননি বরং নিজেই উত্তর দিয়েছেন।

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে–ওই কাফির তো নির্বংশ বলেছিল উত্তরে বলা হয়েছে–"আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি" এর সাথে সম্পর্ক কি? এইজন্য কাওছারের অর্থ প্রসঙ্গে অনেক বিশ্লেষণ রয়েছে এবং প্রত্যেক বিশ্লেষণের আলাদা আলাদা সম্পর্ক। কাওছার দ্বারা হয়ত (ذكر كثير) প্রচুর আলোচনা ও (ذكر خير) সুখ্যাতিকে বুঝানো হয়েছে। তখন মর্মার্থ হবে এই-এই কাফির তো মনে করেছে স্মরণ ও খ্যাতি সন্তান দ্বারাই চালু থাকে। কিন্তু আমি আমার পক্ষ থেকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আপনাকে যিকরে কাছীর (প্রচুর আলোচনা) দান করেছি যে, পুত্র সন্তান ছাড়াই সারা বিশ্বে আপনার আলোচনা চলতে থাকবে। এর পরিণাম হয়েছে এই-বড় বড় রাজা-মহারাজা, বীরপুরুষ ধনী, দরিদ্র প্রত্যেক ধরনের লোক অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু কারো ইতিহাস এভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি যেভাবে আকায়ে দো'জাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম থেকে ওফাত পর্যন্ত একেকটা অবস্থা এভাবে ইতিহাসে এসেছে যে, যে ব্যক্তি তাঁর একটি মুচকি হাসির কথাও বর্ণনা করেছে তার ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মজনূন তার প্রেমের পুরো কাহিনী 'দিওয়ানে কায়স'-এ লিপিবদ্ধ করেছে। কিন্তু সেও তার প্রেমিকার জীবনী লিপিবদ্ধ করেনি এর রহস্য কি? মজনূন যেভাবে তার বিচ্ছেদের কাহিনী লিখেছিল সেইভাবে তার প্রিয়তমা লায়লার জীবনীও লিখতে পারতো। কিন্তু এতে এই রহস্য নিহিত ছিল যে, সে মনে করতো- লায়লা তো আমার প্রিয়তমা, তার প্রত্যেক কিছু আমার পছন্দ। কিন্তু দুনিয়ার সামনে যদি তার জীবনের অবস্থাদি পেশ করা হয় তাহলে কেউ আপত্তি করবে, কেউ উপহাস করবে তখন আমি আমার প্রিয়তমার অপমানের কারণ হব। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের বিশ্বাস ছিল-ইনি তো জগতের প্রিয়তম প্রত্যেকের পছন্দই হবে। অতএব নির্দ্বিধায় তাঁর যাবতীয় অবস্থাদি প্রকাশ করে দিতেন। কাফিরগণ চেষ্টা করতো–তাঁর আলোচনা বন্ধ হয়ে যাক। কিন্তু বন্ধ হয়নি, হবেও না।

عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے　　یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا

বিবেক থাকলে তারা খোদার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতো না। এরা কিভাবে হ্রাস করবে (হে রাসূল) আপনার বৃদ্ধি সাধনই তো তাঁর অভিপ্রায়।

অথবা কাওছার দ্বারা প্রচুর বংশধরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যদিও হযরত ইব্রাহীম (রা.) ইন্তেকাল করেছেন এবং বংশ পুত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কিন্তু আপনাকে এক কন্যার মাধ্যমে সেই বংশধর দান করা হবে যা কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে। অতএব আজ আট-দশজন পুত্রওয়ালার বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কিন্তু কন্যাওয়ালা আ'কার বংশ এভাবে বাকী রয়েছে যে, পৃথিবীর সবখানে সা'দাতে কেরাম (আওলাদে রাসূল)কে দেখা যায় এবং ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। হ্যাঁ, দুষ্টাচারী যেন নিজের খবর নেয়–যদিও সে পুত্রওয়ালা কিন্তু তার পুত্রকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দেয়া হবে, যার ফলে সে বিধিগতভাবে তার পিতা থেকে বংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং সে নির্বংশ হয়ে থাকবে। কেননা, ধর্ম ভিন্নতার ফলে উত্তরাধিকার ইত্যাদি শেষ হয়ে যায়। এমনটাই হয়েছিল তার বেলায় যে, হযরত আমর ইবনে আ'স মুসলমান হয়ে পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ফলে সে নির্বংশ হয়ে যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ থেকে প্রতীয়মান হল-নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বংশ এমনই উন্নত যে, আল্লাহ তাদেরকে কাওছার বলেছেন। তাঁদের মাহাত্ম্য হযরত জোনাইদ বাগদাদী (রা.)কে জিজ্ঞেস করুন। তিনি ছিলেন এক বাদশাহর পাহলোয়ান। বাদশাহ ঘোষণা দিয়েছিল, যে কেউ আমার এই পাহলোয়ানকে ধরাশায়ী করবে তাকে অনেক পুরস্কার প্রদান করা হবে। নবী-বংশের এক গরীব লোক তাঁর সহধর্মিণীর সাথে পরামর্শ করলেন, উপবাসে আমরা অসহায় হয়ে পড়েছি আমার মন চাইছে জোনাইদের সাথে কুস্তি ধরতে। শুনেছি যে, তিনি আহলে বায়তকে ভালবাসেন। যদি আমার হাতে তিনি ধরাশায়ী হন তাহলে যথেষ্ট পুরস্কার পাব এবং যদি আমি পড়ে যাই তাহলে আমার কি ক্ষতি হবে? বেগম সাহেবা এই মতকে সমর্থন করল। সৈয়দ সাহেব শাহী দরবারে এসে আরজ করলেন, আমি পাহলোয়ান জোনাইদের সাথে কুস্তি ধরব। বাদশাহ তাঁর ফ্যাকাসে রঙ, ভেঙ্গে পড়া চেহারা দেখে বললেন, আপনি জোনাইদের সাথে কুস্তি ধরতে পারবেন না, কুস্তি ধরার জন্য অন্য কোন পাহলোয়ানকে নির্বাচিত করুন! কিন্তু সৈয়দ সাহেব বললেন, আপনি আমার ক্ষীণ শরীর ও ফ্যাকাসে চেহারা দেখবেন না, কুস্তি মঞ্চেই দেখা যাবে আমার নৈপুণ্য। মোটকথা তারিখ নির্ধারিত হল, গোটা শহরে প্রচার করা হল। নির্ধারিত সময়ে ধনী, গরীব, আমীর, ফকীর এবং সাধারণ প্রজা একত্রিত হয়ে যায়। স্বয়ং বাদশাহও মন্ত্রীবর্গসহ ওখানে উপস্থিত হন। হযরত জোনাইদ পাগলা হাতীর ন্যায় কুস্তিমঞ্চে এসে পৌছেন। এদিকে সৈয়দ সাহেবও দাঁড়িয়ে যান। সৈয়দ সাহেবের জানাই ছিল না কুস্তি কিভাবে ধরে? অবশেষে শুরু হল মল্লযুদ্ধ। প্রথমে হাতে হাত মিলালেন। তারপর শুরু হল প্যাঁচ। সৈয়দ সাহেব জোনাইদের কানে কানে বলে দিলেন, হযরত! আমি পাহলোয়ান নই বরং এক অভাবী সৈয়দযাদা (নবীবংশের লোক)। একটু মনে রাখবেন। এটা শুনতেই জোনাইদের হস্তপদ নিস্তেজ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ সামান্য কুস্তির অভিনয় করে নিজেই চিৎ হয়ে পড়ে যান এবং সৈয়দ সাহেবকে নিজের বুকের উপর তুলে নেন। তারপর শুরু হয়ে গেল হৈ চৈ খাইছে, খাইছে। বাদশাহ বললেন, আমার পাহলোয়ান টের করতে পারেনি, কুস্তি পুনরায় হতে হবে। অতএব আবার কুস্তি হল। সৈয়দ সাহেব পুনরায় কানে কানে বলে দিলেন, আমি ফাতেমা যাহরার বংশধর, আমি ক্ষুর্ধাত, মনে রাখবেন। হযরত জোনাইদ আবারো সৈয়দ সাহেবকে তাঁর বুকের উপর তুলে নিলেন। বাদশাহর পক্ষ থেকে সৈয়দ সাহেবকে মূল্যবান পুরুস্কার, তোহফা ইত্যাদি দিয়ে ধন্য করা হয়। জনৈক ব্যক্তি হযরত জোনাইদকে বলল, আজ আপনার কি হল আপনি তার হাত সজোরে ধরেননি কেন? আপনি তার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মোকাবেলায় আপনার সুনিপুণ কৌশল প্রয়োগ করেননি কেন? তিনি বললেন, আমি ইয়াযীদ নই যে, সৈয়দযাদাকে জোর দেখাব। আমি শিমর নই যে, আওলাদে রাসূলের বুকের উপর বসব। রাত্রিবেলায় যখন হযরত জোনাইদ শুয়ে পড়লেন নিদ্রা আসতেই তাকদীর জেগে উঠল, চক্ষু বন্ধ হতেই ভাগ্য খুলে গেল। নসীব হল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত। হুকুম হল-জোনাইদ! আজ তুমি আমার আওলাদের সম্মান রক্ষা করেছে আল্লাহ তায়া'লা কিয়ামতের দিন তোমার সম্মান রক্ষা করবেন এবং অদ্য হতে তোমাকে আল্লাহর অলিদের সরদার করে দেয়া হল। অতএব হযরত জোনাইদ (রহ.) হুজুর গাউসে পাক (রা.)'র পীরদের অন্যতম।

এইভাবে হযরত ইমাম মালেক (রা.) এক সৈয়দ শাসকের ভুল তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন যিনি কোন অপরাধ ছাড়াই তাঁকে কশাঘাত করেছিলেন এবং বলেছিলেন-যদি হুজুর এই বলে নারাজ হয়ে যান যে, তোমার কারণে আমার বংশধর কিয়ামতের ময়দানে গ্রেফতার হল!

কাওছার দ্বারা 'আলমে কছরত' (প্রচুর জগত)কে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই আপনাকে দান করেছেন।

خالق کل نے آپ کو مالک کل بنادیا

دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ واختیار میں

কুল সৃষ্টির স্রষ্টা আপনাকে কুল সৃষ্টির মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। উভয় জগত অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাত রয়েছে আপনার নিয়ন্ত্রণে।

এইজন্য হযরত আদম আলাইহিস সালাম আরশের উপর হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের নাম মোবারক লিপিবদ্ধ দেখেছিলেন যেন প্রতীয়মান হয় যে, আরশের মালিকও তিনি।

লক্ষণীয় যে, হযরত আদম আলাইহিস সালাম কারো নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ ছাড়াই নাম পড়ে নিয়েছেন। প্রতীয়মান হল-আম্বিয়ায়ে কেরাম আলেম হয়েই জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর এটা কেন জিজ্ঞেস করলেন যে, এটা কার নাম? যখন নাম পড়ে নিলেন তখন চিনতে পারলেন না কেন? প্রতীয়মান হল-এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য ছিল না বরং প্রার্থনার জন্যই ছিল যে, এটা যেন আমাকে দান করা হয়। এইজন্য আরজ করলেন, اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ هٰذَا الْوَالِدَ بِهٰذَا الْوَلَدِ (হে আল্লাহ! এই সন্তানের উসীলায় তুমি এই পিতাকে দয়া কর) বেহেশতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রত্যেক কিছুর উপর লিখা রয়েছে: لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ এর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং মালিক মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অথবা কাওছার দ্বারা 'উম্মতে কছীরা' (প্রচুর উম্মত) কিংবা হাওযে কাওছার কিংবা অসংখ্য রূপ ও গুণকে বুঝানো হয়েছে। তখন মর্মার্থ হল এই-হাওযে কাওছারে সমস্ত সৃষ্টি আপনার প্রশংসা করবে। যদি এক গাল মন্দকারী বেআদবীও করে এতে আপনি দুঃখিত হবেন কেন? অথবা আমি আপনাকে অসংখ্য আওলাদ অর্থাৎ উম্মত দান করেছি। আপনি নির্বংশ কিরূপে হতে পারেন?

فَصَلِّ لِرَبِّكَ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে-যদি কোন নে'মত কাউকে দান করা হয় তখন তার শুকরিয়া যেন নফল নামায ও কুরবানী দ্বারা আদায় করে। নে'মত প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করা নবীদের সুন্নাত। শান্তিতে শুকর ও বিপদে ধৈর্যধারণ করা উচিৎ। اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ থেকে প্রতীয়মান হল-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গালমন্দকারী আল্লাহর কোন রহমত পাওয়ার যোগ্য থাকে না। বর্তমানেও হুজুরের গালমন্দকারীগণকে নির্বংশই দেখা যায়। ওই হতভাগাদের বংশ চালু থাকে না। আল্লাহ তায়া'লা তাঁর মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত দান করুন। আমীন!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রোযার ফযীলত

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۭ

রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে রোযা পালন করে। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৫)

এই আয়াত শরীফে রোযা ফরয হওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এখানে কতিপয় বিষয় প্রণিধানযোগ্য:

এক. রমযান শরীফ কেন আসে? মুসলমানদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করার জন্য আসে। এইজন্য তাকে রমযান বলা হয়। এর অর্থ দয়া প্রদর্শনকারী ও দাহকারী এই মাসও গুনাহসমূহকে জ্বালিয়ে দেয়, অতএব এটাকে রমযান বলে। এর মোট চারটি নাম রয়েছে। ১. রমযান ২. শাহরুস্ সবর (ধৈর্যের মাস) ৩. শাহরুল মাওয়াসা'ত (সহমর্মিতার মাস) ও ৪. শাহরে ওয়াসআতে রিয্ক (রিযিক বৃদ্ধির মাস)। (মিশকাত, কিতাবুস্ সাওম)

যেমনিভাবে হাপরে রেখে লোহার মরিচা পরিষ্কার করা হয় তেমনিভাবে গুনাহগার মুসলমানদের জন্য এটাও হাপর-তাদেরকে পরিষ্কার করে দেয়। তবে কোন কোন সময় পরিষ্কার লোহাকেও হাপরে রাখা হয় যেন তাকে অন্যকিছুতে রূপান্তরিত করে। যেমন তা দ্বারা কোন যন্ত্রাংশ তৈরী করবে, যার ফলে তার মূল্য বেড়ে যাবে। অনুরূপভাবে সৎকর্মপরায়ণ লোক এ দ্বারা উচ্চমর্যাদা লাভ করে। হাপরের মধ্যে মরচেযুক্ত লোহা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং পরিষ্কার লোহা কোন যন্ত্রাংশে রূপান্তরিত হয়ে মূল্যবান হয়ে যায়। স্বর্ণও হাপরে গিয়ে অলংকারে রূপান্তরিত হয় এবং মাহবূবের গলার হারে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে গুনাহগার রোযা দ্বারা পবিত্র হয়, মুত্তাকী রোযা দ্বারা আরো অধিক পরহেযগার হয় এবং এর মাধ্যমে নবী ও রাসূলগণের নৈকট্য বৃদ্ধি পায়।

দুই. একবার হযরত রূহুল আমীন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন যখন তিনি মিম্বরের প্রথম ধাপে পা মোবারক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

রেখেছিলেন। তখন ফরমালেন, আমীন! দ্বিতীয় ধাপেও ফরমালেন, আমীন! এইভাবে তৃতীয় ধাপেও ফরমালেন, আমীন! সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া হাবীবাল্লাহ! আপনি কি প্রসঙ্গে আমীন বললেন? হুজুর ফরমালেন, হযরত জিবরীল তিনটি দোয়া করেছেন। যে ব্যক্তি হুজুরের পবিত্র নাম শুনবে এবং দরূদ পড়বে না সে ধ্বংস হোক। যে ব্যক্তি মাতা-পিতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পাবে এবং বেহেশত লাভ করবে না-সে ধ্বংস হোক। যে ব্যক্তি রমযান মাস পাবে এবং জান্নাত ক্রয় করবে না সে ধ্বংস হোক। আমি বললাম, আমীন! (দুর্রে মানসূর, শাহরু রামাদানাল্লাযী আয়াত প্রসঙ্গে)

গূঢ়তত্ত্ব: হযরত জিবরীল সিদরা ছেড়ে এখানে কেন এলেন এবং হুজুর দ্বারা আমীন কেন বলিয়েছেন? এইজন্য যে, তিনি মদীনা মুনাওয়ারাকে সিদরা অপেক্ষা উত্তম জানতেন। কেননা ওখানে রয়েছে রাজ সিংহাসন এবং ওটা রাজধানী। দ্বিতীয়তঃ ওই দোয়াই গ্রহণযোগ্য যার উপর আমীনে মোস্তফায় মোহর পড়ে। যারা বলে-মদীনা পাকে কি আছে ওখানে কেন সফর করা হবে? তারা যেন চিন্তা করে-ওখানে তো তাই রয়েছে যা সিদরায় নেই। এইজন্য হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম সফর করে ওখানে এসেছেন।

তিন. এই মাস আল্লাহর মেহমান, আমাদের রক্ষক ও মেহেরবান। সুতরাং তাকে সম্মান করা উচিৎ। তার সম্মান হল এই যে, মুসলমান যেন চেষ্টা করে এই মোবারক মাসে গুনাহ ও খেলাধূলা থেকে পরহেয করতে। এইরূপ যেন না হয়-এই মেহমান আমাদের উপর নারাজ হয়ে যাবে এবং তজ্জন্য আমরা বিপদাপন্ন হয়ে যাব। কুরআনে কেবল রমযান মাসের নামই উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে নারীদের মধ্যে কেবল হযরত মারয়ামের, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেবল হযরত যায়দের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে রমযান মাসের ফযীলত প্রকাশিত হয়।

চার. রোযা কেন ফরয করা হল? এতে কিছু উপকারিতা রয়েছে। প্রথমতঃ প্রত্যেক কিছুর যাকাত রয়েছে। সুস্থতার যাকাত রোগ, মালের যাকাত সাদকা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যাকাত ক্ষৌরকার্য। অতএব উদরপূর্তির যাকাত ক্ষুধা। যাকাত দ্বারা প্রত্যেক কিছুতে বরকত হয়, এইজন্য রমযানে রিযিকের মধ্যে বরকত হয়:

ز کوٰۃ مال بدر کن کہ دختر زررا چو باغباں بدرد بیشتر دہد انگور!

দ্বিতীয়তঃ রোযাতে রয়েছে অনেক উদর পীড়ার চিকিৎসা। তৃতীয়তঃ ক্ষুধার যন্ত্রণা সেই বুঝবে যার কোন সময় ক্ষুধার্ত থাকার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। অতএব

www.AmarIslam.com

মুসলমানদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে-যদি তারা কোন ক্ষুধার্তকে দেখে তা হলে তাদের রোযার সময়ের ক্ষুধার কথা স্মরণ করে তাকে সাহায্য করবে। যেমন হজ্ব ফরয করা হয়েছে যেন মুসাফিরের কদর বুঝতে পারে। চতুর্থতঃ রোযায় রয়েছে নফসের দমন কেননা ক্ষুধা দ্বারা জৈবিক চাহিদা দমন হয়। এইজন্য সাধকগণ উদরপূর্তি থেকে বিরত থাকেন। উদরপূর্তিতে নফসের লালন হয় এবং ক্ষুধায় আত্মার লালন হয়।

পাঁচ. রোযার অনেক ফযীলত রয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে: اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ রোযা আমার জন্য আমি নিজেই তার প্রতিদান দিব অথবা আমি নিজেই তার প্রতিদান অর্থাৎ রোযা আমার, প্রতিদানে আমাকে পাবে। এর মর্মার্থ হল এই যে, রোযার মধ্যে লৌকিকতা হতে পারে না কেননা তা ভিতরের বিষয়। কিন্তু অপরাপর ইবাদত সম্পাদিত হয় বাহ্যিকভাবে তাতে লৌকিকতার সম্ভাবনা আছে। অথবা এ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, জালিমের সমস্ত ইবাদত পরের হক নষ্ট করার বিনিময়ে মজলুমদেরকে দিয়ে দেয়া হবে কিন্তু রোযা দেয়া হবেনা। বলা হবে রোযা তো আমার জন্যই বিশেষ। সমুদয় ইবাদতের বিনিময় জান্নাত কিন্তু রোযার বিনিময় মালিকে জান্নাত। বিনিময়ে যেমন পার্থক্য ইবাদতেও অনুরূপ পার্থক্য।

ছয়. রোযার মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমতঃ কেবল আশুরার রোযাই ফরয হয়। এ হল হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নাজাতের শুকরিয়া। এ থেকে প্রতীয়মান হল-নে'মতরাজির স্মরণ এবং তজ্জন্য শুকরিয়া ও আনন্দ প্রকাশ বৈধ। যেমন মিলাদ মাহফিল। তারপর প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা অতঃপর রমযান মাসের। তবে রোযার পরিবর্তে ফিদয়া দেয়ার অবকাশ ছিল কিন্তু নিদ্রা যেতেই পানাহার হারাম হয়ে যেতো। হযরত সিরমা ইবনে কায়স গানাভী (রা.) একবার না খেয়ে শুয়ে পড়েন। ইফতার ও সেহেরী না খেয়ে রোযার পর রোযা রাখলেন। অতঃপর যখন কাজ করার জন্য মাঠে যান তখন বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তখন থেকে সুবেহ সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার হালাল হয়। অনন্তর রমযান মাসে স্ত্রীসঙ্গম হারাম ছিল। অতঃপর আমীরুল মো'মেনীন হযরত ওমর (রা.) হতে একবার রমযানের রাত্রে সহবাস হয়ে গেল। হুজুরের দরবারে এর জন্য অনুতাপ প্রকাশ করলেন। এ প্রসঙ্গে اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ (সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে) নাযিল হয়। এ থেকে প্রতীয়মান হল-বড়দের ভুলও ছোটদের জন্য দানের কারণ হয়ে থাকে।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পৃথিবীর সমস্ত প্রকাশ আবুশ বশর হযরত আদম আলাইহিস সালামের একটি ভুলের ফল। যেহেতু তাঁর পৃষ্ঠমোবারকে কাফিরদের রূহসমূহও ছিল যারা বেহেশতের উপযোগী নয়। অতএব তাঁকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে-ওই রূহসমূহকে বের করে পুনরায় এখানেই চলে আসুন। সুতরাং এটা বলা ঠিক নয় যে, হযরত আদম আমাদেরকে বেহেশত থেকে বের করেছেন বরং আমরাই তাঁকে বেহেশত থেকে বাইরে নিয়ে এসেছি।

মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন:

ہر چہ گیرد علتی علت شود   کفر گیرد ملتی ملت شود

এক সাহাবী বাধ্য হয়ে মুখ দিয়ে কুফরী শব্দ বের করেছিল। অতঃপর প্রিয়নবীর দরবারে এসে কারণ এটাই আরজ করল যে, আমি হুজুরের মজলিসের প্রত্যাশী, আমি জানতাম যে, আমার একটি পরশপাথর রয়েছে যা নষ্ট লোহাকেও স্বর্ণে পরিণত করে। এইজন্য আমি এই সাহস করেছি। তখন আয়াত নাযিল হল إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ (তবে তার জন্য আল্লাহর গযব ও মহাশাস্তি নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়েছে কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত) এটা এই শে'রের তাফসীর। মোটকথা,

خطائے بزرگاں گرفتن خطاست

অর্থাৎ বুযর্গদের ভুলধরাও একটা ভুল।

সাত. রোযা তিন ধরনের হয়ে থাকে। (১) আ'ম লোকের রোযা (২) খা'স লোকের রোযা (৩) খা'সদের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিদের রোযা।

আ'ম লোকের রোযা হল–সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিজের কণ্ঠনালীকে পানাহার এবং যৌনাঙ্গকে যৌনমিলন থেকে বিরত রাখা। খা'স লোকের রোযা হল নিজের সমস্ত যাহেরী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মন্দকাজ থেকে বিরত রাখা। খা'সদের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিদের রোযা হল যাহেরী ও বাতেনী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এমন কি ধ্যান-কল্পনাকেও অন্যায় থেকে বিরত রাখা। এইজন্য এই মাসে ই'তিকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া। এতে দুনিয়া ত্যাগের একটা চিত্র যেন সামনে এসে যায় এবং উপদেশ পাওয়া যায়। অপরাপর ইবাদতের মধ্যে কিছু না কিছু করতে হয় কিন্তু রোযা হল কিছুই না করা এবং রোযা ঘুম-চেতন, উঠা-বসা সবসময় আদায় হতে থাকে।

আট. এই মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত কাজগুলো করা উচিৎ–

(১) রোযা (২) তারাবীহ (৩) ই'তিকাফ (৪) ইফতার ও সেহরীর সময় দোয়া, কারণ তা দোয়া কবুল হওয়ার সময় (৫) সেহরীর জন্য রাত্রের শেষ ষষ্ঠাংশ মুস্তাহাব (৬) দান-খয়রাত। এই পবিত্র মাসে বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়ু অপেক্ষা অধিক দানশীল হতেন। এই মাসের মধ্যে নফলের সওয়াব ফরযের সমান এবং ফরযের সওয়াব সত্তর গুণ। এছাড়া এই মাসের শেষে অনুতাপ ও আফসোস করবে। কারণ আল্লাহর নে'মত চলে যাওয়াতে আফসোস করার কথা বর্ণিত হয়েছে। এমনকি স্ত্রীর জন্য তালাক ও স্বামীর মৃত্যুতে শোকপালন আবশ্যক করে দেয়া হয়েছে। এইজন্য জুমআতুল বিদায় রমযানের বিদায় উপলক্ষে মর্মভেদী খোৎবা পাঠ করা হয়। যেন মানুষ যে পরিমাণ সময় রয়ে গেছে তাকে গুরুত্ব দিয়ে ইবাদত করার চেষ্টা করে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আবু হোরাইরা (রা.) আমীরুল মো'মেনীন ফারূক আযম (রা.)কে ঈদের দিন কাঁদতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, জানি না আল্লাহর এই মেহমান আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছে না অসন্তুষ্ট! এটা এমন মেহমান-গভর্ণর জেনারেল এলে রাজধানী থেকে ঘোষণা করা হয় কিন্তু এই মেহমান যখন আসে তখন আসমান থেকে ঘোষণা করা হয় يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ হে কল্যাণকামী! তুমি অগ্রসর হও, হে মন্দকামী! তুমি মন্দ থেকে বিরত থাকো। (মিশকাত)

দানশীল দু'ধরনের হয়ে থাকে। এক. যিনি ফকীরগণকে ডেকে দান করেন। দুই. যিনি ফকীরদের ঘরে গিয়ে দান করেন। কা'বা শরীফ মোমিনগণকে ডেকে দান করে কিন্তু রমযান মাস মোমিনদের ঘরে ঘরে এসে দান করে, অতএব তাকে সন্তুষ্ট করা অতীব জরুরী।

এই যা বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন রোযা ব্যতীত সমস্ত পুণ্য হকদারগণ নিয়ে যাবে তাতেও আসল নেকী বাদ রাখা হবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমলের মধ্যে যে বরকত দান করা হয় ওই অতিরিক্ত সওয়াবই হকদারগণ নিয়ে যাবে। দেখুন রূহুল বয়ান مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا আয়াত প্রসঙ্গ। বৎসরের মধ্যে রমযান সকল মাস অপেক্ষা উত্তম। কারণ দিন-রাত ইবাদতের জন্য নির্ধারিত। কুরআনও পাওয়া গেছে এই মাসে। অতঃপর রবিউল আউয়াল মাস-এতে আত্মপ্রকাশ করেছেন ছাহেবে কুরআন তারপর যিলহজ্ব। (রূহুল বয়ান) যিলহজ্ব মাসে হজ্বের কার্যাবলী আদায় হয়ে থাকে শুধু চারদিন এবং তাও আদায় করে থাকে কিছু সংখ্যক লোক। কিন্তু রমযানে পূর্ণ মাস এবং প্রত্যেক মুসলমান ইবাদত করে থাকে। তা ছাড়া যিলহজ্ব ডেকে দান করে এবং এটা ঘরে ঘরে এসে দান করে। যেমন কূপ ও নদী। অতএব তার ফয়েয ব্যাপক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নামাযের ফযীলত

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ.

তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হও বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও। (সূরা বাকারা, আয়াত-২৩৮)

এখানে তিনটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য। পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এর কি সম্পর্ক ? ওখানে তো সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া এবং তার মোহরের আলোচনা ছিল আর এখানে চলে এসেছে নামাযের আলোচনা। তার শানে নুযূল কি? এ থেকে কি কি বিধান জানা গেল?

এক. এর শানে নুযূল হল–একদল লোক গৃহ নির্মাণ এবং সেগুলো সুসজ্জিত করণে লিপ্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মসজিদের সাথে সম্পর্ক শিথিল করে নেয়। এই প্রসঙ্গে এই আয়াতে করীমা অবতীর্ণ হয়।

দুই. পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এর দু'ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। প্রথমতঃ কুরআন করীমের নিয়ম হল–যেখানে পার্থিব বিধানাবলী বর্ণনা করে ওখানে এর পাশাপাশি ধর্মীয় বিধানাবলী বর্ণনা করে। যাতে মানুষ দুনিয়ায় লিপ্ত হয়ে আখিরাতের প্রতি অমনোযোগী না হয়। পূর্বে ফরমায়েছিলেন فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ (অতএব তোমরা তোমাদের শষ্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার এবং নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর) যেহেতু অনেক দূর থেকে তালাকের বিধান বর্ণিত হচ্ছে এবং পরবর্তীতেও এই জাতীয় বিধান আসছে অতএব মধ্যখানে নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন। এতে আলেমদের জন্য সতর্কবাণী রয়েছে যে, তাঁরা যেন এই মাসআলাসমূহে লিপ্ত হয়ে নামাযের প্রতি উদাসীন না হয়। সাধারণ মানুষের জন্য এই সতর্কবাণী রয়েছে যে, তারা যেন তালাক ও বিবাহের ঝগড়া বিবাদে এভাবে জড়িয়ে না পড়ে যে, নামায ইত্যাদি ইবাদতের প্রতি উদাসীন তা চলে আসে। হযরত ইমাম গাযযালী (রহ.)'র ছোটভাই ইমাম হামেদ গাযযালী একজন অলিয়ে কামিল ছিলেন। তিনি হযরত ইমাম গাযযালীর পিছনে নামায পড়তেন না। তিনি তাঁর মায়ের নিকট অভিযোগ করলেন। তাঁকে ডেকে কারণ জিজ্ঞেস করলেন মহানুভব আম্মা। তখন হামেদ গাযযালী বললেন, তিনি তো নামাযে দাঁড়িয়ে শরীয়তের মাসআলা গবেষণা করেন! বলুন, মেহরাব ইবাদতের স্থান না দারুল ইফ্তা?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আম্মাজান বললেন, সে তো মাসআলা তালাশ করে আর তুমি তালাশ কর তার দোষ! সে কুরআনে থাকে আর তুমি নামায থেকে বের হয়ে তার অন্তরে প্রবেশ কর। নামাযের মধ্যে না তুমি থাকো না সে! অবশেষে হামেদ গাযযালী ক্ষমা চাইলেন। দ্বিতীয়তঃ তালাকের আয়াতে এসেছিল لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা বিস্মৃত হয়ো না। যখন সৃষ্টির অনুগ্রহের শুকরিয়া আবশ্যক তা হলে স্রষ্টার অনুগ্রহরাজির শুকরিয়া প্রথম পর্যায়ে আবশ্যক হবে। তার শুকরিয়া হল নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া। এই রহস্যের প্রেক্ষিতে এখানে নামাযের আলোচনা করা হয়েছে।

তিন. এই আয়াত থেকে অনেক বিধানাবলী জানা যায়। প্রথমতঃ সকল নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া অপরিহার্য। যত্নবান হওয়ার মধ্যে অনেক ব্যাপকতা রয়েছে। সর্বদা পড়া, সঠিক সময়ে পড়া, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত এমন কি মুস্তাহাবের প্রতিও লক্ষ রাখা, বিনয়-নম্রতা ও একাগ্রচিত্তে আদায় করা। দ্বিতীয়তঃ 'সালাতে উস্ত্বা' (মধ্যবর্তী নামায) দ্বারা আসরের নামাযকে বুঝানো হয়েছে। হাদীসে আহযাবে রয়েছে– شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى (তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায তথা আসরের নামায থেকে বিরত রেখেছে)। তৃতীয়তঃ 'উস্ত্বা' থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে নামায পাঁচ ওয়াক্ত। কেননা উস্ত্বা অর্থাৎ মধ্যবর্তী নামায তাকেই বলা হবে যার দু'পার্শ্বে সমান সংখ্যা থাকবে। আর সংখ্যার জন্য কমপক্ষে দুই হতে হবে, এক পূর্ণ সংখ্যা নয়। কারণ পূর্ণ সংখ্যা তাকেই বলা হয় যা দু'প্রান্তের সমষ্টির অর্ধেক হবে। সুতরাং উস্ত্বা নামায তখনই হতে পারে যখন তার দু'পার্শ্বে দুই দুই নামায থাকবে এবং মধ্যখানে এটা থাকবে। অতএব নিঃসন্দেহে নামায পাঁচ ওয়াক্ত হল। তিনের দু'পার্শ্বে সংখ্যা নেই, ওতে 'ওয়াসত' হতে পারে না।

চার. কতিপয় কারণে আসরের নামাযকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ এটা কাজ-কর্ম থেকে অবসর, ভ্রমণ-বিনোদন ও খেলাধূলার সময় । হতে পারে এর ফলে মানুষ নামাযের প্রতি অবহেলা করবে। দ্বিতীয়তঃ হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম ঘোড়ার মহড়ায় লিপ্ত হয়ে এই নামাযই পড়তে পারেননি। তৃতীয়তঃ এই নামাযে রাত ও দিনের ফেরেশতাগণ একত্রিত হয়ে যায়। যেমন কোন কোন রেওয়ায়তে এসেছে। চতুর্থতঃ এই নামায কসরী ও গাইরে কসরীর মাঝখানে রয়েছে। পঞ্চমতঃ মৃত্যুর সময় এবং কবরে প্রশ্ন করার সময় এই ওয়াক্তই অনুভূত হবে। যদি বান্দা এই নামাযকে নিয়মিত আদায় করে তা হলে মুনকার ও নকীরের প্রশ্নের সময় বলবে–প্রশ্ন পরে করবে আগে আমাকে আসরের নামায পড়তে দাও। এই কারণে কতেক সূফীয়ায়ে কেরাম আসরের নামাযের পর পানাহার, ইত্যাদি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নামাযের ফযীলত

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ.

তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হও বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও। (সূরা বাকারা, আয়াত-২৩৮)

এখানে তিনটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য। পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এর কি সম্পর্ক ? ওখানে তো সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া এবং তার মোহরের আলোচনা ছিল আর এখানে চলে এসেছে নামাযের আলোচনা। তার শানে নুযূল কি? এ থেকে কি কি বিধান জানা গেল?

এক. এর শানে নুযূল হল–একদল লোক গৃহ নির্মাণ এবং সেগুলো সুসজ্জিত করণে লিপ্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মসজিদের সাথে সম্পর্ক শিথিল করে নেয়। এই প্রসঙ্গে এই আয়াতে করীমা অবতীর্ণ হয়।

দুই. পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এর দু'ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। প্রথমতঃ কুরআন করীমের নিয়ম হল–যেখানে পার্থিব বিধানাবলী বর্ণনা করে ওখানে এর পাশাপাশি ধর্মীয় বিধানাবলী বর্ণনা করে। যাতে মানুষ দুনিয়ায় লিপ্ত হয়ে আখিরাতের প্রতি অমনোযোগী না হয়। পূর্বে ফরমায়েছিলেন فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ (অতএব তোমরা তোমাদের শষ্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার এবং নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর) যেহেতু অনেক দূর থেকে তালাকের বিধান বর্ণিত হচ্ছে এবং পরবর্তীতেও এই জাতীয় বিধান আসছে অতএব মধ্যখানে নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন। এতে আলেমদের জন্য সতর্কবাণী রয়েছে যে, তাঁরা যেন এই মাসআলাসমূহে লিপ্ত হয়ে নামাযের প্রতি উদাসীন না হয়। সাধারণ মানুষের জন্য এই সতর্কবাণী রয়েছে যে, তারা যেন তালাক ও বিবাহের ঝগড়া বিবাদে এভাবে জড়িয়ে না পড়ে যে, নামায ইত্যাদি ইবাদতের প্রতি উদাসীন তা চলে আসে। হযরত ইমাম গাযযালী (রহ.)'র ছোটভাই ইমাম হামেদ গাযযালী একজন অলিয়ে কামিল ছিলেন। তিনি হযরত ইমাম গাযযালীর পিছনে নামায পড়তেন না। তিনি তাঁর মায়ের নিকট অভিযোগ করলেন। তাঁকে ডেকে কারণ জিজ্ঞেস করলেন মহানুভব আম্মা। তখন হামেদ গাযযালী বললেন, তিনি তো নামাযে দাঁড়িয়ে শরীয়তের মাসআলা গবেষণা করেন! বলুন, মেহরাব ইবাদতের স্থান না দারুল ইফ্তা?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আম্মাজান বললেন, সে তো মাসআলা তালাশ করে আর তুমি তালাশ কর তার দোষ! সে কুরআনে থাকে আর তুমি নামায থেকে বের হয়ে তার অন্তরে প্রবেশ কর। নামাযের মধ্যে না তুমি থাকো না সে! অবশেষে হামেদ গাযযালী ক্ষমা চাইলেন। দ্বিতীয়তঃ তালাকের আয়াতে এসেছিল لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা বিস্মৃত হয়ো না। যখন সৃষ্টির অনুগ্রহের শুকরিয়া আবশ্যক তা হলে স্রষ্টার অনুগ্রহরাজির শুকরিয়া প্রথম পর্যায়ে আবশ্যক হবে। তার শুকরিয়া হল নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া। এই রহস্যের প্রেক্ষিতে এখানে নামাযের আলোচনা করা হয়েছে।

তিন. এই আয়াত থেকে অনেক বিধানাবলী জানা যায়। প্রথমতঃ সকল নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া অপরিহার্য। যত্নবান হওয়ার মধ্যে অনেক ব্যাপকতা রয়েছে। সর্বদা পড়া, সঠিক সময়ে পড়া, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত এমন কি মুস্তাহাবের প্রতিও লক্ষ রাখা, বিনয়-নম্রতা ও একাগ্রচিত্তে আদায় করা। দ্বিতীয়তঃ 'সালাতে উস্ত্বা' (মধ্যবর্তী নামায) দ্বারা আসরের নামাযকে বুঝানো হয়েছে। হাদীসে আহযাবে রয়েছে– شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى (তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায তথা আসরের নামায থেকে বিরত রেখেছে)। তৃতীয়তঃ 'উস্ত্বা' থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে নামায পাঁচ ওয়াক্ত। কেননা উস্ত্বা অর্থাৎ মধ্যবর্তী নামায তাকেই বলা হবে যার দু'পার্শ্বে সমান সংখ্যা থাকবে। আর সংখ্যার জন্য কমপক্ষে দুই হতে হবে, এক পূর্ণ সংখ্যা নয়। কারণ পূর্ণ সংখ্যা তাকেই বলা হয় যা দু'প্রান্তের সমষ্টির অর্ধেক হবে। সুতরাং উস্ত্বা নামায তখনই হতে পারে যখন তার দু'পার্শ্বে দুই দুই নামায থাকবে এবং মধ্যখানে এটা থাকবে। অতএব নিঃসন্দেহে নামায পাঁচ ওয়াক্ত হল। তিনের দু'পার্শ্বে সংখ্যা নেই, ওতে 'ওয়াসত' হতে পারে না।

চার. কতিপয় কারণে আসরের নামাযকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ এটা কাজ-কর্ম থেকে অবসর, ভ্রমণ-বিনোদন ও খেলাধূলার সময় । হতে পারে এর ফলে মানুষ নামাযের প্রতি অবহেলা করবে। দ্বিতীয়তঃ হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম ঘোড়ার মহড়ায় লিপ্ত হয়ে এই নামাযই পড়তে পারেননি। তৃতীয়তঃ এই নামাযে রাত ও দিনের ফেরেশতাগণ একত্রিত হয়ে যায়। যেমন কোন কোন রেওয়ায়তে এসেছে। চতুর্থতঃ এই নামায কসরী ও গাইরে কসরীর মাঝখানে রয়েছে। পঞ্চমতঃ মৃত্যুর সময় এবং কবরে প্রশ্ন করার সময় এই ওয়াক্তই অনুভূত হবে। যদি বান্দা এই নামাযকে নিয়মিত আদায় করে তা হলে মুনকার ও নকীরের প্রশ্নের সময় বলবে–প্রশ্ন পরে করবে আগে আমাকে আসরের নামায পড়তে দাও। এই কারণে কতেক সূফীয়ায়ে কেরাম আসরের নামাযের পর পানাহার, ইত্যাদি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এমনকি দুনিয়াবী কথা-বার্তাও পছন্দ করতেন না, যেন অন্তিম মুহূর্তে পানি পান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা না দেয়।

পাঁচ. قُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ থেকে কতিপয় বিষয় প্রতীয়মান হয়। নামাযের মধ্যে কিয়াম (দাঁড়ানো) ফরয, কারণ আমর (আদেশসূচক ক্রিয়া) উজূব (আবশ্যকীয়তা)'র জন্য ব্যবহৃত। জমাআত সহকারে আদায় করা জরুরী বহুবচন এর শব্দ সম্মিলিতভাবে আদায়করণকে চায়।

قٰنِتِيْنَ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে কথা বলা, সালাম করা, পানাহার করা, এদিক ওদিক দেখা নিষিদ্ধ। এই সমুদয় বিষয় নামাযের মধ্যে প্রথমে বৈধ ছিল এখন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আর وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ দ্বারা নামাযের মধ্যে ইমামের পিছনে ক্বিরাত পাঠ করাকেও নিষেধ করে দেয়া হয়। قنوت এর অর্থ নীরবতাও এবং আনুগত্যও।

لِلّٰهِ থেকে প্রতীয়মান হল–নামায কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। তাতে লৌকিকতা ও যশ-খ্যাতির খেয়াল যেন না থাকে। নামাযে হাজত, নামাযে গাউছিয়া ইত্যাদির মধ্যেও আল্লাহ তায়া'লাকে সন্তুষ্ট করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তারপর আল্লাহ তায়া'লার নিকট হাজত প্রার্থনা করা হয়। কোন উদ্দেশ্যে নামায পড়া لِلّٰهِ এর পরিপন্থি নয়। এই لِلّٰهِ থেকে এও প্রতীয়মান হল–নামায আল্লাহর জন্য হতে হবে কা'বার জন্য নয়। কা'বার দিকে কেবল মুখ করা হয়। চেহারা কা'বার দিকে এবং অন্তর কা'বার স্রষ্টার দিকে হওয়া জরুরী আল্লাহ তায়া 'লা এইরূপ নামায নসীব করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুহাজিরদের বর্ণনা

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ.

আপনি তাদেরকে দেখেননি যারা মৃত্যুভয়ে হাজারে হাজারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল? অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন, তোমাদের মৃত্যু হোক! তারপর আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (সূরা বাকারা, আয়াত-২৪৩)

এই আয়াতে কতিপয় বিষয় প্রণিধানযোগ্য:

এক. পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এই আয়াতের সম্পর্ক অতি চমৎকার। এর পূর্বে আলোচনা হয়েছিল বিধবা স্ত্রীর ইদ্দতের কথা। তার অধীনে আলোচনা হয়েছে মৃত্যুর; প্লেগও অবশ্যই মৃত্যু, এইজন্য এখানে এর আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে নির্দেশ রয়েছে জিহাদের। জিহাদ সেই ব্যক্তিই করতে পারে যে মৃত্যুকে ভয় করে না এবং জীবনকে অত্যধিক ভালবাসে না। এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে– জীবন ও মরণ আল্লাহর কুদরতের নিয়ন্ত্রনাধীন। তা থেকে পরিত্রাণের কৌশল আল্লাহর হুকুমকে পাল্টে দিতে পারে না। আর যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তখন আল্লাহর পথে এলেই তো ভাল। এইজন্য এখানে এই ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

দুই. ঘটনা হল এই–ওয়াসেত ভূখণ্ডে একটি শহর ছিল যার নাম ওয়াওয়ারদান। ওখানে একবার প্লেগ এল। বনী ইস্রাইলের ধনী শ্রেণীর লোক ওখান থেকে পালিয়ে যায় এবং দরিদ্রগণ থেকে যায়। যারা ছিল তাদের মধ্যে প্রচুর লোক মারা যায়। যারা পালিয়েছিল তারা রক্ষা পেয়ে যায়। এটা দেখে দেশে অবস্থানকারীগণ অনুতপ্ত হল। পরবর্তী বছর আবার প্লেগ এল। এবার সবাই পালিয়ে গিয়ে একটি ময়দানে পৌছল। তখন আল্লাহর নির্দেশে সবাই মৃত্যুবরণ করে। কিছুদিন পর ওদিক দিয়ে হযরত হিযক্বীল আলাইহিস সালামের গমন হয় তখন তিনি তাদের হাড়গুলো দেখে আরজ করলেন–হে খোদা! তুমি তাদেরকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জীবিত করে দাও। নির্দেশ হল, আপনি তাদেরকে ডাকুন। তিনি ডাক দিলেন, হে বিক্ষিপ্ত হাড়গুলো! তোমরা একত্রিত হয়ে যাও। তারপর দ্বিতীয় আওয়াজে সবাই জীবিত হয়ে যায়। অনেক বছর জীবিত থাকার পর তারা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে। হযরত হিযক্বীল মূসা আলাইহিস সালামের তৃতীয় খলীফা। প্রথম হযরত য়ূশা, দ্বিতীয় হযরত কালেব ইবনে য়ূহ্না, তৃতীয় হযরত হিযক্বীল।

তিন. এ থেকে কতিপয় শিক্ষনীয় বিষয় পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমতঃ এ ঘটনা হুজুর আলাইহিস সালামের অনেক পূর্বের কিন্তু বলা হয়েছে اَلَمْ تَرَ ইস্তিফহামে ইনকারী অর্থাৎ আপনি কি দেখেননি? প্রতীয়মান হচ্ছে–নবীদের চক্ষু অতীত ও ভবিষ্যতের বিষয়বলী প্রত্যক্ষ করে। যেমন ইরশাদ হয়েছে- اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ (আপনি কি দেখেননি আপনার প্রতিপালক হস্তী অধিপতিদের প্রতি কী করেছিলেন?) এইজন্য হুজুর আলাইহিস সালাম আবদুল্লাহ চকড়ালভী এবং খানায়ে কা'বা বিধ্বস্তকারীদের সংবাদ প্রদান করেছেন অথচ এই ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে অনেক দিন পর। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর দরবারে আম্বিয়ায়ে কেরামের সেই খাতির রয়েছে–যদি তাঁরা জেদ ধরেন তা হলে তা পূর্ণ করে দেয়া হয়। لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهٗ হযরত হিযক্বীল আলাইহিস সালামের আবেদনের প্রেক্ষিতে পুনরায় জীবিত করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে-একজনকে দু'বার জীবিত করা হয়েছে (অথচ মৃত্যু হয়ে যাওয়ার পর পৃথিবীতে পুনঃজীবন দান করা হয়না) তারপর প্রশ্ন হচ্ছে–একজনের মৃত্যু দু'বার হয়না এইজন্য শহীদদের আত্মাসমূহ অভিলাষ ব্যক্ত করা সত্ত্বেও তাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠানো হয়না। (মিশকাত, বাবুশ শোহাদা)

তাহলে এদের মৃত্যু দু'বার কেন এল? দ্বিতীয়তঃ তাদের বয়স তো পূর্ণ হয়েছিল তারা পুনঃজীবন কেন লাভ করল? আর যদি বয়স পূর্ণ না হয় তা হলে প্রথমবার মৃত্যু কেন এসেছিল?

প্রথম উত্তর তো এই যে, দ্বিতীয়বার মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। তাদের এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও হুজুর আলাইহিস সালাম যে সব মৃতকে জীবিত করেছিলেন তাদেরকে একবার মৃত্যুযন্ত্রণা ছাড়াই রূহ কবয করা হয়েছে। যেমন নিদ্রার সময় প্রত্যেক মানুষের রূহে ইনসানী কিংবা সোলতানী কিংবা সায়রানী কোন যন্ত্রণা ছাড়াই বের করে দেয়া হয় কোন যন্ত্রণা ছাড়াই আবার প্রবেশ করানো হয় কিন্তু রূহে মাকামী বা হায়ওয়ানী মৃত্যুর সময় বের হয়। দেখুন রূহুল বয়ান يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ এবং اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا আয়াত প্রসঙ্গ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একটি সূক্ষ্ম বিষয়: নিদ্রাবস্থায় রূহে সায়রানী বের হয়ে ভ্রমণ করে। কিন্তু যেখানে থাকুক না কেন শরীরের নিকট দাঁড়িয়ে যখন ডাক দেয়া হয় সে শুনতে পায় এবং তৎক্ষণাৎ এসে শরীরে প্রবেশ করে। শরীরে হাত লাগালে জানতেও পারে। এ থেকে প্রতীয়মান হল–দেহ থেকে বের হওয়ার পর রূহের প্রত্যেক শক্তি বেড়ে যায়। এইজন্য সমাহিত মুর্দাগণ কবরস্থানের নিকট দিয়ে গমনকারীগণকে দেখতেও পায় এবং তাদের পদধ্বনি শুনতেও পায়। অথচ শত শত মন মাটির নীচে চাপা পড়ে আছে। এ থেকে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া যায়।

নবী ও অলিদের রূহ ওফাতের পরও দূরের আওয়াজ শুনতে পান এবং সাহায্যের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে আসতে পারেন। উম্মত দেহের ন্যায় এবং আকায়ে দো'জাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রাণ। যেমনিভাবে দেহকে স্পর্শ করলে রূহ জানতে পারে তেমনিভাবে মুসলমানের উপর কোন অবস্থা অতিক্রান্ত হলে আকা জানতে পারেন।

در فراق مرا چوں سوخت جان　　چوں نہ نالم بے تو اے جان جہاں

হে জগতের প্রাণ! আপনার বিরহে আমার প্রাণ যখন জ্বলছে আপনি বিনে আমি কেন ক্রন্দন করব না?

এইজন্য কবরস্থানে ফাতেহা পাঠ করা হয়, কারণ দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক থাকে।

দ্বিতীয় উত্তর–বাতি নিভে যাওয়ার দু'টি সুরত রয়েছে। প্রথমতঃ তেল ও ফিতা মওজুদ থাকাবস্থায় ফুঁক দিয়ে নিভানো। দ্বিতীয়তঃ উভয়টা শেষ হয়ে যাওয়াতে আপনাআপনি নিভে যাওয়া। বয়স বাকী ছিল কিন্তু খোদায়ী এক রহস্যের প্রেক্ষিতে তাদেরকে মৃত্যু দেয়া হয়েছিল, পরে আবার জীবিত করা হয়েছে। কিন্তু এই মৃত্যুর সময়কাল বয়সের গণনায় আসবে না। যেমন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আসমানে অবস্থানের মেয়াদকাল তাঁর বয়সের হিসাবে নেই বরং তাঁর বয়স ৪০ বৎসর বা ৪৫ বৎসর। এও বলা যেতে পারে–তাদের বয়স শেষ হয়েছিল কিন্তু পয়গাম্বরের দোয়ায় পুনরায় বয়স দান করা হয়েছে। দেখুন আদম আলাইহিস সালামের দোয়ায় দাউদ আলাইহিস সালামের বয়স ৪০ বছর থেকে বাড়ানো হয়েছে। সৎকর্ম দ্বারা বয়স বৃদ্ধি পায়।

পাঁচ. এ থেকে প্রতীমান হল– প্লেগ ও অপরাপর মহামারী রোগ থেকে পলায়ন করা গুনাহ। এও প্রতীয়মান হল–মৃত্যু দ্বারা রূহ মরে না কেবল রূহের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। যেমন ইঞ্জিন ও রেল, বাল্ব ও পাওয়ার হাউস। তবে যেমনিভাবে জীবদ্দশায় ভিন্ন ভিন্ন শক্তিসম্পন্ন লোক রয়েছে তেমনিভাবে মৃত্যুর পরও।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাদকার ফযীলত

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? তিনি তার জন্য এটা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। আর আল্লাহ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁর পানেই তোমরা প্রত্যানীত হবে। (সূরা বাকারা, আয়াত-২৪৫)

এই আয়াতে কতিপয় বিষয় লক্ষণীয়:

এক. জিহাদের বর্ণনা সম্বলিত পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এই আয়াতের চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। জিহাদের মধ্যে জানও ব্যয় করা হয় মালও। এখন বলা হচ্ছে–এই জিনিস দুটো (জান ও মাল) আমার দায়িত্বে কর্জ হিসাবে থাকবে, যা লভ্যাংশসহ অবশ্যই ফেরত প্রদান করা হবে।

দুই. এগুলোকে কর্জ এইজন্য বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে টাকা জমাকারী যেভাবে নিশ্চিত থাকে সেভাবে এও নিশ্চিত থাকতে পারবে যে, লভ্যাংশসহ ফেরত প্রদান করা হবে। আল্লাহর ব্যাংক হল মাদ্রাসা, মসজিদ ও জিহাদের ময়দান। قرض (কর্জ) বলেছেন دين বলেননি কারণ دين এর মধ্যে সময়সীমা নির্ধারিত থাকে قرض এর কোন সময়সীমা নেই। অতএব প্রতীয়মান হল–তার প্রতিদানের জন্য এটা জরুরী নয় যে, পরকালই হতে হবে বরং দুনিয়া ও আখিরাত উভয়স্থানে পাওয়া যেতে পারে। قرض ও دين এর মধ্যে এই পার্থক্যও রয়েছে যে, টাকা দিয়ে টাকা নেওয়া কর্জ এবং মাল দিয়ে মূল্য কিছুদিন পরে নেয়া دين ।

قرض এর অর্থ কর্তন করা, তা থেকে مقراض কাঁচি। যেহেতু ঋণদাতা তার মাল থেকে কর্তন করে দেয় কিংবা কর্জের কারণে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার ভালবাসা কেটে যায় এইজন্য তাকে قرض বলা হয়। আর এখানে বলা হয়েছে قرضا حسنا অর্থাৎ সৎ উদ্দেশ্যে কিংবা সন্তুষ্টচিত্তে ব্যয় কর। অথবা হালাল উপার্জন থেকে ব্যয় কর। অথবা এই কর্জ দ্বারা আমার ও তোমার ভালবাসার মধ্যে অবনতি হবে না বরং উন্নতি হবে, কেননা এটা কর্জে হাসান। বান্দাদের মধ্যে সেটাকেও কর্জে হাসান বলা হয় যা দাবী ছাড়া হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে সাদকা, সুদমুক্তঋণ এবং যে কর্জে সওয়াবের নিয়ত থাকে; সবগুলোকে কর্জে হাসান বলা হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَضْعَافًا كَثِيْرَةً থেকে প্রতীয়মান হল–এই কর্জে এতই বর্ধন করা হবে যা তোমাদের হিসাবের বাইরে। এই বর্ধিত অংশ সুদ নয় কারণ মালিক ও গোলামের মধ্যে সুদ হয় না। তাছাড়া বান্দাগণ হতে সুদ নেয়া হারাম। কেননা সুদদাতা ধ্বংস হয়ে যাবে। খোদায়ে কুদ্দুসের ভাণ্ডারে কোন কমতি নেই। অতএব তাঁর নিকট হতে সুদ নেয়া জায়েয। এই বর্ধিত প্রতিদান না হলে কিয়ামতের দিন আমাদের দেউলিয়া হতে হবে হকদারগণ রোযা ব্যতীত বাকী সমুদয় ইবাদত তাদের হকের বিনিময়ে নিয়ে যাবে। যদি এই বর্ধিত প্রতিদান আল্লাহ না দেন তা হলে কাজ কিভাবে চলবে। (রূহুল বয়ান এই আয়াত প্রসঙ্গ)

কাহিনী: আমীরুল মো'মেনীন হযরত উসমান গনী (রা.)'র যুগে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তিনি বাইর থেকে শস্য আমদানী করলেন। মদীনা শরীফে ব্যবসায়ীরা সম্মিলিতভাবে তা ক্রয় করতে এল। তিনি বললেন, আমি তাকেই শস্য দেব যে সাত শতগুণ লাভ দিবে। ব্যবসায়ীরা বলল, এইরূপ ক্রেতা কাকে পাবেন? তিনি বললেন, আমার প্রভু! এবং এই আয়াত পাঠ করলেন:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ الاية

যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যকণা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ। অতঃপর সমুদয় শস্য দান করে দিলেন।

وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ এর কতিপয় বিশ্লেষণ রয়েছে। প্রথমতঃ খোদায়ী নিয়ম হল–কারো থেকে নেন এবং কাউকে দান করেন। যদি তোমরা এইভাবে না দাও তা হলে অন্য উপায়ে তোমাদের ধনৈশ্বর্য অপরের কাছে পৌছাবেন। রোগ, মামলা-মোকাদ্দমা, চুরি ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ কারো প্রতি জীবিকা সংকুচিত করেন এবং কারো প্রতি সম্প্রসারিত। সুতরাং ধনীদের উচিৎ-দরিদ্রদের প্রতি দানশীলতা প্রদর্শন করা। তৃতীয়তঃ একই ব্যক্তির উপর কখনো সংকোচন হয় কখনো সম্প্রসারণ। সুতরাং মানুষ সম্প্রসারণের সময়কে যেন গুরুত্ব দেয় এবং আল্লাহর পথে দান-খায়রাত করে। এই সময় সর্বদা থাকবে না।

جو کل کرنا ہے اج ہی کر جو آج کرے سو اب کرلے

جب چڑیوں نے چگ کھیت لیا پھر ہو ہو سے کیا ہوت ہے

যা কাল করতে হবে তা আজই করে ফেল, আজ যা করবে তা এখন করে নাও। চড়ুই পাখির দল যখন শস্যক্ষেত্র খেয়ে শেষ করে দিবে তারপর হু হু করলে কি হবে?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূক্ষ্ম বিষয়ঃ قبض ও بصط অর্থাৎ সংকোচন ও সম্প্রসারণ প্রত্যেক স্তরের মানুষের জন্য হয়ে থাকে। ওয়ায়েয, আলেম, আবেদ, আমেল ও আল্লাহর অলিগণ কেউ সর্বদা এক অবস্থায় থাকে না। একবার সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া হাবীবাল্লাহ! যতক্ষণ আমরা আপনার পবিত্র মজলিসে থাকি আমাদের ক্বলবের অন্য অবস্থা হয়ে থাকে এবং যখন ঘর-বাড়িতে গিয়ে স্ত্রী-পুত্রদের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাই তখন আমাদের ক্বলবের ওই অবস্থা আর থাকে না। হুজুর ফরমালেন, যদি সর্বদা তোমাদের একই অবস্থা থাকতো তা হলে ফেরেশতাগণ তোমাদের সাথে মুসাফাহা করতো। বরং সময়ে সময়ে এইরূপ হয়ে থাকে। স্বয়ং নিজের ব্যাপারে ফরমান,

لِیْ مَعَ اللّٰہِ وَقْتٌ لَا یَسَعُنِیْ فِیْہِ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ

আল্লাহ তায়া'লার সাথে আমার এমন সময়ও হয়ে থাকে যেখানে কোন মুকাররাব ফেরেশতা ও মুরসাল পয়গাম্বরেরও অবকাশ থাকে না।

کے پرسیدازاں گم کردہ فرزند — کہ اے روشن گہر پیرے خردمند
ز مصرش بوے پیراہن شمیدی — چرا در چاہ کنعانش ندیدی
بگفت احواں برق جہانست — دے پید د دیگر دم نہاں ست
گہے بر طارم اعلی نشینم — گہے بر زیر پائے خود نہ بینم

কোন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল যিনি পুত্র হারিয়েছিলেন অর্থাৎ য়া'কূব আলাইহিস সালাম। হে উজ্জ্বল মুক্তা, ধী-শক্তির অধিকারী বৃদ্ধ! আপনি মিশর হতে জামার সুঘ্রাণ নিচ্ছেন, কিনআনের কূপে থাকতে তার ঘ্রাণ পাননি কেন? উত্তরে তিনি ফরমালেন, আমাদের অবস্থা জগতের বিদ্যুতের ন্যায়-মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি হয় অপর মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে যায়। কোন সময় আমরা উর্ধ্বাকাশে বিরাজ করি এবং কোন সময়ে পায়ের নীচের কাঁটাও দেখতে পায় না।

হযরত য়া'কূব আলাইহিস সালাম মিশর হতে তাঁর সন্তানের জামার সুগন্ধি পেয়েছেন কিন্তু যখন তিনি কিনআনের কূপে ছিলেন তখন সুগন্ধি অনুভূত হয়নি। এ হল قبض ওটা بصط

একদা ফকীর ও ধনীদের মধ্যে মুনাযারা (বিতর্ক) হয়েছিল। ধনীরা বলল, আমরা ফকীরগণ হতে উত্তম, কেননা আল্লাহ আমাদের থেকে কর্জ চেয়েছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফকীরগণ বলল, আমরাই উত্তম, কেননা আমাদের জন্য কর্জ চেয়েছেন। কারো নিকট থেকে কর্জ নেয়া ভালবাসার বিশেষ নিদর্শন নয়। হ্যাঁ, কারো জন্য কর্জ নেয়া ভালবাসার নিদর্শন। হুজুর আলাইহিস সালাম য়াহুদী থেকে কর্জ নিয়েছেন, তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য নিয়েছেন। সুতরাং পরিবার-পরিজনই ছিল প্রিয়, য়াহুদী নয়।

তাঁর দয়া দেখুন-ধন তাঁর, ধনী তাঁর অভাবী বান্দাও তাঁর। নিজের বান্দারগণকে নিজের ধন দান করেছেন। তারপর নিজেরই বান্দাগণকে দান করাচ্ছেন এবং তাকে কর্জের ন্যায় নিজের দায়িত্বে তুলে নিয়েছেন। নচেৎ বাস্তব বিষয় তো এই–

جان تو دی ہوئی اسی کی تھی — حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

প্রাণ তো তিনিই দান করেছেন। তাঁর পথে প্রাণ উৎসর্গ করার পরেও বাস্তব বিষয় হল–তাঁর হক আদায় হয়নি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইবাদতের ফযীলত

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ.

আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এইজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। (সূরা যারিয়াত, আয়াত-৫৬)

এই আয়াতে কতিপয় বিষয় প্রণিধানযোগ্য:

এক. পৃথিবীর প্রত্যেক কিছু কোন না কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। যে কেউ তার বিপরীত ব্যবহার করে তাকে পাগল বলে। টুপি পায়ে পরিধানকারী, জুতা মাথায় পরিধানকারী, গ্লাসে থুথু নিক্ষেপকারী এবং পিকদানে পানি পানকারী নিঃসন্দেহে পাগল। তাছাড়া যদি কোন বস্তু তার উদ্দেশ্য পূর্ণ না করে তাহলে সেটা মূল্যহীন ও বেকার হয়ে যায়। যদি ঘড়ি কোন কাজ না দেয় তখন ওটা নিক্ষেপযোগ্য হয়ে যায়। যদি ছাগী ও গাভী দুধ না দেয় বা কোন কাজে না আসে তখন কসাইকে হস্তান্তর করা হয়। এখন দেখতে হবে আমাদেরকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হল এবং সেই উদ্দেশ্য আমরা পূরণ করছি কিনা? এই আয়াত সেটাই বাতলে দিচ্ছে।

দুই. নিয়ম হল–প্রত্যেক নিম্নমানের বস্তুকে উন্নতমানের বস্তুর জন্য উৎসর্গ করা হয় হাত মাথার জন্য উৎসর্গ হয় যে, হাত গিয়ে মাথার আঘাত প্রতিহত করে। মাল জানের জন্য, জান আক্বর জন্য এবং আক্বকে ঈমানের জন্য উৎসর্গ করা হয়। আনাসির ও মাওয়ালীদে আরবাআহ অর্থাৎ জামাদাত (জড়পদার্থ) নাবাতাত (উদ্ভিদ) হায়ওয়ানাত (পশুপাখি) ও ইনসানের (মানুষ) মধ্যেও রয়েছে এই বিন্যাস। মাটিকে শস্যের জন্য বিদীর্ণ ও কুরবান করা হয়। উদ্ভিদকে পশু পাখিরা খায় এবং পশু পাখিকে মানুষেরা খায় এবং তাদের থেকে কাজ নেয়। মোটকথা, প্রত্যেক নিম্নমানের বস্তু উচ্চমানের বস্তুর জন্য কুরবান হয়। মানুষ সৃষ্টির সেরা وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ (আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি) সব কিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا (তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন) কিন্তু মানুষকে কোন মাখলূকের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। বরং পালনকর্তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ স্মর্তব্য যে, প্রত্যেক কিছু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মানুষেরই প্রয়োজনে সৃজিত। কিন্তু কোনটা খাওয়ার জন্য, কোনটা দেখার জন্য, কোনটা উপদেশ গ্রহণের জন্য। প্রত্যেক কিছু খাওয়ার জন্য সৃজিত হয়নি যে, শুকুরও খাবে, গরুও খাবে। প্রত্যেক নারী পুরুষের জন্য সৃজিত, কেউ মা হওয়ার জন্য, কেউ কন্যা, কেউ বোন, কেউ স্ত্রী হওয়ার জন্য। মানুষের প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন ভিন্ন। এসব কিছু ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করার জন্য সৃজিত হয়েছে। প্রত্যেক কিছু দ্বারা একই প্রয়োজন পূরণ করা যায় না। এখন প্রশ্ন হল–মানুষও কারো জন্য সৃজিত হয়েছে কিনা? অতএব ইরশাদ হয়েছে- সব কিছু তোমাদের জন্য এবং তোমরা আমার জন্য। সৃষ্টি তোমাদের জন্য এবং তোমরা স্রষ্টার জন্য। যদি তোমরা তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য অর্থাৎ ইবাদতকে পূরণ কর তা হলে আমিও তোমাদের হয়ে যাব। مَا أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّزْقٍ وَّمَا أُرِيْدُ أَنْ يُّطْعِمُوْنَ (আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাই না এবং এও চাই না যে, তারা আমার আহার্য যোগাবে) যদি আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে ব্যর্থ হই তা হলে বুঝে নিতে হবে- নমরূদ যখন খোদা দাবী করেছে তখন মশা তাকে এতই বিপন্ন করে তুলেছিল যে, দিন-রাত তার মাথায় জুতা পড়তে থাকে। কেননা সে তার মস্তিষ্ককে غَيْرِ مَا خُلِقَ لَهٗ অর্থাৎ যে উদ্দেশ্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে; তা ব্যতীত অন্য খাতে ব্যবহার করেছে। সুতরাং তার মাথায় غَيْرِ مَا خُلِقَ لَهٗ অর্থাৎ মাথার জন্য যা সৃষ্টি করা হয়নি তা ব্যবহার করা হয়েছে। সে উপাসক থেকে উপাস্য সেজে বসেছে অতএব জুতা পায়ের পরিবর্তে তার মাথায় গিয়ে পৌঁছেছে। যে মাথায় ইবাদতের খেয়াল রয়েছে তার উপর রয়েছে রাজমুকুট পক্ষান্তরে যে মাথায় প্রবৃত্তি পূজা রয়েছে তার উপর জুতা।

زندگی بے بندگی شرمندگی آدمی جہت از برائے بندگی

মানুষ বন্দেগীর জন্য সৃজিত, বন্দেগী বিহীন জীবন লজ্জাজনক।

তিন. কাউকে প্রতিপালক মনে করে কিংবা প্রতিপালকের অংশীদার কিংবা প্রতিপালকের সদৃশ ইত্যাদি মনে করে তাকে রাজী করার উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা হয় তা-ই ইবাদত। যতক্ষণ সর্বোচ্চ সম্মান (যা উপাস্য হওয়ার ফলে হয়ে থাকে)'র নিয়ত হবে না ততক্ষণ কর্তাকে আবেদ (ইবাদতকারী) বলা হবে না এবং তার কর্মকেও ইবাদত বলা হবে না। ইবাদতের দশটি সুরত রয়েছে। নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব, কুরআন তিলাওয়াত, সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির, হালাল উপার্জন, মুসলমানদের অধিকারসমূহ আদায় করা, ধর্মের প্রচার ও সুন্নাতের অনুসরণ। এ হল উসূলে ইবাদত (ইবাদতের মৌলিক কাঠামো) নচেৎ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যে কোন বৈধ কাজ, পার্থিব হোক বা ধর্মীয় যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় তা ইবাদত। যেমন শামী কিতাবুল উদহিয়্যা ও মিরকাতুল মাফাতীহ গ্রন্থে রয়েছে। তা ছাড়া আম্বিয়ায়ে কেরামের আনুগত্য, তাঁদের যে কোন ধরনের সম্মান এবং তাঁদের থেকে সাহায্য চাওয়া না গাইরুল্লাহর ইবাদত না শিরক। কেননা সাহায্য প্রার্থনার বিধান কুরআন করীমে রয়েছে تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى (সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য কর) اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ (ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর) اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ (যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন) وَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ (সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর) হযরত রবীআহ ইবনে কা'ব আসলামী (রা.) আরজ করলেন اَسْئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ (ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বেহেশতে আপনার সঙ্গ চাই) হুজুর আলাইহিস্ সালাম ফরমালেন, فَاَعِنِّىْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ (তুমি আমাকে তোমার পক্ষ থেকে অধিক সাজদার মাধ্যমে সাহায্য কর) (মিশকাত, বাবু ফাদলিস্ সুজূদ) এতে হুজুরের নিকট প্রার্থনা করা ও সাহায্য চাওয়া উভয়ই রয়েছে। এর বিশ্লেষণের জন্য আমাদের কিতাব 'জা-আল হক' দেখুন।

حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں
مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے

শাসক ও চিকিৎসক প্রতিকার ও ঔষধ দান করে আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুই দান করতে পারেন না! মরদূদ এটা কোন আয়াত ও হাদীসের মমার্থ?

এই আয়াতে জিনকে মানুষের পূর্বে এইজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৃষ্টির মধ্যে জিন ছিল পূর্বকার। তা ছাড়া জিন অধিক অবাধ্য, কারণ আগুনের তৈরী।

স্মর্তব্য যে, কাউকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সন্তুষ্ট করাও ইবাদত। সুতরাং মাতা-পিতা, উস্তাদ ও মুর্শিদকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সন্তুষ্ট করা আল্লাহ তায়া'লারই ইবাদত। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহুম ও নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়া'লা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর রেজামন্দি লাভের উদ্দেশ্যে সন্তুষ্ট করা আল্লাহর তায়া'লারই ইবাদত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

چکی کے پاٹن دیکھ کر دیا کبرا ے روئے
جو پاٹن میں آ گیو سوان میں بچانہ کوئے
چکیا چکیا سب کہیں کلیا کہے نہ کوئے
جو کلیا سے لاگو اس کا بال نہ بیکا ہوئے

যদি সকল বিপদাপদ থেকে বাঁচতে চাও তা হলে এক আল্লাহর হয়ে যাও। এক আল্লাহর এইভাবে হবে যে, তিনি এক প্রিয়তম বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন, যে ব্যক্তি ওই বান্দার হয়ে যাবে সে সবার হয়ে যাবে।

جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا کا
جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا

অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে ব্যক্তি আপনার গোলাম হবে সে আল্লাহর বান্দা হবে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর বান্দা হবে সে আপনারই গোলাম হবে।

বরং ওই ইবাদতই গ্রহণযোগ্য যা এই মাহবূবের আনুগত্য সহকারে করা হয়। মুশরিক, কাফির, খ্রিষ্টান ও য়াহুদীরা সংসার ত্যাগীও হয় প্রবৃত্তি দমনও করে কিন্তু না আবেদ (ইবাদতগুযার) হতে পারে না আরিফ (অলি)। মো'মিন যদিও দুনিয়ার সমুদয় কাজ কর্মে লিপ্ত থাকে কিন্তু একাগ্রচিত্তে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েই ইনশাআল্লাহ আবেদদের দলভুক্ত হয়ে যায়। কেননা সে হুজুরের আনুগত্যে পালনকর্তার ইবাদত করেছে। এইজন্যই আল্লাহ তায়া'লা ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেননি। নবী মোস্তফার পবিত্র জীবনই এই আয়াতের জীবন্ত তাফসীর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শবে ক্বদরের বর্ণনা

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۖ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

আমি এটা অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে; আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি, সে রজনী উষার আবির্ভাব পর্যন্ত। (সূরা ক্বদর)

এই সূরায় কতিপয় বিষয় প্রণিধানযোগ্য:

এক. এর শানে নুযূল (অবতরণের প্রেক্ষাপট) হল এই যে, একদা বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী ইস্রাঈলের এক ব্যক্তির কথা আলোচনা করলেন যার নাম ছিল শামঊন। তিনি এক হাজার মাস অর্থাৎ ৮৩ বছর ৪ মাস একাধারে জিহাদ ও অপরাপর ইবাদত করেছেন। তাঁর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ঈর্ষা হল, যা শরীয়ত মতে জায়েয; এবং নিরাশ হয়ে বললেন, আমাদের পূর্ণ বয়সও তো এই পরিমাণ নেই আমরা কিভাবে এই স্তরে পৌছব? তখন এই সূরা নাযিল হয়। এতে ইরশাদ হয়েছে, হে মুসলমানগণ! তোমাদেরকে এমন এক রজনী অর্থাৎ শবে ক্বদর প্রদান করা হচ্ছে যা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যদি তোমরা এই রজনীতে ইবাদত কর তা হলে তোমরা শামঊনের চাইতে অধিক সওয়াব লাভ করবে। অতএব যে কেউ তার জীবনে কয়েকবার শবে ক্বদরে ইবাদত করবে, তার সম্বন্ধে কি বলার আছে? এই সূরা থেকে প্রতীয়মান হল-মুসলমান সেই শ্রমিক, যে কাজ করবে অল্প কিন্তু পারিশ্রমিক পাবে অধিক। যেমন পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, য়াহুদী ওই শ্রমিকের ন্যায় যে অল্প পারিশ্রমিক নিয়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাজ করে, খ্রিষ্টান ওই শ্রমিকের ন্যায় যে যোহর থেকে আসর পর্যন্ত অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করে। কিন্তু হে মুসলমানগণ! তোমরা ওই শ্রমিকের ন্যায় যে আসর থেকে মাগরিক পর্যন্ত কাজ করে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক পায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুই. পবিত্র কুরআন ক্রমান্বয়ে ২৩ বছরে নাযিল হয়েছে এবং পঠিত আকারে নাযিল হয়েছে, লিখিত আকারে নয়। তা এইজন্য যে, ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হলে আয়াতসমূহের রহিতকরণ সম্ভব হয় এবং এতে নবীর সম্মান বেশী যে, সর্বদা মালিকের পক্ষ থেকে হাদিয়া আসতে থাকে। পঠিত আকারে নাযিল করলে অনেক অর্থ উচ্চারণ ভঙ্গিতে বুঝা যায় যা লিখিত আকারে হলে বুঝা যায় না। যেমন, কেউ বলল, 'তুমি হজ্বে যাও' এই একটি বাক্যে উচ্চারণভঙ্গির ভিন্নতায় অনেক অর্থ হতে পারে, আমর (আদেশ), ইখবার (সংবাদপ্রদান), ইস্তিফহাম (প্রশ্ন), তামাসখুর (পরিহাস), তাআজ্জুব (বিস্ময়প্রকাশ)। আর লিখিত আকারে হলে এগুলো বুঝা যায় না। কিন্তু এখানে আসছে أَنْزَلْنَا অর্থাৎ হঠাৎ এক সাথে নাযিল করেছি। এখন এই আয়াতকে বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিভাবে করা যাবে? এর কতিপয় উত্তর রয়েছে। প্রথমতঃ লওহে মাহফূয থেকে প্রথম আসমানে এই রজনীতে এক সাথে নাযিল হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে নাযিল হয়েছে ২৩ বছরে। অথবা হুজুর আলাইহিস্ সালামের প্রতি অবতরণ শুরু হয়েছে এই রজনীতে। তখন অর্থ হবে 'অবতরণ আরম্ভ করেছি।' অথবা প্রতি বছর রূহুল আমীন (জিবরীল) আলাইহিস্ সালাম এই রজনীতে এসে হুজুর আলাইহিস্ সালামকে পূর্ণ কুরআন করীম শুনাতেন। যদিও এই শুনানো বিধানাবলী চালু করার জন্য হতো না কিন্তু এখানে সেটাই বুঝানো হয়েছে। যখন কুরআন নাযিল হওয়ার কারণে এই রজনী অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ হয়েছে তা হলে যে রজনী বা যে দিবসে ছাহেবে কুরআনের আবির্ভাব হয়েছে তা তো এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ হওয়া উচিৎ। এই জন্য সায়্যিদুনা ইমাম মালেক (রহ.)'র অভিমত হল-শবে বেলাদত (প্রিয়নবীর শুভাগমনের রজনী) শবে ক্বদর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। সোমবার জুমাবার অপেক্ষা এবং মদীনার আবাদী মক্কার আবাদী অপেক্ষা উত্তম। কারণ জগতকুলের দুলার সাথে রয়েছে এগুলোর বিশেষ সম্বন্ধ।

তিন. এই রজনীকে কতিপয় কারণে লায়লাতুল ক্বদর বলে। এতে আগামী বছরের যাবতীয় বিষয় নির্ধারিত করে ফেরেশতাগণকে সোপর্দ করা হয়। ক্বদর অর্থ তাক্বদীর (নির্ধারণ)। অথবা ক্বদর অর্থ সম্মান অর্থাৎ সম্মানিত রজনী إِضَافَةُ مَوْصُوْفٍ إِلَى الصِّفَةِ অথবা এতে সম্মানিত গ্রন্থ অর্থাৎ কুরআন নাযিল হয়েছে। অথবা যে ইবাদত এতে করা হবে তার ক্বদর (গুরুত্ব) রয়েছে। অথবা ক্বদর অর্থ সংকোচন। যেমন কুরআন মজীদে রয়েছে وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ (এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন তার রিয্ক সংকুচিত করেন) অর্থাৎ এই রজনীতে ফেরেশতাগণ এই পরিমাণ আসেন যে, পৃথিবী সংকুচিত হয়ে যায়। এই সমস্ত কারণে তাকে শবে ক্বদর অর্থাৎ মহিমান্বিত রজনী বলা হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চার. এই রজনী কখন হয়? এটা তো নিশ্চিতভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই জানেন। এইজন্য যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে শবে ক্বদরের সাথে যুক্ত করে তালাক দেয় তা হলে যুক্ত করণের দিন থেকে এক বছর পর তালাক পতিত হবে। জুমাবারের মকবুল সময়, শবে ক্বদর, ইসমে আ'জম, সালাতে উস্‌ত্বা নিশ্চিতভাবে এইজন্য প্রকাশ করা হয়নি যে, মানুষ যেন এগুলোর সন্ধানে সচেষ্ট থাকে। তবে প্রকাশমান হল এই যে, শবে ক্বদর রমযানের সপ্তবিংশ রজনী। এর কতিপয় দলীল রয়েছে–প্রথমতঃ لَيْلَةُ الْقَدْرِ এর মধ্যে রয়েছে নয়টি বর্ণ এই সূরার মধ্যে এটা তিন স্থানে বলা হয়েছে যার সমষ্টি হচ্ছে ২৭। দ্বিতীয়তঃ এই সূরার মধ্যে সর্বমোট ত্রিশটি পদ (كلمه) রয়েছে এবং هِيَ সাতাশতম পদ। প্রতীয়মান হল–শবে ক্বদর সাতাশতম রজনী। (ইবনে আব্বাস, রূহুল বয়ান) তৃতীয়তঃ হযরত উসমান ইবনে আবি আসের গোলাম একদিন বলল, মনিব! দরিয়ার (লোনা) পানি একদিন মিঠা হয়ে যায়। তখন তিনি বললেন, এখন লক্ষ্য রাখবে, (কোন দিন হয়?) লক্ষ্য করা হয় যে, ওটা ছিল সাতাশ তারিখ। তা ছাড়া এখানে তো বলা হয়েছে- কুরআন শবে ক্বদরে অবতীর্ণ হয়েছে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ অর্থাৎ রমযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। প্রতীয়মান হল–শবে ক্বদর রমযান মাসে রয়েছে।

পাঁচ. এই রজনীর আমল হল–সর্বোচ্চ এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়বে। সর্বনিম্ন দু'রাকাত, মধ্যম একশ রাকাত। প্রতি রাকাতে একবার اِنَّا اَنْزَلْنَا এবং তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করবে। দু'রাকাত দু'রাকাত করে পৃথক করবে। সালামের পর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। তারপর দ্বিতীয় নিয়ত বাঁধবে। এইভাবেই আদায় করতে থাকবে এবং এই দোয়া পাঠ করবে اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ । এই রজনীতেই তারাবীহের মধ্যে কুরআন খতম করবে। যদি সম্ভব হয় সারারাত জেগে থাকবে। না হয় সেহরী খেয়ে আর ঘুমাবে না। সেহরী রাতের ষষ্ঠাংশে খাবে।

ছয়. وَمَا اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ এর মধ্যে ইরশাদ রয়েছে– কিসে আপনাকে জানালো শবে ক্বদর কি? এটা ইস্তেফহামে ইনকারী (অস্বীকৃতি সূচক প্রশ্ন) অর্থাৎ আল্লাহর ওহী ছাড়া অন্য কিছু এই গোপন রহস্যকে বলতে পারে না। অথবা ما বর্ণ نافيه (না সূচক অব্যয়) তখন دراية অর্থ হবে বিবেক দ্বারা জানা। অর্থাৎ হে মাহবূব! যদিও আপনি পূর্ণাঙ্গ বিবেকের অধিকারী নবী যে, সমগ্র জগতের বিবেক আপনার বিবেকের তুলনায় কোন গুরুত্ব রাখে না। যখন আপনিও এটা বিবেক দ্বারা জানতে পারেননি বরং আল্লাহর ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন তা হলে অন্য কোন বিবেকের কি অবকাশ যে, আপনা

www.AmarIslam.com

আপনি তা জানতে পারবে! যেখানে দিরায়তের (دراية) অস্বীকৃতি রয়েছে ওখানে এটাই বুঝানো হয়েছে। علم ও دراية এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

সাত. 'রূহ' এর ব্যাখ্যায় অনেক অবকাশ রয়েছে। 'রূহ' দ্বারা রূহুল আমীন হযরত জিবরীল আলাইহিস্ সালাম অথবা রূহুল কুদুস হযরত জিবরীল আলাইহিস্ সালামকে বুঝানো হয়েছে। অথবা রূহ ফেরেশতাদের একটি বিশেষ দল যা অন্যান্য ফেরেশতাগণ অপেক্ষা উত্তম। যেমন আমাদের রূহ বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে উত্তম। অথবা 'রূহ' বিশেষ এক ফেরেশতা যার রয়েছে এক হাজার মাথা, প্রত্যেক মাথায় এক হাজার মুখমণ্ডল, প্রত্যেক মুখমণ্ডলে এক হাজার মুখ, প্রত্যেক মুখে এক হাজার জিহবা। প্রত্যেক জিহবা দ্বারা হাজার ধরনের তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করেন একটা থেকে অপরটা ভিন্ন। কিন্তু এই রজনীতে রোযাদারের জন্য তাঁর সকল জিহবা দ্বারা মাগফিরাতের দোয়া করেন। অথবা রূহ সেই ইবাদত গুজার ফেরেশতাগণ যাদেরকে বাকী ফেরেশতারাও এই রজনী ব্যতীত অন্য কোন সময় দেখতে পায় না। মোটকথা, শবে ক্বদর বিশেষ রহমত নাযিল হওয়ার রজনী।

আট. سَلَامٌ এর দু'টি অর্থ রয়েছে। প্রথমতঃ সারারাত ফেরেশতাগণ দলে দলে আসতে থাকেন এবং তাদেরকে সালাম করতে থাকেন যারা এই রজনীতে নফল নামায পড়তে থাকে। অর্থাৎ এটা সালামের সময়। অথবা এটা যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার রজনী। এতে রহমত ও কল্যাণই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়–এতে না যাদুকর যাদু করতে পারে, না শয়তানেরা তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ থেকে প্রতীয়মান হল–এই বরকতসমূহ সারা রাতই থাকে। যে ব্যক্তি এই রাতের কোন অংশে ইবাদত করবে সে তার উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হবে না। এইজন্য যে ব্যক্তি সারারাত জেগে থাকতে পারবে না সে যেন সাধ্যানুযায়ী জেগে থাকে। নতুবা কমপক্ষে ইশা ও ফজরের নামায জামাআত সহকারে পড়বে। কারণ এই দু'নামায জমাআত সহকারে পড়লে পূর্ণরাত ইবাদতের সওয়াব পাওয়া যায়। তা ছাড়া দোয়া করতে চেষ্টা করবে। কারণ এটা দোয়া কবুল হওয়ার রজনী। স্মর্তব্য যে, দোয়া কবুল হওয়ার জন্য কিছু বিষয়ের প্রয়োজন। হালাল জীবিকা, সত্যবাদী জিহবা, হিংসা বিদ্বেষ থেকে পবিত্র বক্ষ, বিশুদ্ধ নিয়ত, মনের একাগ্রতা ও চোখের অশ্রু। সুতরাং এই রজনী আসার পূর্বে মুসলমানদের পরস্পর মনোমালিন্য দূরীভূত করা উচিৎ। নিজের মাতা-পিতা ও সাধারণ বড়জনদেরকে সম্মত করা উচিৎ। যদি মাতা-পিতা ইন্তেকাল করে থাকে তা হলে তাদের কবর যিয়ারত করবে এবং সকল মুসলমান ভাইদের জন্যও দোয়া করবে। আল্লাহ তায়া'লা ভাল কাজের তাওফীক দান করুন। আমীন!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

না'ত শরীফ

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا. مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ؗ سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۚ

তিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়ত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত দ্বীনের উপর এটাকে জয়যুক্ত করার জন্য। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সাজদারত দেখবেন, তাদের মুখমণ্ডলে সাজদার চিহ্ন থাকবে। (সূরা ফাত্‌হ, আয়াত-২৮ ও ২৯)

এই আয়াতে করীমা ঈমানী আকীদাসমূহের একটি সূচী। এতে আল্লাহ, রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের পরিচিতি প্রদান করা হয়েছে।

এক. আল্লাহ পাক তাঁর পরিচিতি এইভাবে প্রদান করেছেন যে, তিনি এমন শক্তিমান যিনি এইরূপ একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। রাসূলও এমন যাঁর গোলামগণ এইরূপ এইরূপ শানের অধিকারী। এর দু'টি কারণ, প্রথমতঃ যদি সূর্যকে দেখতে হয় তা হলে আয়না বা পানির মধ্যে দেখতে হয়। কেননা সূর্যকে মাধ্যম ছাড়া দেখার শক্তি চোখের নেই। সুতরাং মাধ্যমের প্রয়োজন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়া'লার যা'তকে মাধ্যম ব্যতিরেকে চেনা খুবই কঠিন ব্যাপার। অতএব খোদা দর্শনের একটি দর্পণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। অনুরূপভাবে যা'তে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়া'লা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চেনার জন্য রাসূল দর্শনের কিছু দর্পণের প্রয়োজন ছিল। তা হল সাহাবায়ে কেরাম। আল্লাহ তায়া'লাকে হুজুরের মাধ্যমে এবং হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে সাহাবীদের মাধ্যমে চিনতে হবে।

اس پہ ہو الذی گواہ شیشہ حق نمائی

دیکھ لے جلوہ نبی شیشہ چار یار میں

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ খোদা দর্শনের দর্পণ হল নবী, এর সাক্ষী هُوَ الَّذِىْ নবীর জলওয়া দেখে নিন চার সহচরের দর্পণে।

দ্বিতীয়তঃ কোন শিল্পকার তার শিল্পনৈপুণ্যের কথা যখন বর্ণনা করে তখন বলে, আমি সেই ব্যক্তি যে নিজের কৌশলের জোরে অমুক বস্তু তৈরী করেছি। কোন আলেম বলেন আমি সেই ব্যক্তি যে নিজের জ্ঞানের জোরে অমুক ছাত্রকে এইরূপ যোগ্য করে তুলেছি। অতএব জগত স্রষ্টাও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অনুপম এক সত্তার মাধ্যমে তাঁর শৈল্পিক উৎকর্ষ প্রকাশ করছেন এবং কুদরতের হস্তও এই অসাধারণ সত্তাকে নিয়ে গর্ব করছেন: هُوَالَّذِىْ الآية

তিন. একটি ফানূসে রংবেরংয়ের চারটি কাঁচ, মাঝখানে জ্বলছে বাতি। যখন সবুজ কাঁচের দিকে দেখবে তখন আলো সবুজ মনে হবে লালের দিকে দেখলে লাল, হরিদ্রাবর্ণের দিকে দেখলে হরিদ্রাবর্ণ। মূলতঃ আলো ও বাতি তো একটাই কিন্তু কাঁচ রংবেরংয়ের যেগুলো একটি বাতি থেকেই আলো ছড়াচ্ছে। অনুরূপভাবে সিদ্দীক, ফারুক, উসমান, হায়দারে কাররার ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের আয়না যারা নবী মোস্তফার এক বাতি থেকেই আলো ছড়াচ্ছেন। সবাই রংয়ের মধ্যে ভিন্ন কিন্তু মূলের মধ্যে এক। কোথাও সিদ্দীকিয়তের দীপ্তি, কোথাও ফারুকিয়তের শান দীপ্যমান, কোথাও উসমানের ধনৈশ্বর্যের বিকাশ, কোথাও হায়দারী শক্তির প্রকাশ। আমরা হুজুর আলাইহিস্ সালামকে মেনে কুরআন করীম মেনেছি অতএব আবার কেন কুরআন তাঁর পরিচয় প্রদান করল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। এতো তাহসীলে হাসিল (অর্জিত বিষয় অর্জন) হল। প্রথমে তিনি হৃদয়ে এসেছেন তারপর কুরআন মাথা ও হাতে এসেছে আবার কুরআনও তাঁর কথা বলছে এর কি কারণ?

وہ جس کو ملے ایمان ملا　　　ایمان تو کیا رحمان ملا

قرآن بھی جب ہی ہاتھ آیا　　　جب دل نے وہ نور ہدی پایا

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে ব্যক্তি পেয়েছে সে ঈমান পেয়েছে, ঈমান কেন দয়াময় আল্লাহকেও পেয়েছে। কুরআনও তখনই হাতে এসেছে যখন অন্তর হেদায়তের ওই নূরকে পেয়েছে।

উত্তর হল এই যে, হয়ত কোন অল্প্রলোক বলে বেড়াতো–হুজুর খোদা পর্যন্ত পৌঁছার ওসীলা এবং উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার পর ওসীলা ছেড়ে দেয়া হয়। যখন আমরা খোদা পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম এখন মোস্তফা আলাইহিস্ সালামের কি প্রয়োজন? যেমন লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে রেল ছেড়ে দেয়া হয়। অতএব উত্তর দেয়া হয়েছে– আমার মাহবুব তো এমন ওসীলা যেমন আলোর জন্য

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাতি-যদি বাতি নিভিয়ে দেয়া হয় তখন আলোও শেষ হয়ে যায়। এইজন্য আমি তাঁর সাক্ষ্য দিচ্ছি। তা ছাড়া কিয়ামত পর্যন্ত আপন পর সবাই কুরআন পড়বে। নামায, অযীফা ও আমলসমূহে তিলাওয়াত করা হবে। যখন ওতে নবী মোস্তফার নাম থাকবে তখন সর্বত্র হুজুরের চর্চা হবে। হুজুর আলাইহিস্ সালাম তো কুরআনের চর্চা করেছেন এবং কুরআন তাঁর আনয়নকারীর। তা ছাড়া কুরআন কিতাবুল্লাহ এবং হুজুর নূরুল্লাহ। নূর ছাড়া কিতাব পড়া যায় না। অনুরূপভাবে মাহবূব সাল্লাল্লাহু তায়া'লা আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিক্র ছাড়া কুরআনের জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। তা ছাড়া যিকরুল্লাহ আত্মার খোরাক এবং যিকরে মোস্তফা তার লবণ। লবণ ছাড়া পানাহার সামগ্রী পানসে।

ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو
نمکین حسن والا ھمارا نبی

যতক্ষণ পর্যন্ত প্রিয়নবী আলোচনায় আসবেন না সমস্ত যিকর পানসে। লাবণ্যময় সৌন্দর্যের অধিকারী আমাদের নবী।

অতএব কুরআনে হুজুর আলাইহিস্ সালামের যিকরের প্রয়োজনীয়তা ছিল।

চার. সাহাবায়ে কেরামদের চারটি গুণ এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সাথে হওয়া, কাফিরদের প্রতি কঠোর হওয়া, পরস্পরে সহানুভূতিশীল হওয়া, আল্লাহ তায়া'লার ইবাদতগুযার হওয়া। এই সমুদয় গুণ যদিও সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীন ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটা গুণের পূর্ণাঙ্গতম আঁধার। হযরত সিদ্দীক এমন সঙ্গ অবলম্বন করেছেন যে, আলমে আরওয়াহে (রূহ'র জগত) সাথে ছিলেন। যেমন রাওযুর রিয়াহীন দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রথম বিন্দু থেকে হুজুরের নূরের সৃষ্টি এবং দ্বিতীয় থেকে হযরত সিদ্দীকের (দেখুন আমাদের ফাতাওয়া) পৃথিবীতে ছায়ার ন্যায় সাথে ছিলেন, হিজরতে সাথে, গুহায় সাথে, এমনকি দাফনে সাথে, কবরে সাথে, কিয়ামতের দিন পুনরুত্থানে সাথে, জান্নাতেও থাকবেন সাথে।

والذین معہ کے ہیں فرد کامل
حشر تک پائے نبی پر دھرے سر صدیقؓ

অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) 'ওয়াল্লাযীনা মাআহু'র পূর্ণাঙ্গ একক, কিয়ামত পর্যন্ত নবীর চরণে পড়ে আছে সিদ্দীকের মাথা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মি'রাজে সাথে, নচেৎ সত্যায়ন তো সবাই করেছে কিন্তু সিদ্দীক উপাধি কেবল তাঁরই হয়েছে। প্রতীয়মান হল–তাঁর সত্যায়ন ভিন্ন। তাঁরই শানে ইরশাদ হয়েছে: ثانی اثنین (দু'জনের একজন)। অতঃপর এইভাবে ثانی (দ্বিতীয়) হয়েছেন যে, জন্ম, ওফাত, দাফন ও খিলাফতে সানীই ছিলেন।

ثانی اثنین ہیں بو بکر خدا میرا گواہ
حق مقدم کرے پھر کیوں ہوں موخر صدیق
زیست میں موت میں اور قبر میں ثانی ہی رہے
ثانی اثنین کے اس طرح ہیں مظہر صدیق

হযরত আবু বকর (রা.) হলেন 'সানী ইসনাইন'। আল্লাহ আমার সাক্ষী, আল্লাহ তাঁকে অগ্রবর্তী করছেন সুতরাং তিনি কেন পশ্চাৎবর্তী হবেন? জীবনে, মরণে ও কবরে সানী-ই রয়েছেন এইভাবে সানী ইস্নাইনের আঁধার হয়েছেন সিদ্দীক (রা.)।

اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ এর পূর্ণাঙ্গতম আঁধার ফারূকে আযম। একদা কিছু নারী দফ বাজাচ্ছিল। হযরত সিদ্দীক এলেন তখনও বাজাতে থাকে, হযরত যুননূরাইন উপস্থিত হলেন তখনও বাজাতে থাকে কিন্তু হযরত ফারূক উপস্থিত হলে তারা দফ ছেড়ে পালিয়ে যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন, হে উমর! শয়তান তোমাকে দেখে পালিয়ে যায় এমন কি তোমার পথও ছেড়ে দেয়।

সূক্ষ্ম বিষয়: এটা কি শয়তানী কাজ ছিল? তা হলে হুজুরকে দেখে শয়তান কেন পলায়ন করেনি? এবং হুজুর ওতে অংশগ্রহণ কেন করলেন? যদি শয়তানী না হয় তা হলে হযরত ফারূক দ্বারা কেন বন্ধ হল?

উত্তর হল এই যে, একই কাজ একজনের জন্য শয়তানী এবং অপরজনের জন্য বৈধ হতে পারে। হযরত ফারূকের জন্য এ ছিল শয়তানী কাজ, অন্যান্য মহাত্মাদের জন্য বৈধ। এই বিধান সূফীয়ায়ে কেরামের ক্বাওয়ালীর জন্যও প্রযোজ্য لِاَهْلِهٖ حَلَالٌ وَلِغَيْرِهٖ حَرَامٌ (তার আহল বা যোগ্য লোকের জন্য হালাল এবং যে তার আহল নয় তার জন্য হারাম) যদি মজলিসে কোন গায়রে আহল চলে আসে তখন সবার জন্য হারাম হয়ে যায়। তাঁর ফারূকিয়্যাতের এই শান যে, কারো যদি স্বপ্নদোষের রোগ হয় তা হলে শয়ন করার সময় বুকের উপর عمر (উমর) শব্দ লিখে যেন শয়ন করে। শয়তানী প্রভাব থেকে নিরাপদ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

থাকবে। এখনো রাফেযীদের উপর চলছে ফারূকী মার যে, মাতমের বাহানায় নিজেরাই তাদের সাহাবী বিদ্বেষের শাস্তি ভোগ করছে। বুক চাপড়ানো, মাথা থাপড়ানো মাতম নয় বরং ফারূকী শাস্তি।

হযরত উসমান গনী (রা.)'র যুগে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তিনি বাইর থেকে প্রচুর গম আমদানী করেছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারার ব্যবসায়ীরা অধিক লাভ দিয়ে তা ক্রয় করতে চাইলো। তিনি বললেন, আমি তাকেই দেব যে আমাকে সাতশগুণ লাভ দিবে। লোকেরা বলল, এমন ক্রেতা কে আছে? তিনি বললেন, আমার প্রতিপালক, এবং مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াত পাঠ করে সমুদয় গম দান করে দিলেন। এক যুদ্ধে তিন শত উট আসবাবপত্রসহ এবং সেই পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা (আশরফী) রাসূলের দরবারে হাজির করেছেন। সরকারের হুকুম হল–উসমান এখন যা ইচ্ছে তা করতে পারবে কোন কাজই তার জন্য ক্ষতিকর হবে না। এর মর্মার্থ হল–হযরত উসমানের সহায়তা আল্লাহর তাওফীকই করবে, কোন মন্দ কাজ তাঁর দ্বারা হতে পারবে না। যেমন পাখির ডানা কেটে দিয়ে তাকে বলা হল, যা উড়ে যা। এইভাবে হযরত উসমানের কূলবকে নিজেই তো অধিকৃত করে রেখেছেন, মন্দকাজ কিভাবে করবেন?

হযরত আলী (রা.)'র ইবাদতের অবস্থা ছিল এই–একবার তাঁর দেহ মোবারকে এমন এক তীর লেগেছিল যা (অত্যধিক ব্যথার কারণে) শরীর থেকে টেনে বের করা যায়নি। তখন সিদ্ধান্ত হল–নামাযের অবস্থায় টেনে বের হরা হবে। অতঃপর এমনই করা হল কিন্তু তাঁর অনুভবও হয়নি। কা'বা গৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন, শরীয়ত; ত্বরীকত, হাকীকত ও মা'রেফাতের মারকায তিনিই। হুজুরের বংশের তিনি মূল। আওলিয়ায়ে কেরাম তাঁর মাধ্যমেই বেলায়ত লাভ করেন।

এই আয়াত থেকে দু'টি বিষয় ভালভাবে প্রতীয়মান হল। প্রথমতঃ হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহর সত্তার পূর্ণাঙ্গতম বিকাশস্থল এবং হুজুরও এমন অদ্বিতীয় যে তাঁর প্রত্যেকটা গুণ, আমল, ইলম ও ক্ষমতা দেখে আল্লাহ তায়া'লার একত্ব ও অদ্বিতীয়তাই স্মরণ হয়।

بے مثل حق کے مظہر ہو　　پھر مثل تمہارا کیوں کر ہوا
نہیں کوئی تمہارا ہم رتبہ　　نہ کوئی ہمپایہ پایا

অর্থাৎ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো অনুপম স্রষ্টার বিকাশস্থল সুতরাং আপনার উপমা কিভাবে হতে পারে? আপনার সমকক্ষ ও সমমর্যাদাসম্পন্ন কেউ নেই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আপনাকে এক আল্লাহ অদ্বিতীয় করে সৃষ্টি করেছেন, আপনি প্রত্যেক গুণে অদ্বিতীয়। এ দ্বারা হুজুর আলাইহিস্ সালামের মুমতানিউন্ নযীর (যার উপমা হতে পারে না) হওয়া, ইলমে গায়ব (অদৃশ্য জ্ঞান), কুদরত (শক্তি) ইত্যাদি বিষয় ভালভাবে প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়তঃ যার ছাত্র এতই উন্নততর হয় যে, কেউ সিদ্দীক, কেউ ফারূক তা হলে উস্তাদ কেমন যোগ্য হবেন? অতএব যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামের ফযীলতকে স্বীকার করে না প্রকৃতপক্ষে সে হুজুর আলাইহিস্ সালামের শিক্ষার পূর্ণতাকে স্বীকার করে না। ছাত্রদের যোগ্যতার অস্বীকার মূলতঃ উস্তাদেরই অবজ্ঞা। আশ্চর্য–আসমানের সূর্য অপবিত্র ভূমিকে শুকিয়ে পবিত্র করে দেয় আর মদীনার সূর্য তাঁর সহচরগণকে পবিত্র করতে পারেন নি? সাল্লাল্লাহু তায়া'লা আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এটা এক রহস্যময় বিষয় যে, ছাহেবে শরীয়ত পয়গাম্বর চারজন,প্রধান প্রধান আসমানীগ্রন্থ চারটি, মুকাররাব ফেরেশতাদের সর্দার চারজন, ত্বরীকতের সিলসিলা চারটি, শরীয়তের সিলসিলা চারটি, মানুষের প্রকৃতি গঠনের উপাদান (আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস) চারটি সুতরাং খোলাফায়ে রাশেদীনও চারজন হওয়া জরুরী ছিল।

چار رسل فرشتے چار چار کتب ہیں دین چار
سلسلہ دونوں چار چار لطف عجب ہے چار میں
آتش وآب خاک وباد سب کا انہی سے ہے ثبات
چار کا سارا ماجرا ختم ہے چار یار میں

চারজনই বিশেষ সহচর এবং চারজনই আহলে বায়ত অর্থাৎ আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহুম। উৎসর্গ হোন–হযরত আলী এই চারের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত ওই চারের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত। হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম এঁদেরও পঞ্চতন ওঁদেরও পঞ্চতন। হযরত আলীর ইবাদতের এই অবস্থা–তাঁর জন্মও হয়েছে কা'বাগৃহে অর্থাৎ দেহের কা'বায় জন্মগ্রহণ করেছেন ঈমানের কা'বা। সূর্যও তাঁরই আসরের নামাযের জন্য খায়বারে ফিরে এসেছিল। তিনি স্বয়ং দু' দরিয়ার মিলনকেন্দ্র, ত্বরীকত ও শরীয়তের ইমাম। হুজুরের বংশের মূল। (দেখুন আমাদের মানাকিবে খোলাফায়ে রাশেদীন) হযরত উসমান গনীর বদান্যতায় এখনও হাজীগণ পানি পান করে। কেননা, মদীনাবাসীদের পানির অভাবের সময় তিনি রূমা কূপ ওয়াক্ফ করেছিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যারা বলে–হুজুর আলাইহিস্ সালামের সাহচর্য তাঁদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেনি তারা সাহচর্যের অবমাননা করে-ফুল তো পায়ের তালুকে সুবাসিত করে দেয় এবং সূর্যের কিরণ অপবিত্র ভূমিকে শুকিয়ে এত দূর হতে পবিত্র করে দেয়। কিন্তু প্রকৃত সূর্য ও সাচ্চা ফুল প্রভাব বিস্তার করবে না? হুজুরের সাহচর্যের তো সেই প্রভাব রয়েছে যে, কুলব কেন শরীরের রঙও পরিবর্তন করে দেয়।

কাহিনীঃ মাসনভী শরীফে রয়েছে– এক যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পানির অভিযোগ করলেন যে, ইসলামী ফৌজে পানি মোটেই নেই। হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সলাম হযরত আলী (রা.)কে নির্দেশ দিলেন–সামনের ওই পর্বতের পাদদেশে একজন কালো হাবশী উটের উপর করে পানি বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে আমার দরবারে নিয়ে এসো। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই হযরত আলী (রা.) পাহাড়ের পাদদেশে পৌছে যান। দেখতে পান হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের দেয়া সংবাদ অনুযায়ী উটের উপর একটি কৃষ্ণাঙ্গ গোলাম পানি পূর্ণ দু'টি বড় বড় মশক নিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, পানি এখান থেকে কতদূর? সে বলল, আমি গতকাল এই সময়ে পানি পূর্ণ করে রওয়ানা হয়েছি আজ এখানে এসে পৌছেছি। তিনি বললেন, পানি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? সে বলল, আমি এক ব্যক্তির গোলাম, সে আমার নিকট হতে পানির কাজই নিয়ে থাকে। আমি আগামী কাল এই সময়ে আমার ঘরে পৌছব। ওখান থেকে পানি দু'দিনের রাস্তা। তিনি বললেন, চলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে ডাকছেন, বলল: সে কে? তিনি বললেন, চলো তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাবে- তিনি কে? বলল, আমি তো যাব না। তিনি বললেন, তোমাকে যেতেই হবে। অবশেষে সে জিদ করে চলে যাচ্ছে। হযরত আলী মুরতাযা জোরপূর্বক তার উট এদিকে হাঁকিয়ে দেন। সে চিৎকার দিল, কে কোথায় আছ, তাড়াতাড়ি এসো, আমার পানি লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যার হস্ত শেরে খোদা আলী পাকড়াও করবেন তাকে মুক্ত করবে এমন কে আছে? সে চিৎকার দিতে থাকে কিন্তু আলী (রা.) নবীর দরবারে নিয়েই এলেন। ওই ক্রীতদাস যখন দরবার শরীফ দেখল, চেহরায়ে আনওয়ারের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই সব কিছু ভুলে যায়। উট থেকে নেমে এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকে। হতবাক হয়ে যায়–আমি কি জমীনে আছি না আসমানে? এরা কি মানুষ না স্বর্গীয় মাখলূক আসমান থেকে নেমে এসেছে!

آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے
تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ, চোখে চোখে ইশারা হয়ে যায়, তুমি আমার, আমি তোমার হয়ে যাই।

সরকারের নির্দেশ হল–তার পানি নিয়ে নাও। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই সাহাবায়ে কেরাম দৌড়ে এলেন, তাঁদের মশক পূর্ণ করলেন। তৃষ্ণার্তগণ পানি পান করলেন, উটগুলোকে পান করালেন। গোটা বাহিনীর মধ্যে পানিই পানি হয়ে যায়। কিন্তু গোলামের মশকে এক বিন্দুও কমেনি।

মাওলানা রূমী বলেন, সেদিন হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম মশকের সংযোগ হাওযে কাউছারের সাথে করে দিয়েছিলেন। ওখান থেকে পানি আসছিল। যখন সবার নেয়া শেষ হয়েছে তখন ফরমালেন, তোমরা তার পানি নিয়েছো বিনিময়ে তাকে রুটি দাও। সবাই স্ব স্ব তাঁবু থেকে রুটির টুকরা একত্রিত করে একটি থলেতে ভরে তাকে প্রদান করলেন। সোবহানাল্লাহ! সেটা কত মজার দান হবে যেখানে সিদ্দীক ও ফারূকের টুকরা একত্রিত হয়েছে। অতঃপর ফরমালেন, হে গোলাম! তোমার মশক দেখ একবিন্দুও কমেনি। আমরা আল্লাহর ফযল থেকে পানি নিয়েছি এবং তোমাকে রুটি দিচ্ছি। এগুলো নাও এবং চলে যাও। সে বলল, এখন কোথায় যাব? ডেকে এনে বের করে দিচ্ছেন? আমি শুনেছি-দানশীল লোক দরজায় কাউকে ডেকে এনে বের করে দেয় না। আমার এই অনুভূতি নেই যে, আমি কে? কোথায় থাকি এবং কোত্থেকে আসছি।

اک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں
دکھلا کے پھبن وہ سنا کے سخن مورا لوٹ گئے سب تن من دھن

অর্থাৎ এক চন্দ্রাকৃতি, ফর্সা শরীর, অবনমিত দৃষ্টি যার রয়েছে সৃষ্টিকুলের জ্ঞান। তিনি তাঁর শোভা দেখিয়ে মোবারক বাণী শুনিয়ে আমার দেহ, মন, ধন সবকিছু কেড়ে নিয়েছেন।

হুজুর ফরমালেন, আচ্ছা, তুমি এখানে এসো, চাদর শরীফে নিয়ে নিলেন। জানি না, দাতা কি দিয়েছেন ভিখারী কি নিয়েছে। কিছুক্ষণ পর চাদর শরীফ থেকে বের করলেন। তখন ওই কালো হাবশী ছিল চাঁদের ন্যায় সুন্দর।

جمال ہمنشیں در من اثر کرد
وگرنہ من چنان خاکم کہ ہستم

সাথে উপবেশনকারীর সৌন্দর্য আমার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে নচেৎ আমি অধমের এইরূপ হওয়ার কি যোগ্যতা?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর ফরমালেন, এখন আমি তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, যাও। সে বলল, খুব ভাল এবং উটের উপর বসে রওয়ানা হয়ে যায়। ওদিকে তার মনিব চিন্তা করছে গোলামের দেরী কেন হচ্ছে। যখন এই গোলাম এখান থেকে অবসর হয়ে তার শহরে পৌছল তখন তার মালিক এবং অপরাপর লোক তার সন্ধানে শহরের বাইরে এসেছিল। তারা দূর থেকে দেখতে পায় যে, উট তো আমাদের, মশকও আমাদের কিন্তু এই লোকটি অন্য কেউ। কেননা সে ছিল হাবশী, এ রূমী; সে ছিল কৃষ্ণাঙ্গ, এ শ্বেতাঙ্গ। তারা মনে করল–হয়ত এই লোকটি কোন চোর-ডাকাত হবে, যে আমাদের গোলামকে হত্যা করে আমাদের উট দখল করে নিয়েছে। এই মনে করে লোকজন লাঠি নিয়ে মারতে উদ্যত হল। গোলাম চিৎকার দিয়ে বলল, তোমরা আমাকে মারছো কেন? তারা বলল, তুমি কে? এবং আমাদের গোলাম কোথায় যে এই উট ও মশক নিয়ে গমন করেছিল? সে বলল, আমিই তো তোমাদের গোলাম। পরন্ত এখান থেকে পানি আনার জন্য গিয়েছিলাম, আমার নিকট ঘরের যাবতীয় বিষয় জিজ্ঞেস কর, সকলের নাম জিজ্ঞেস কর। (আমি সব বলে দিতে পারব) তারা বলল, তুমি কথা তো আমাদের গোলামের ন্যায় বলছো কিন্তু আকৃতি ও মুখাবয়ব তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তার রঙ কালো ওষ্ঠ নীল, দাঁত বড় বড় নাক ছিল মোটা ও চেপ্টা। তোমার রঙ ফর্সা, নাক পাতলা, দাঁত ছোট এবং ওষ্ঠ খুব সুন্দর। তুমি শ্বেতাঙ্গ, সে কৃষ্ণাঙ্গ। একি ব্যাপার? গোলাম বলল,

نا گہاں آن مغیث ہر دو کون　　مصطفٰے پیدا شدہ از بہر عون

صدر را دیدم و بدرے گشتہ ام　　صاحب فضلے و قدرے گشتہ ام

صبغۃ اللہ ہست رنگ خم او　　پستہا یک رنگ گردد اندر او

বিষয় হল এই–আমি ছিলাম হাবশী কিন্তু পানি নিয়ে আসার সময় পথিমধ্যে সদরুল উলা কাহফুল ওয়ারা সায়্যিদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পেলাম যার নিকট তাওহীদের একটি জলাধার ছিল যেখানে মানুষকে ডুবিয়ে তোলার পর কাউকে সিদ্দীক বানিয়ে দেন কাউকে ফারূক, কাউকে গনী, কাউকে কাররার। আমাকে ওই তাওহীদী রঙে ডুবিয়ে তুলেছেন যার ফলে আমার কালো অন্তর তো উজ্জ্বল হয়েই গেল আকৃতিও ফর্সা হয়ে যায়। আল্লাহ তায়া'লা ওই গোলামের অসীলায় আমাদের মন্দ রঙও যেন পরিবর্তন করে দেন। আমীন!

এতো ছিল একজন গোলামের অবস্থা যে এক মুহূর্ত পবিত্র সাহচর্য লাভ করেছিল। সাহাবায়ে কেরাম যারা ছায়ার ন্যায় সর্বক্ষণ সাথে থাকতেন, তাদের মর্যাদা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবুওয়াতের প্রয়োজনীয়তা

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖۤ اِذْ قَالُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَیْءٍؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِیْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّ هُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِیْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِیْرًاۚ

তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি যখন তারা বলে, আল্লাহ মানুষের নিকট কিছুই নাযিল করেনি; বলুন, তবে মূসার আনিত কিতাব যা মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশ ছিল, তা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে কিছু প্রকাশ কর ও যার অনেকাংশ গোপন রাখ তা কে নাযিল করেছিল? (সূরা আনআম, আয়াত–৯১)

এই আয়াতে করীমায় কতিপয় বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ শানে নুযূল দ্বিতীয়তঃ এর বিধানাবলী।

শানে নুযূল তো এই যে, য়াহূদীগণ ইসলামের উত্থান দেখে এবং মক্কার মুশরিকদের সামর্থহীনতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে এক কমিটি গঠন করল যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমরা শক্তি দ্বারা পরাভূত করতে পারিনি। এখন তাঁকে জ্ঞানের মোকাবিলার জন্য আহবান জানাতে হবে। অতএব তারা তাদের প্রধান পাদ্রী মালেক ইবনে সাইফের নিকট গমন করে এবং সরকারে দো'আলম আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের সাথে মুনাযারা (তর্কযুদ্ধ) করার জন্য তার নিকট আবেদন করে। সে সদর্পে বলল, আমি পূর্ব থেকেই বলে আসছিলাম যে, জ্ঞান ও গুণের মোকাবিলা তরবারি দ্বারা হয়না। তিনি তো জ্ঞান পেশ করছেন আর তোমরা তরবারি। যদি তোমরা পূর্ব থেকে আমার নিকট আসতে তা হলে এতদিনে আমি মুনাযারার মাধ্যমে ইসলামকে শেষ করে দিতাম। তারা ক্ষমার প্রার্থী হয়ে তাকে আনল। এ ছিল গর্দভের ন্যায় অত্যন্ত মোটা।

যখন তারা মুনাযারার উদ্দেশ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হল তখন হুজুর আলাইহিস্ সালাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সকলের পক্ষ থেকে মুনাযারা কে করবে? তারা সবাই বলল, ইনি আমাদের বড় আলেম। বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সম্বোধন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করতঃ ফরমালেন, তুমি-ই মুনাযারা করবে? আরজ করল, হ্যাঁ, তিনি ফরমালেন, তুমি তাওরাত পড়েছো? বলল, হ্যাঁ। তিনি ফরমালেন তুমি কি তাওরাতের এই আয়াতও পড়েছো?

اِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْحِبْرَ السَّمِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ পাক হারামখোর মোটা আলেমকে ঘৃণা করেন? সে বলল, হ্যাঁ। হুজুর ফরমালেন তুমি-ই তো সেই বিলাসী মোটা আলেম, তাওরাতের হুকুম অনুযায়ী তুমি বারেগাহে ইলাহী হতে বহিস্কৃত। তুমি না রোযা রাখ না অন্য কোন ইবাদত কর, সবসময় বিলাসিতায় লিপ্ত থাক। সে রাগে উত্তেজিত হয়ে বলল, مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ আল্লাহ কোন মানুষের নিকট কিছুই নাযিল করেনি। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, এই হতভাগারা আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আসমানী কিতাবসমূহকে অস্বীকার করে দিয়েছে। আল্লাহ তায়া'লার মর্যাদাই উপলব্ধি করেননি। য়াহুদীরা তাকে খুবই সম্মান ও মর্যাদা সহকারে এনেছিল এখন তার দূর্নাম করতে লাগল যে, তুমি তো মূসার ধর্মও শেষ করে দিয়েছো। সে বলল, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার রাগ তুলে দিয়েছে। মোটকথা, তাকে নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে তদস্থলে কা'ব ইবনে আশরাফকে নেতৃত্ব প্রদান করে। তাকে দুঃখজনকভাবে লাঞ্ছিত করতঃ বলল, যখন আল্লাহ কোন মানুষের নিকট কিছুই নাযিল করেননি তা হলে মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট তাওরাত কে নাযিল করেছে? আরে হতভাগা! তুমি এটা কি বলে দিলে?

দুই. এ থেকে প্রতীয়মান হল–নবীগণ ও আসমানী কিতাবসমূহের অস্বীকার মূলতঃ খোদার রাবুবিয়াতের অস্বীকার। মালেক যখন নাযিল করণকে অস্বীকার করল তখন ইরশাদ হয়েছে–সে আল্লাহকে মর্যাদা দেয়নি। এইজন্য আল্লাহ رب (প্রতিপালক) اب (পিতা) নন। পিতা কেবল দৈহিক লালন-পালনের জিম্মাদার হয়ে থাকে। রূহানী লালন-পালনের জন্য সন্তানগণকে উস্তাদ ও পীর-মাশায়েখের নিকট পাঠাতে হয়। পক্ষান্তরে রব (প্রতিপালক) শারীরিক ও আত্মিক সব ধরনের প্রতিপালন করেন। যে প্রভু শারীরিক প্রতিপালনের জন্য এই ধরনের ব্যবস্থা করেছেন যে, প্রত্যেক ঋতুতে প্রত্যেক দেশের আবহাওয়া অনুযায়ী ফল-মূল ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। রোগ-ব্যাধি দূরীভূত করার জন্য ডাক্তার, কবিরাজ, সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং কিভাবে সম্ভব যে, আধ্যাত্মিকতায় তিনি মানুষকে তৃষ্ণার্ত রেখে দিবেন এবং রূহানী রোগ-ব্যাধির চিকিৎসক ও ডাক্তার সৃষ্টি করবেন না! এটা সম্ভব নয়। শরীরের পালনকর্তাকে মুরব্বী এবং সব ধরনের পালনকর্তাকে রব বলা হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিন. এ থেকে প্রতীয়মান হল–নবীদের মর্যাদা ও সম্মান আল্লাহ তায়া'লারই সম্মান এবং তাঁদের অবজ্ঞা আল্লাহরই অবজ্ঞা। তাঁদের সম্মান দাখিল ফিদ দ্বীন অর্থাৎ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। যদি কেউ হুজুরের পবিত্র পাদুকার অবমাননা করে তা হলে ইসলাম বিদায় নিয়ে যাবে। দেখুন মালেক আসমানী কিতাব ও পয়গাম্বরগণকে অস্বীকার করেছিল কিন্তু বলা হয়েছে–আমাকে মর্যাদা দেয়নি।

চার. এ থেকে এও প্রতীয়মান হল–নবীগণকে উলূমে লাদুনিয়া দান করা হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো ছাত্র নন।

لکھے نہ پڑھے جناب والا شاگرد رشید حق تعالیٰ

অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ছাড়া অন্য কারো নিকট লেখাপড়া করেননি।

পক্ষান্তরে মালেক ইবনে সাইফ বড় পারদর্শী আলেম ওলামাদের দলসহ এসেছে। এতদসত্ত্বেও একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। তা ছাড়া তারা প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে আর এখানে হঠাৎ মুনাযারা হয়েছে। বলুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তর্কশাস্ত্র কোথায় শিখেছেন যে, প্রথম প্রশ্নেই য়াহুদী আলেমগণ হতবুদ্ধি হয়ে গেল?

পাঁচ. এইজন্য হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম চোখ খুলতেই আরশের উপর লিখিত কলেমা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ পড়ে নিয়েছেন। বাকী এটা জিজ্ঞেস করা- হে খোদা! এটা কার নাম? তাঁর জ্ঞানহীনতার কারণে নয়। বরং এই প্রশ্ন ছিল প্রার্থনার জন্য। অতএব পরে আরজ করেছেন اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ هٰذَا الْوَالِدَ بِهٰذَا الْوَلَدِ হে আল্লাহ! এই সন্তানের অসীলায় তাঁর পিতাকে দয়া কর। যদি কারোর কিছু প্রার্থনা করতে হয় তখন বলে, আপনার নিকট এটা কি? এটা দেখছি খুবই ভাল। উদ্দেশ্য–আমাকে দিয়ে দিন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শাফায়াতের বর্ণনা

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ.

কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? (সূরা বাকারা , ২৫৫)

এই আয়াতে কতিপয় বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এই আয়াত কেন অবতীর্ণ হল? এ থেকে কি কি মাসআলা জানা গেল? শাফায়াত হবে কিনা? শাফায়াত কে করবে? শাফায়াত কত প্রকার?

এক. পূর্ণ আয়াতুল কুরসী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাফির ও বিধর্মীদের খণ্ডন। যারা স্রষ্টাকে স্বীকার করে না তাদের খণ্ডন হয়েছে اَللّٰه দ্বারা। যারা একাধিক স্রষ্টা মানে তাদের খণ্ডন হয়েছে لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ দ্বারা। যারা আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকার করে তাদের খণ্ডন হয়েছে اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ইত্যাদি দ্বারা। যারা বলে, 'আলেমগণ! যেন কোন মাযহাবের খণ্ডন না করে। তা হলে আলেমগণ কি কুরআন ছেড়ে দিবে? কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য স্থানে রয়েছে বিধর্মীদের খণ্ডন। আয়াতুল কুরসী তো বিশেষভাবে কাফিরদের খণ্ডনের জন্যই নাযিল হয়েছে।

কাফিরগণ তাদের মূর্তি সম্বন্ধে দু'ধরনের আক্বীদা পোষণ করতো। প্রথমতঃ তাদের মধ্যে ঈশ্বরত্বের (الوهيت) অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যেমন ফুলের মধ্যে সুগন্ধ। এইজন্য তারা মূর্তিগুলোকে উপাস্য ও অংশীদার (شركاء) এবং খোদাকে বড় উপাস্য (اله اكبر) বলতো। দ্বিতীয়তঃ এগুলো ছোট খোদা, এরা বড় খোদার নিকট সুপারিশ করবে এবং বড় খোদাকে চাপের মুখে তাদের সুপারিশ মানতে হবে। যেমন বাদশাহকে মন্ত্রীদের সুপারিশ মানতে হয়। কেননা, তাদের বিদ্রোহ ক্ষমতা হারানোর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই আয়াতে আক্বীদাদ্বয়ের পূর্ণ খণ্ডন হয়ে গেল যে, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারো মুখ খোলারও সাহস নেই, এমতাবস্থায় অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ কিভাবে হবে? যেন বলা হয়েছে– ماذون له (অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি)ই সুপারিশ করবে এবং মূর্তি ماذون له অর্থাৎ অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। চাপ প্রয়োগে সুপারিশ কেউ করতে পারে না। কারণ আল্লাহর উপর চাপ প্রয়োগের ক্ষমতা কারোর নেই। অতএব এটা বিশেষ সুপারিশের এবং বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সুপারিশের অস্বীকৃতি, প্রত্যেক সুপারিশের নয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুই. যেমনিভাবে এই আয়াতে বিশেষ সুপারিশের অস্বীকৃতি রয়েছে তেমনিভাবে বিশেষ সুপারিশের প্রমাণও রয়েছে তা হল শাফায়াত বিল ইয্ন (شفاعت بالاذن) অর্থাৎ অনুমতি সাপেক্ষে সুপারিশ। সুতরাং এই আয়াত সুপারিশের অস্বীকৃতির জন্য নয় বরং সুপারিশেল প্রমাণের জন্যই। যদি সুপারিশ সঠিক না হয় তা হলে জানাযার নামায, কবর যিয়ারত জীবিত মুসলমান কর্তৃক মৃতদের জন্য দোয়া সবই বেকার। কেননা, এগুলো তো সুপারিশই। বরং শিশুর নামাযে জানাযায় তো পরিষ্কার শব্দ রয়েছে اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا (হে আল্লাহ! তুমি তাকে আমাদের অগ্রবর্তী করে দাও) فرط বলা হয় পথপ্রদর্শনের জন্য অগ্রে গমনকারীকে এবং পরে আসছে وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا (হে আল্লাহ! তুমি তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী করে দাও। বড়দের সুপারিশ আমরা করছি এবং ছোট শিশুদেরকে আমাদের সুপারিশকারী করে দাও।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর ছেলের জানাযার জন্য চল্লিশজন নামাযীর অপেক্ষা করেছেন। কারণ যেখানে চল্লিশ জন নেককার মুসলমান একত্রিত হয় ওখানে কোন একজন অলি অবশ্যই থাকে। (মিরকাতুল মাফাতীহ) অতএব যদি জানাযার নামাযে চল্লিশজন মুসলমান হয় তা হলে তাদের মধ্যে কেউ অলি হবে এবং অলির সুপারিশ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে।

তিন. সুপারিশ করবেন আম্বিয়া, আউলিয়া, ওলামা, মাশায়েখ, হাজরে আসওয়াদ, কুরআন, খানায়ে কা'বা, রমযান এবং ছোট ছোট শিশুগণ। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–রমযান বলবেন, হে খোদা! আমি অমুক বান্দাকে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত রেখেছি। আজ আমার সুপারিশ তার পক্ষে কবুল কর। কুরআন বলবেন, হে খোদা! আমি তাকে রাত্রিবেলায় আরাম থেকে বিরত রেখেছি আমার সুপারিশ তার পক্ষে কবুল কর। অতএব তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে। মাওলভী আবদুল হাই সাহেব হিদায়ার ভূমিকায় হাকেমের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন– যখন ফারুক আযম (রা.) হাজরে আসওয়াদকে বললেন যে, তুমি একখানা পাথর মাত্র, না কারো লাভ করতে পার না ক্ষতি, যদি আমি হুজুর আলাইহিস্ সালামকে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম তা হলে আমি কখনো চুম্বন করতাম না। তখন মাওলা আলী (রা.) বললেন, হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম ফরমায়েছেন, কিয়ামতের দিন তার চোখ ও মুখ হবে এবং হাজীদের জন্য সুপারিশ করবে। মী'সাক দিবসের অঙ্গীকার যা রূহসমূহ থেকে নেয়া হয়েছিল তা সমুদয় সাক্ষীসহ ওতেই সংরক্ষিত আছে। এটা আল্লাহর আমানতদার এবং মুসলমানদের সাক্ষী। অনুরূপভাবে সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, যে নারীর তিনটি ছোট বাচ্চা মারা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যায় তারা তার জন্য সুপারিশকারী হবে। যদি দু'জন মারা যায় তা হলে দু'সুপারিশকারী, একজন মারা গেলে একজন সুপারিশকারী হবে। যার কেউ মারা না যায় তা হলে তার জন্য আমিই হব সুপারিশকারী। প্রতীয়মান হল–ছোট ছোট বাচ্চাগণও মাতা-পিতার জন্য সুপারিশকারী হবে।

সূক্ষ্ম বিষয়: যখন এসব কিছুই সুপারিশ করবে তা হলে হুজুরকে শফীউল মুযনেবীন কেন বলা হয়?

উত্তর হল এই যে, কিয়ামতের দিনের রয়েছে দু'টি অবস্থা। প্রথমতঃ আদল তথা ইনসাফের সময়, দ্বিতীয় ফজল তথা অনুগ্রহের সময়। দ্বিতীয় সময়ে সবাই সুপারিশ করবে। কিন্তু প্রথম সময়ে কেউ সুপারিশ তো দূরে মুখ খোলারও সাহস করবে না। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত সবাই বলবেন, نَفْسِیْ نَفْسِیْ اِذْهَبُوْا اِلٰی غَیْرِیْ (আমি নিজের ব্যাপারে শঙ্কিত অন্য কারোর নিকট যাও)

خلیل ونجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں نہ نبی
یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے

খলীল, নজী, মাসীহ, সফী সবাইকে বলা হল কোথাও কোন নবীকে বাদ রাখা হয়নি এই যে, অজ্ঞাতসারে মাখলূক এদিক ওদিক ঘুরাফেরা করবে ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আপনারই শান প্রকাশের জন্য।

পৃথিবীতে তো সবাই জানে যে, হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম গুনাহগারদের শাফায়াতকারী কিন্তু ওখানে পৌছে ইমাম বুখারী ও মুসলিম নয় হযরাতে আম্বিয়ায়ে কেরামেরও স্মরণ থাকবে না যে, আজ শাফায়াতকারী কে? হ্যাঁ, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম বলবেন, আমিই সে ফজরের তারা যে পৃথিবীতে তাঁর শুভাগমনের সংবাদ দিয়েছিলাম, আজও বলছি যে, হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামই শফীউল মুযনেবীন। এটা এইজন্য ছিল যে, হয়ত কেউ বলতো–এই শাফায়াতে হুজুরের কি বিশেষত্ব? এইরূপ শাফায়াত তো যে কোন এক জন নবীর নিকট গেলেই হয়ে যেতো। দেখিয়ে দিলেন–আজ মাহবূবে রাব্বিল আলামীন ব্যতীত তোমাদের কেউ নেই। সর্বত্র ধরণা দিয়ে দেখ–নবী মোস্তফার দরজা ছাড়া কোথাও তোমাদের ঝুলি পূরণ হবে না।

চার. শাফায়াত তিন প্রকারের হবে। মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য, গুনাহ মাফ করানোর জন্য এবং হাশরের ময়দান থেকে পরিত্রাণ দেয়ার জন্য। শেষোক্ত শাফায়াতের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপকার কাফিরও ভোগ করবে কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের কেবল মো'মিনদের জন্য হবে এবং প্রথম প্রকারের শাফায়াত থেকে সুন্নাত বর্জনকারী বঞ্চিত থাকবে। (দেখুন ফাতাওয়া শামী)।

যখন জাহান্নাম থেকে তাদেরকেও বের করে আনা হবে যাদের অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান রয়েছে তখন আল্লাহ তায়া'লা বলবেন, এখন আমার পালা। তাঁর কুদরতী মুঠ ভর্তি করে জাহান্নামী লোকদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন। তারা সেই সমুদয় লোক যারা আল্লাহর কাছে মো'মিন ছিল কিন্তু শরীয়তের বিচারে মো'মিন ছিল না। অর্থাৎ যাদের অন্তরে তাসদীক (বিশ্বাস) এসেছিল কিন্তু মুখে স্বীকার করার সুযোগ পায়নি। অথবা যাদের নিকট নবুওয়াতের তাবলীগ পৌছেনি, বিবেক দ্বারা একত্ববাদী হয়েছে। তারা না কাফির হবে না শরয়ী মো'মিন। (রূহুল বয়ান-এই স্থান)

পাঁচ. কাফিরের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা হারাম, কারণ এটা শাফায়াত। এই জন্য প্রাপ্তবয়স্কের জানাযায় পড়া হয় اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَیِّنَا وَمَیِّتِنَا যদি এই মুর্দা মুসলমান হয় তবে দোয়ার মধ্যে অন্তর্ভুত হবে আর যদি ঈমান নিয়ে যেতে না পারে তা হলে দোয়া থেকে বহির্ভূত থাকবে। পক্ষান্তরে শিশু মুর্দা– সে তো নিঃসন্দেহে মো'মিন। অনুরূপভাবে কবরস্থানে গিয়ে বলতে হয় دَارَ قَوْمٍ مُّسْلِمِیْنَ

ছয়. আল্লাহর অলি ও মাশায়েখদের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হল–এই মহাত্মাগণ জালের গিরার ন্যায়। যদি একটা গিরাও খুলে যায় তা হলে বাকীগুলোও আস্তে আস্তে খুলে যাবে। রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে মানুষ কুরআন, হাদীস ও আউলিয়ায়ে কেরামদের বায়আতের বিশ্বাসী ছিল। সাহাবীগণ হুজুর আলাইহিস্ সালামের এবং তাবেয়ীগণ সাহাবায়ে কেরামের বায়আত গ্রহণ করেছেন। এভাবে চলে আসছে আমাদের যুগ পর্যন্ত। কিন্তু এখন চতুর্দশ শতাব্দীর মুসলমান যারা নিজের উক্তি মতে সাহাবীগণ হতেও উত্তম; প্রথমতঃ ওলামাদের সংশ্রবহীন তারপর মাশায়েখগণ হতে বিমুখ অতঃপর ফিক্হ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে তারপর হাদীস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যদি রাত-দিন এভাবে চলতে থাকে তা হলে আগামীতে কুরআনকেও ছেড়ে দিবে। আল্লাহর প্রীতভাজনদের বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি হল ঈমানকে ধ্বংস করা।

সাত. اللّٰه থেকে عظیم পর্যন্ত আল্লাহ তায়া'লার এগারটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। কতেক সূফীয়ায়ে কেরাম বলেন, من ذا الذی থেকে بما شاء পর্যন্ত হুজুরের তিনটি গুণ বর্ণিত হয়েছে। প্রথম পাঁচটি এবং শেষের তিনটি আল্লাহর গুণ। যেমন: কলেমার মধ্যে প্রথমে ও শেষে আল্লাহর নাম রয়েছে এবং মাঝখানে নবী মোস্তফা আলাইহিস্ সালামের নাম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

معجزہ شق القمر کا ہے مدینہ سے عیاں
مہ نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں

অর্থাৎ, 'শাক্কুল কামার' (চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া)'র মো'জেযা مدینہ শব্দ থেকে প্রকাশমান مہ (চন্দ্র) দ্বিখণ্ডিত হয়ে دین (ধর্ম) কে বাহুবন্ধনে নিয়েছে।

من ذا الذی থেকে প্রতীয়মান হল– শাফায়াতে কোবরা অনুমতিপ্রাপ্ত খাস বান্দা ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারবে না। ওই খাস বান্দার গুণ হল এই যে, তিনি মানুষের ইহকালিন ও পরকালিন অবস্থাদি জানেন কিন্তু মানুষ যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না। (রূহুল বয়ান এই স্থান) প্রতীয়মান হল– মোস্তফা আলাইহিস্ সালামের দান সকলের জন্য সমান, গ্রহীতাদের স্ব স্ব পাত্র ভিন্ন। যেমন সমুদ্র থেকে কেউ মশক পূর্ণ করে, কেউ ঠিলা, কেউ অঞ্জলি এবং কেউ পেয়ালা। অনুরূপভাবে এখানে কেউ সিদ্দীক হয়েছে, কেউ ফারূক, কেউ বদ নসীব আবু জাহল।

کوئی ذات بس کے مہک رہی کسی دل میں اس سے کھٹک رہی

কোন সত্তা তাঁর পরশ পেয়ে সুবাসিত হচ্ছে এবং কোন অন্তর তাঁর দ্বারা যাতনা ভোগ করছে।

তাঁর দীপ্তিতে কোনটা ফুল হচ্ছে কোনটা কাঁটা। যেমন সূর্য তার কিরণ এক রকমই ছড়ায় কিন্তু কিরণ গ্রহীতাগণ ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোকিত হয়। দীপ্তি এক কিন্তু সিদ্দীকী চোখ এবং বূজাহলী চোখ ভিন্ন ভিন্ন।

مصطفٰے را دید بو جہل و بگفت زشت نقشے کز بنی ہاشم شگفت
دید صدیقش بگفت اے آفتاب نے ز شرقی نے ز غربی خوش تاب

একদিন আবু জাহল নবী মোস্তফাকে দেখে বলল, আপনার মত বিশ্রী বুন হাশেমের মধ্যে কেউ হয়নি (নাউযুবিল্লাহ) সিদ্দীকে আকবর তাঁকে দেখে বললেন, হে নবুওয়াতের সূর্য! প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে আপনার মত সুন্দর কেউ নেই।

যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সুপারিশকারীর জন্য আবশ্যক। যেন অযোগ্যের সুপারিশ না হয় এবং যোগ্য ব্যক্তি সুপারিশ থেকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বঞ্চিত না থাকে। যেমন ডাক্তারের জন্য চিকিৎসা সাধ্য ও চিকিৎসার অসাধ্য রোগীর জ্ঞান থাকা জরুরী। এইজন্য সাহাবায়ে কেরামকে হুজুর আলাইহিস্ সালাম দু'টি কিতাব প্রদর্শন করেছেন যার মধ্যে জান্নাতবাসী ও দোযখবাসীদের নাম, পরিচিতি মোট সংখ্যাসহ লিপিবদ্ধ ছিল। এক ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দানে কঠোর পরিশ্রম করছিল, তাকে উদ্দেশ্য করে ফরমায়েছেন, এই লোকটি জাহান্নামী। পরিশেষে দেখা গেল সে আত্মহত্যা করেছে। এতে প্রতীয়মান হল– সৌভাগ্য ও হতভাগ্যের জ্ঞান হুজুর আলাইহিস্ সালামের রয়েছে, তা ব্যতীত শাফায়াত সম্ভব নয়। অজ্ঞদের এই উক্তি যে, কিয়ামতের দিন সাহাবায়ে কেরাম ও মুরতাদদের পরিচয়ও তাঁর থাকবে না। (নাউযুবিল্লাহ) কেননা হাদীস শরীফে রয়েছে–কতেক লোককে হাওযে কাউছারে আসার পথে বাধা প্রদান করা হবে। আমি বলব, এরা তো আমার সাহাবী। ফেরেশতাগণ আরজ করবেন, لَا تَدْرِیْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَکَ (আপনি জানেন না যে, আপনার পর তারা কি অপকর্ম করেছে) এই দলীল প্রদান সম্পূর্ণ ভুল। কেননা আজ তো হুজুরের জানা আছে এবং অপরাপর লোকদেরকেও জানাচ্ছেন আর সেদিন ভুলে যাবেন, এটা অসম্ভব। এটা কেবল তাদেরকে লজ্জিত করার জন্য এবং ধমকি স্বরূপ বলা হবে। কাফিরগণকে বলা হবে ذُقْ اِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْکَرِیْمُ (আস্বাদন কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত ও অভিজাত) দেখুন, আল্লাহ কাফিরকে আযীয ও করীম বলবেন। আল্লাহর কি জানা নেই?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কবরের প্রশ্নোত্তরের বর্ণনা

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ.

যারা ঈমানদার আল্লাহ তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে শাশ্বতবাণীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা জালিম আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত-২৭)

এই আয়াতে করীমা কবরের আযাব সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। এতে তারই আলোচনা রয়েছে। এখানে কতিপয় বিষয় প্রণিধানযোগ্য। কবরের আযাব কার হয়? তার হাকীকত কি? কবরে প্রশ্নোত্তর কিভাবে হয়? এবং এতে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া গেল?

এক. কবরের প্রশ্নোত্তর এক বিষয় এবং কবরের আযাব অন্য বিষয়। সবার সাথে প্রশ্নোত্তরও হয় না এবং সকলকে আযাবও প্রদান করা হয় না। আট প্রকারের লোকের নিকট কবরের প্রশ্নোত্তর হয়না। (১) নবীগণ (২) শহীদগণ (৩) জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণকারীগণ (৪) শিশুগণ (৫) যারা জুমার দিন বা (৬) রাত্রি মৃত্যুবরণ করে (৭) যারা সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং (৮) যারা প্রত্যেক দিন সূরা মুলুক পাঠ করে। যেমন- শামী কিতাবুদ্ দাফনে বর্ণনা করা হয়েছে। কবরের আযাবও এক রকমের নয়। মুশরিক ও কাফিরগণ যারা প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে তাদের আযাব এক ধরনের এবং কিছু গুনাহগার মুসলমান যেমন, প্রশ্রাব থেকে যারা সতর্কতা অবলম্বন করে না, পর নিন্দাকারী ইত্যাদির জন্য রয়েছে অন্য ধরনের আযাব। কোন কোন সময় মুত্তাকী মুসলমানের জন্যও কবরের সংকীর্ণতা ও কবরের ভীতি হয়ে থাকে যদিও এগুলো আযাব নয়। পবিত্র হাদীসে রয়েছে একদা হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম খচ্চরের উপর আরোহণ করতঃ দু'টি কবরের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন খচ্চর লাফাতে শুরু করে। হুজুর ফরমালেন, এই দু'কবরবাসীর উপর আযাব হচ্ছে। খচ্চর ওই আযাব দেখে ভয় পেয়ে গেছে। তাদের মধ্যে একজন তো পরনিন্দা করত, অপরজন প্রশ্রাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতো না। অতঃপর খেজুরের একটি শাখাকে দু'টুকরো করে কবরের উপর গেড়ে দিলেন-যতক্ষণ এই

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

টুকরাদ্বয় সজীব থাকবে এর বরকতে আযাব হ্রাস পাবে। কারণ প্রত্যেক সজীব বস্তু তাসবীহ পাঠ করে এবং তাসবীহর বরকতে আযাব হ্রাস পায়। এইজন্য মাযারসমূহে কাঁচা ফুল ইত্যাদি দেয়া হয়। যেন তাসবীহ দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপকার হয় এবং সুগন্ধি দ্বারা মৃত ব্যক্তিও শান্তি পায় এবং যিয়ারতকারীরাও। এই কারণে মৃত ব্যক্তির দেহ, কাফন ইত্যাদিতে সুগন্ধ লাগানোর নির্দেশ রয়েছে। এমনকি গোসলের কাষ্ঠাসনেও আগরবাতি জ্বালানোর নির্দেশ রয়েছে। প্রতীয়মান হল-মৃত্যুর পর অনুভূতি বহাল থাকে এবং মৃত ব্যক্তি সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ অনভুব করতে পারে। এটা মনে করা ঠিক নয় যে, কেবল হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের হস্ত মোবারকের বরকতে আযাব হ্রাস পেয়েছিল নচেৎ হাদীসে সজীব থাকার শর্ত আরোপিত হতো না। এই কবরদ্বয় ছিল মুসলমানের নচেৎ আযাব হ্রাসের প্রশ্নই উঠে না। কাফিরের কবরের উপর যদি পূর্ণ কুরআনও পড়া হয় তার কোন উপকার হবে না। কবরের চাপ তো সৎকর্মপরায়ণদেরও হয়ে থাকে যে, কবর তাদেরকে আদর ও ভক্তিসহকারে চাপ দেয় কিন্তু এতে মৃত ব্যক্তি ভীত হয়ে যায়। যেমন শিশুকে মা কোলে নিয়ে চাপ দেয়, এতে অনেক সময় বাচ্চা ঘাবড়ে যায়। (কিন্তু কাফিরদের জন্য কবরের এই চাপও আযাব যেমন) বিড়াল তার বাচ্চাকেও মুখে চেপে ধরে এবং ইদুরকেও। হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রা.) যার মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল, তাঁর জন্যও কবরের চাপ হয়েছে। প্রতীয়মান হল-কবরের চাপ ও ভীতি কাফির, ফাসিক ও সৎকর্মপরায়ণদের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

দুই. আযাবে কবর প্রসঙ্গে যে কবর শব্দ রয়েছে এ দ্বারা মাটির গর্ত বুঝানো হয়নি বরং আলমে বরযখকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইহজীবন ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী অবস্থান, চাই মৃত ব্যক্তি কবরে সমাহিত হোক কিংবা জ্বলে যাক কিংবা বাঘ খেয়ে ফেলুক। কিন্তু তার শরীরের মূল অংশের সাথে রূহের সম্পর্ক স্থাপন করতঃ পশুর পেটে কিংবা মাঠে কিংবা শবাধারে মোট কথা, যেখানে হোক না কেন প্রশ্নোত্তর ও আযাব হবে। এটা কোন জটিল বিষয় নয়। মায়ের উদরে ফেরেশতা গিয়ে আল্লাহকে জিজ্ঞেস করতঃ তাকদীর লিখে আসে কিন্তু মা জানতে পারে না। আপনার পাশে কেউ শুয়ে আছে, সে স্বপ্নে শান্তি বা দুঃখ দেখছে কিন্তু আপনি জানেন না। অনুরূপভাবে পশু কিছুই জানতে পারে না অথচ তার পেটের মধ্যে সব কিছু হয়ে গেল। (আশিয়্যাতুল লুমআত ও হাশিয়ায়ে শরহে আকায়েদ)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

লতীফা: একদা সৈয়দ আহমদ খান আলীগড়ীর নিকট জনৈক ছাত্র গমন করে। সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কুকুর কেন সাথে রাখেন? আলীগড়ী উত্তর দিলেন, এতে ফেরেশতা আসে না। সুতরাং 'মালাকুল মাওত' আসবেন না এবং আমিও মৃত্যুবরণ করব না। সে বলল, যে ফেরেশতা কুকুরের প্রাণ কবজ করবে সে আপনার প্রাণও করবে। সৈয়দ আহমদ খান নির্বাক হয়ে যান। কুকুরের কারণে রহমতের ফেরেশতা আসে না কিন্তু আযাবের ফেরেশতা আসে।

তিন. হিসাবে কবর অর্থাৎ কবরের প্রশ্নোত্তরের ধরন হল এই যে, দাফনের পর মৃত ব্যক্তি মানুষের পদধ্বনি শুনতে পায়। এতে প্রতীয়মান হল–মৃত্যুর পর সমুদয় অনুভূতি উন্নতি লাভ করে। দেখুন, শত শত মন মাটিতে চাপা পড়া সত্ত্বেও মৃত ব্যক্তি পদধ্বনি শুনতে পায় এবং যিয়ারতকারীগণকেও চিনতে পেরে দোয়াপ্রার্থী হয়। সুতরাং যারা জীবদ্দশায় গোটা পৃথিবীর খবর রাখেন মৃত্যুর পর তাদের শক্তি কেমন হবে? অতঃপর দু'জন ফেরেশতা মুনকার ও নকীর অর্থ ভয়ঙ্কর ও অপরিচিত। যেমন কুরআন শরীফে রয়েছে– قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ (হযরত লূত বললেন, তোমরা তো অপরিচিত লোক) যাদের চেহারা হবে কালো, চক্ষু নীল; এসে তিনটি প্রশ্ন করবেন, তোমার প্রভু কে? তোমার ধর্ম কি? এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? যদি মো'মিন হয় এবং উত্তর ঠিকভাবে দিতে পারে তখন বলেন, আমরা তো জানতাম– তুমি এইরূপ বলবে। যদি কাফির কিংবা মুনাফিক হয় এবং জবাব দিতে না পারে তখনও এটাই বলে। এটা এমন কঠিন পরীক্ষা যার প্রশ্নাবলী পৃথিবীতেই সবাইকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। নচেৎ পরীক্ষক প্রশ্নপত্র গোপন রাখেন। আল্লাহ তায়া'লা উদ্ধার করুন।

চার. এ থেকে কতিপয় শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া গেল। প্রথমতঃ দ্বীনের প্রশ্নে রিসালতের প্রশ্নও চলে এসেছিল। কেননা, ধর্ম সংক্রান্ত সমদুয় বিষয়কে দ্বীন বলা হয়। কিন্তু তারপরও স্পষ্টভাবে এই প্রশ্ন করা হয়েছে, মোটামুটি প্রশ্নোত্তরকে যথেষ্ট ধরা হয়নি তার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য। তা ছাড়া শেষ প্রশ্ন যার উপর সাফল্য নির্ভর করে তা হল হুজুরের পরিচিতি। দ্বিতীয়তঃ যদিও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চোখে দেখেনি কিন্তু ঈমানী সম্পর্কের কারণে চিনতে পারবে। যেমন কোনদিন দেখা হয়নি এমন কোন আত্মীয়ের সাথে নতুন কোন স্থানে দেখা হলে তার প্রতি রক্তের সম্পর্কের কারণে অন্তরের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। অথবা যেমন ভিন্ দেশে ছেলে রোগাক্রান্ত হলে স্বদেশে মায়ের অস্থিরতা বেড়ে যায়। অনুরূপভাবে ঈমানী সম্পর্কের কারণে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের প্রতি মো'মিনের অন্তর টানবে। তৃতীয়তঃ হুজুর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের হাযির ও নাযির হওয়ার মাসআলাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, هٰذا এর চাহিদা হল مشار اليه (যার প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে)'র উপস্থিতি। সম্মুখে উপস্থিত ও নিকটে উপস্থিতকে বলা হয় هٰذا (এই লোকটা)। অনুপস্থিতকে নয়। আর একই সময়ে হাজারো স্থানে মানুষ দাফন হচ্ছে এবং সবাইকে এই প্রশ্ন করা হচ্ছে। প্রতীয়মান হল–হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম সর্বত্র বিরাজমান। যেমন সূর্য যে, দিনের বেলায় প্রত্যেক স্থান থেকে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে। তবে চোখে পর্দা রয়েছে, সেদিন ওই পর্দা তুলে দেয়া হবে এবং বলা হবে, দেখ, ইনি কে? নচেৎ তিনি অনুপস্থিত কোথায়? তিনি তো প্রাণের চেয়েও নিকটতম। এটাকে শির্ক মনে করা অপরাধ। কেননা, সর্বত্র অবস্থান করা থেকে আল্লাহ পবিত্র। তাঁর না স্থান আছে না কাল। সর্বত্র তো মোস্তফা আলাইহিস্ সালামই হতে পারেন।

وہ ہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے
وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں

অর্থাৎ তিনি লা মকানের অধিবাসী হয়েছেন, আরশের চূড়ায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি নবী যার এই হল স্থান আর আল্লাহ তো স্থান হতে পবিত্র।

هٰذَا الرَّجُلُ দ্বারা রওযায়ে আনওয়ার কিংবা ছবি মোবারক কিংবা ধ্যানগত উপস্থিতি ব্যাখ্যা করা যাহির বিরুদ্ধ। হাদীসকে অকারণে যাহির থেকে ফিরানো যায় না। তা ছাড়া যদি ছবি কিংবা রওযা মোবারকের প্রতি ইঙ্গিত হয় তা হলে ওই ছবি বা রওযাও তো সর্বত্র হাযির হবে। ছবিকে হাযির স্বীকার করা আর ছবিওয়ালাকে স্বীকার না করা বড়ই অজ্ঞতা। চতুর্থতঃ ফেরেশতাদ্বয় বলেন, আমরা জানতাম যে, তুমি এই উত্তর দিবে। এ থেকে প্রতীয়মান হল–এই প্রশ্নোত্তর খোদায়ে কুদ্দূসের জানার জন্য নয়, তিনি তো মহাজ্ঞানী ও সবিশেষ অবহিত এবং ফেরেশতাদের জানার জন্যও নয়, তাদেরও পূর্ব থেকে জানা রয়েছে। বরং মৃত ব্যক্তির নিজের মুখবন্ধের জন্য; যেন সে জানতে পারে এই আযাব আমার ব্যর্থতার কারণে হচ্ছে। প্রত্যেক পরীক্ষা পরীক্ষকের জানার জন্য হয় না। কোন কোন সময় স্বয়ং উত্তরদাতাকে জানানো কিংবা উপস্থিত লোকদের নিকট উত্তরদাতার অবস্থা প্রকাশ করার জন্যও হয়ে থাকে। প্রত্যেক প্রশ্ন প্রশ্নকারীর জ্ঞানহীনতার দলীল নয়। আল্লাহ তায়া'লাও পরিভ্রমণকারী ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোথায় ছিলে? হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে জিজ্ঞেস করেছেন وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَا مُوْسٰى (হে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মূসা! আপনার ডান হাতে ওটা কি?) আল্লাহর কি জানা ছিল না যে, মূসা আলাইহিস্ সালামের হাতে লাঠি আছে? পঞ্চমতঃ সৌভাগ্য ও হতভাগ্য, জীবনের শুভ পরিসমাপ্তি (حسن خاتمة) ও মন্দ পরিসমাপ্তি (سوء خاتمة) উলূমে খাম্সা (পাঁচ প্রকার অদৃশ্য জ্ঞান)'র অন্তর্ভুক্ত; যার জ্ঞান রয়েছে মুনকার ও নকীরের নিকট। তা ছাড়া তাকদীর লিখক যিনি মায়ের জরায়ুতে এসে বাচ্চার উপর যা ঘটবে তা লিখে যান। এ সমুদয় বিষয়ের জ্ঞান তার রয়েছে, অতীতদেরও, বর্তমানদেরও। তা ছাড়া যখন কোন নারী তার মুসলমান স্বামীর সাথে ঝগড়া করে তখন জান্নাত থেকে হূর চিৎকার দিয়ে উঠে যে, এতো তোমার নিকট (কিছুদিনের) মেহমান। শীঘ্রই আমাদের কাছে চলে আসবে। তাকে দুঃখ দিওনা। যা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে–হূরেরও জানা রয়েছে যে, তার খাতিমা বিল খাইর হবে। তা ছাড়া ঘরের ঝগড়া জান্নাত থেকে হূর দেখতে পায়। যদি এগুলোর জ্ঞান হুজূরেরও থাকে তাতে অসুবিধা কি? হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)কে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তোমার মাতা অন্তঃসত্ত্বা, একটি মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। আমার উত্তরাধিকারের বন্টনে তাকেও অন্তর্ভুক্ত করবে (দেখুন মুয়াত্তা ইমাম মালেক) যদি নক্ষত্ররাজির জ্ঞান এই হয় তাহলে সূর্যের জ্ঞান কত হবে? ষষ্ঠতঃ এতে প্রতীয়মান হল–কবরে আযান দেয়া ভাল। আযানের মাধ্যমে অশান্ত মনে শান্তি আসে। এতে শয়তান পলায়ন করে, ভয়-ভীতি দূরীভূত হয় এবং মৃত ব্যক্তির তালকীন (প্রশ্নোত্তর বাতলে দেয়া)ও হয় যার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তার। কেননা তখন নির্জন কবরে ভয়-ভীতিও থাকে এবং শয়তানের উপস্থিতিও, প্রশ্নাবলীর কঠিনতা, অন্তরের অস্থিরতা মৃত ব্যক্তির একাকীত্ব ইত্যাদি হাজারো বিপদ রয়েছে। আযানের ফলে শয়তান পলায়ন করে, মনে সান্ত্বনা আসে এবং প্রশ্নাবলীর উত্তর স্মরণ হয়। কেননা আযানের শব্দাবলীতে তালকীন রয়েছে–প্রতিপালক আল্লাহ, ধর্ম সেটাই যার মধ্যে নামায ফরয, নবী আমার মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। মৃতব্যক্তিদের সব ধরনের সাহায্য কর। কাল তোমাকেও এই অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। অনুরূপভাবে কাফনী লিখাও উত্তম। এই মাসআলা দু'টি শামী প্রথম খণ্ড কিতাবুদ্ দাফনে দেখুন। এতে এই সন্দেহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, মৃত ব্যক্তির পীত ও রক্তের সাথে মিশলে এর বেআদবী হবে। কেননা আমরা যমযম পান করি অথচ পান করার পর প্রশ্রাব হয়ে যায়। হযরত আমীর মুআবিয়া (রা.) হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের কর্তিত নখ ও চুল মোবারক তার কাফনে রাখার জন্য অসিয়ত করেছেন। হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম তাঁর ছাহেবযাদী যয়নব

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(রা.)'র কাফনে তাঁর লুঙ্গি শরীফ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং গোসলদাতাদেরকে ফরমায়েছেন اشعرنها অর্থাৎ এটাকে শরীরের সাথে যুক্ত করে রাখো। যা থেকে প্রতীয়মান হল–কবরে বুযর্গানে দ্বীনের তাবররুকও বরকতের জন্য রাখা বৈধ। জানি না মৃত ব্যক্তি ফুলবে বা ফাটবে কিনা। কাল্পনিক বেআদবীর বাহানায় নিশ্চিত উপকারকে কেন ত্যাগ করা হবে? এই বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। স্মর্তব্য যে, কবরে আযান, কাফনী লিখা, কবরে কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি মুসলমান মুর্দার জন্য উপকারী, কাফিরের জন্য নয়। এটা মনে করাও ভুল যে, আযান কেবল নামাযের জন্যই হয়। অনেক স্থানে নামায হয় কিন্তু আযান হয়না। যেমন ঈদের নামায, ইস্তিস্কার নামায, জানাযা ও কুসূফের নামায। অনেক স্থানে আযান হয় নামায হয়না। যেমন নবজাতকের কানে আযান, প্লেগ ও আগুন লাগলে আযান, জিনের প্রভাবযুক্ত ব্যক্তির কানে আযান দেয়া হয় কিন্তু নামায হয়না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যিক্‌র-ই মোস্তফার উচ্চতার বর্ণনা

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

আমি আপনার জন্য আপনার আলোচনাকে সুমচ্চ করেছি। (সূরা ইনশিরাহ, আয়াত-৪)

সাধারণতঃ গোটা কুরআন না'তে মোস্তফা (নবীর প্রশংসা)। তাওহীদ সেটাই গ্রহণযোগ্য যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দেন। এইজন্য বলা হয়েছে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (বলুন, আল্লাহ এক)। মুতাশাবিহাত (যে সমস্ত আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট নয়)কে হাবীব ও মাহবূবের মধ্যকার রহস্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, অন্য কেউ যেন তা বুঝার চেষ্টা না করে। তা ছাড়া মাহবূবের কমনীয় ভঙ্গিসমূহই শরীয়তের বিধান। এইজন্য কুরআনে আমলসমূহের বিধান তো রয়েছে কিন্তু বিস্তারিত বিবরণ নেই। অর্থাৎ তোমরা সেইরূপই কর যা মাহবূব করেন, নাজাত পেয়ে যাবে। নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত যে কোনরূপে করলে তাকে ইবাদত বলা হবে না। কারণ তাতে মাহবূবের সাদৃশ্য পূরণ হয়নি। কাহিনী ও উপমাও মোস্তফা আলাইহিস্ সালামের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্যই। অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণ বা উম্মতগণের অবস্থা দেখ এবং মাহবূব ও তাঁর উম্মতের অবস্থা দেখ, আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখতে পাবে। কেননা এরা উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন। মোটকথা, আকায়েদ, উপমা, কাহিনী, আহকাম সবটাতে রয়েছে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের না'ত। কিন্তু এই আয়াতে করীমায় সুস্পষ্টভাবে না'তে মোস্তফা ও শানে মোস্তফার উচ্চতা বর্ণিত হয়েছে। এখানে কতিপয় বিষয় প্রণিধানযোগ্য। রফআতকে নিজের দিকে কেন সম্বন্ধ করলেন? لک কেন বললেন, শুধু رَفَعْنَا ذِكْرَكَ কেন বলেননি? তাঁর 'যিকর' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? রফআতে রয়েছে অনেক ব্যাপকতা। বড় বড় ব্যক্তিবর্গের আলোচনা তো এখানে পৃথিবীতে হয়ে থাকে কিন্তু এই উচ্চতাসম্পন্ন মাহবূবের নাম পৃথিবীতেও রয়েছে, আরশের উপরেও, বেহেশতেও এবং আল্লাহ তায়া'লার নিকটও।

فرش والے تری شوکت کا علو کیا جانیں
خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পৃথিবীবাসী আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তির উচ্চতা কি বুঝবে, আপনার রাজকীয় ঝাণ্ডা উড়ছে আরশের উপর।

হাত, পা অপেক্ষা কাজ বেশী করে চোখ, চোখ অপেক্ষা কাজ বেশী করে কান যে, সামনে, পিছনে চতুর্দিক থেকে শুনে এবং কান অপেক্ষা কাজ বেশী করে কল্পনা বিশেষতঃ কবি-সাহিত্যিকের কল্পনা। তারা পৃথিবী ও আসমানকে একাকার করে দেয়। কিন্তু যেখানে কবি-সাহিত্যিকের কল্পনাও থেমে যায় ওখান থেকে শুরু হয় নবী মোস্তফা আলাইহিস্ সালামের প্রশংসা। এর উচ্চতা পর্যন্ত কল্পনাও পৌঁছতে পারে না। যেখানে কবি-সাহিত্যিকের কল্পনা কাজ করে না ওখান থেকে আরম্ভ হয় হুজুরের উচ্চতা। হযরত হাস্‌সান (রা.) বলেন:

مَا اِنْ مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِیْ لٰکِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِیْ بِمُحَمَّدٍ

আমি আমার কথা দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করছি না বরং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আমার কথাকে প্রশংসিত করছি।

তা ছাড়া যেখানে আল্লাহর নাম রয়েছে সেখানে নবী মোস্তফার নামও রয়েছে, যেমন কলেমা, নামায, আযান, খোৎবা ইত্যাদি। যারা তাঁর খেয়ালে নামায নষ্ট বলে, তারা নিজেরাই নষ্ট। কেননা নামাযের মধ্যে তাঁকে সালাম দেয়া ওয়াজিব, তাঁর খেয়াল কিভাবে নামায ভঙ্গের কারণ হতে পারে? তা ছাড়া কুরআন করীমে সমস্ত নবীগণকে নাম দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে আর এখানে প্রশংসনীয় গুণাবলী দ্বারা। বড় বড় খ্যাতিমানগণ মাটিতে দাফন হয়েছে তাদের নামও মুছে গেছে কিন্তু মুছে যায়নি একমাত্র যিক্‌র-ই মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعدا تیرے
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا

মুছে গেছে, মুছে যাচ্ছে, মুছে যাবে আপনার শত্রুগণ, কিন্তু আপনার চর্চা মুছে যায়নি এবং কোন সময় মুছে যাবেও না।

দুই. রফআতকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন যেন প্রতীয়মান হয়-তিনি কারো মাধ্যমে উচ্চতা লাভ করেননি, আমিই দান করেছি। সবাই উচ্চতা লাভ করে তাঁর বদৌলতে। এইজন্য তাঁর জন্ম সপ্তাহের মধ্যে জুমাবারেও হয়নি, শনিবার বা রবিবারেও হয়নি। কেননা জুমাবার ইসলামের বড়দিন, শনিবার য়াহুদীদের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এবং রবিবার খ্রিষ্টানদের বড়দিন। কেউ যেন বলতে না পারে যে, দিন থেকে তিনি মাহাত্ম্য লাভ করেছেন বরং দিন মর্যাদা পেয়েছে তাঁর দ্বারা। তা ছাড়া তাঁর শুভ জন্ম বায়তুল মুকাদ্দাসে হয়নি কেননা তা পূর্ববর্তী উম্মতদের কিবলা। কোন সুজলা সুফলা বিনোদনযোগ্য স্থানেও হয়নি যে, কেউ বিনোদনের জন্য এসে যিয়ারত ও হজ্বও করবে। শুষ্কস্থানে তাঁর শুভাগমন হয়েছে, অতঃপর যখন ওখানে প্রবেশ করবে তখন পোশাকও খুলে ইহরাম বেঁধে নাও। বিনোদন করতে হলে প্যারিস ও লণ্ডনে যাও। মক্কা মুকাররমায় তাঁকে রাখেননি যেন কেউ রওযা শরীফের যিয়ারত কা'বা শরীফের কারণে না করে। বরং হজ্ব কর এক স্থানে এবং যিয়ারতে মোস্তফার জন্য পৃথক সফর কর। যেন ورفعنا প্রমাণিত হয়। কা'বার দিকেও এইজন্য নামায আদায় করা হয় যে, তিনি ওই কা'বাকে কিবলারূপে গ্রহণ করেছেন قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا (আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করি। সুতরাং আপনাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা আপনি পছন্দ করেন)। ترضها বিশেষণ থেকে প্রতীয়মান হল–মাহবূবের সন্তুষ্টির জন্য কা'বা কিবলা হয়েছে। এ ছিল কিবলা পরিবর্তনের রহস্য। প্রথম থেকেই কা'বা কিবলা হলে এই বিষয়টা পাওয়া যেতো না যা এখন জানা গেছে।

کعبہ بھی ہے ان ہی کی تجلی کا ایک ظل
روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے

কা'বাও তাঁর তাজাল্লীর একটি প্রতিবিম্ব, তাঁরই নূরে কা'বায় স্থাপিত হাজরে আসওয়াদের পুতলি দীপ্যমান।

এইজন্য কতেক আলেমদের মতে যদি কেউ নামাযের অবস্থায় হুজুরের ডাকে তাঁর খেদমতে চলে যায় তা হলে নামায ভঙ্গ হবে না। দেখুন মিরকাত বাবু ফযায়িলিল কুরআন এবং اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ এর তাফসীর। তার সুন্দর বিশ্লেষণ আমাদের কিতাব শানে হাবীবুর রহমানে দেখুন।

কেননা, যদি নামাযী কথা বলে থাকে তা হলে তাঁর সাথে বলেছে যাকে সালাম করা নামাযের মধ্যে ওয়াজিব। যদি দেহের কিবলা থেকে ফিরে যায় তা হলে কোন দিকে ফিরেছে? আত্মার কিবলার দিকেই তো ফিরেছে। তাঁরই নির্দেশে এদিকে মুখ করেছিল, এখন তাঁরই নির্দেশে ওদিকে। যদি হেঁটে যায় তা হলে তাঁরই দিকে গেছে? যাঁর নির্দেশে দাঁড়িয়ে রয়েছিল।

সূক্ষ্মবিষয়ঃ হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম আরজ করেছিলেন, رَبِّ اَرِنِيْٓ (হে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও) উত্তরে ফরমালেন, لَنْ تَرَانِيْ আপনি আমাকে দেখতে পাবেন না। এটা বলেননি যে, আপনাকে দর্শন দেব না। এখানে দর্শনের অস্বীকৃতি জানিয়েছেন অথচ জান্নাতবাসীদের জন্য দর্শন ব্যাপক হবে। কারণ এখনও পর্যন্ত নবী মোস্তফা আলাইহিস্ সালামের পবিত্র হস্তে এই দর্শনের শুভ উদ্বোধন হয়নি। মি'রাজে তিনি দর্শন করলে তারপর অন্যান্যরা করতে পারবে।

তিন. لَكَ এইজন্য বলেছেন যে, لام মালিকানা (ملكيت) বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন اَلْمَالُ لِزَيْدٍ (যায়েদের মাল) অর্থাৎ আপনাকে রফআতের মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছে। যে কেউ উচ্চমর্যাদা লাভ করবে তাঁর সাথে সম্বন্ধের ফলেই করবে। আউলিয়া, মাশায়েখ ও আলেমগণের যে সম্মান হয়ে থাকে তাঁর প্রশংসাকারী ও খাদেম হওয়ার ফলেই হয়ে থাকে। হুজুরের মহানুভব মাতা-পিতা আত্মীয়-স্বজন, দেশবাসী ও হিজাযের পবিত্র ভূখণ্ড তাঁর মাধ্যমেই মর্যাদা লাভ করেছে। এখনও যে জাহাজ হাজীদেরকে নিয়ে জিদ্দা যাত্রা করে তার উচ্চশান দেখতে হলে বোম্বাই ও করাচীতে তার দৃশ্য দেখুন যে, লণ্ডন ও প্যারিস যাত্রাকারী জাহাজের কোন কদর নেই কিন্তু হাবীবের দেশের জাহাজ কতইনা প্রিয়, ওখানে আশেকদের ভীড়, নে'মতের গুঞ্জন সবকিছুই হয়ে থাকে।

জনৈক ভিক্ষুক খাজা আজমীরী (রহ.)'র দরবারে পাঁচটি টাকা ভিক্ষা চাচ্ছিল। তখন কোন বেদ্বীন ওহাবী বলল, খাজা কি দিবে? নে, আমি তোমাকে দিচ্ছি। ভিক্ষুক টাকা হাতে নিয়ে বলল, খাজা! তোমার প্রতি উৎসর্গ, তুমি দিয়েছো তে দিয়েছো, দুষ্ট ওহাবীর হাতে দিয়েছো! মোটকথা, ওহাবী অনেক চেষ্টা করল আহলুল্লাহ (আল্লাহওয়ালা)'র উচ্চমর্যাদা কমাতে কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব তিনি তো রফআতের মালিকের সাথে সম্বন্ধ রাখেন!

عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے　　یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا

বিবেক থাকলে খোদার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো না, এরা কমাতে চায় অথচ আপনার শান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করাই তাঁর অভিপ্রায়।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকের দু'টি নাম। যেটা মাতা-পিতা রেখেছে সেটা অপ্রসিদ্ধ হয়ে যায় এবং যেটা সরকার দান করেছেন সেটা প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। আবু হোরাইরা সরকার প্রদত্ত নাম, সাধারণ মানুষ জানে না তাঁর জন্মগত নাম কি ছিল? তা ছাড়া কাফিরগণকে যে উপনামে সম্বোধন করেছেন সে নামেই তারা প্রসিদ্ধ হয়েছে, মূল নাম তলিয়ে গেছে। আবু জাহল, আবু লাহাব ইত্যাদি হুজুরের দেয়া নাম। সেই নবীদের নামই আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে বুলন্দ রয়েছে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যাদেরকে উজ্জ্বল করেছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এইজন্য হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম আনন্দিত হয়ে ফরমায়েছিলেন– আমার পর নবী মুআযযম তশরীফ আনবেন। কেননা, তাঁর জানা ছিল যে, তাঁর বরকতে আমার মহীয়সী আম্মার সতীত্বের খোৎবা কিয়ামত পর্যন্ত পাঠ করা হবে এবং সর্বত্র আমারও চর্চা হবে। নাম মোবারক হয়েছে মুহাম্মদ অর্থাৎ অতি প্রশংসিত। যাতে কাফির ও মুশরিকগণও মুহাম্মদই বলে এবং বাধ্য হয়ে তাঁর প্রশংসাই করতে হয়। কুরাইশের কাফিরগণ তাঁকে মুযাম্মম (ঘৃণ্য) নামে নামকরণ করতঃ তাঁর শানে বাজে কথা বলত। তিনি ফরমালেন, এরা তো মুযাম্মমকে মন্দ বলছে আমি তো মুহাম্মদ। তাঁর মহীয়সী আম্মার নাম হল–আমেনা অর্থাৎ পৃথিবীকে নিরাপত্তাদাতা অথবা আল্লাহর আমানতের আমানতদার। যে ঝিনুক মুক্তা ধারণ করে সেটা মূল্যবান হয়ে যায় তা হলে যে উদর ওই দুর্রে য়াতীম মাহবূবে খোদাকে আমানত রাখবে সেটা কিরূপ মর্যাদাসম্পন্ন হবে? মানুষের উদ্ভাবিত বিষয়াবলীর মোকাবিলা হতে পারে কিন্তু খোদায়ী কাজের মোকাবিলা হতে পারে না। বিদ্যুৎ ও গ্যাসচালিত যন্ত্রাদির মোকাবিলা সম্ভব কিন্তু কুদরতী উচ্চতাসম্পন্নের নাগাল পাওয়া অসম্ভব। এ থেকে প্রতীয়মান হল–যদি আমরা লাখো ইবাদত করি তাঁর একটি সাজদার সমান হবে না। কারণ আমাদের ইবাদতে ওই মাহবূবিয়ত কোত্থেকে আসবে?

رَفَعْنَا মাযী মুতলাক (অতীতকালের ক্রিয়া) থেকে প্রতীয়মান হল–এর পূর্বেই উচ্চতা দান করা হয়েছে যখন না স্থান ছিল, না কাল; না জগত ছিল, না জগদ্বাসী; না অতীত ছিল, না ভবিষ্যৎ। মোটকথা, আল্লাহ তায়া'লা হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে সবসময়, সর্বত্র, সবধরনের ও সর্বদিক থেকে রফআত ও উচ্চতা দান করেছেন। তাঁর গোলাম প্রথম স্তরের উন্নত এবং তাঁর দুশমন সর্ব নিম্নস্তরে পতিত।

ان کے در کا جو ہوا خلق خدا اس کی ہوئی
ان کے در سے جو پھرا اللہ اس سے پھر گیا

যে ব্যক্তি তাঁর গোলাম হয়েছে খোদার সৃষ্টি তার হয়েছে এবং যে ব্যক্তি তাঁর সত্তা থেকে বিমুখ হয়েছে আল্লাহও তার থেকে বিমুখ হয়ে গেছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইস্তিকামত (অবিচলতা)'র বর্ণনা

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ.

যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ', অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা এবং বলে, তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ শোন। (সূরা হা-মীম আস-সাজদা, আয়াত-৩০)

উৎসর্গ সেই অলৌকিক কুরআনের প্রতি যার এক একটা আয়াত মানুষের গোটা জীবনের সংবিধান। এই আয়াতে মো'মিন হওয়ার পদ্ধতি এবং মো'মিনের প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে কতিপয় বিষয় লক্ষণীয়। قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? اِسْتَقَامُوْا এর মর্মার্থ কি? নুযূলে মালায়িকা (ফেরেশতা অবতীর্ণ হওয়া) দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?

এক. قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ দ্বারা হয়তঃ মীসাক দিবসের উক্তিকে বুঝানো হয়েছে যখন اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?) এর উত্তরে সবাই بَلٰى (হ্যাঁ) বলেছে। তা হলে 'ইস্তিকামত' দ্বারা বুঝানো হয়েছে পৃথিবীতেও মো'মিন থাকা। কেননা, রেওয়ায়ত থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে–এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন ذٰلِكَ اُمَّتِىْ অর্থাৎ এটা আমার উম্মতের বৈশিষ্ট্য। (রূহুল বয়ান) অর্থাৎ কাফির, মুনাফিক, য়াহুদী ও খ্রিষ্টান ওই মীসাক দিবসের অঙ্গীকারে অবিচল থাকতে পারেনি। মানুষ ও পাথরকে খোদা স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু মুসলমান অবিচল রয়েছে। অথবা 'ইস্তিকামত' দ্বারা পৃথিবীর উক্তি ও স্বীকারোক্তি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে মো'মিন হয়ে ঈমানের উপর অটল থাকা।

দুই. ইস্তিকামত প্রসঙ্গে কতিপয় অভিমত রয়েছে। হযরত ওমর (রা.) বলেনঃ ঈমানের উপর অবিচল থাকা। হযরত উসমান (রা.) বলেনঃ লৌকিকতা (রিয়া) থেকে আমল পবিত্র হওয়া। কারণ এটা শিরকে খফী (প্রচ্ছন্ন শিরক) এইজন্য কিয়ামতের দিন রিয়াকার (কপট) শহীদ, আলেম ও দানশীল মোটকথা, সমস্ত রিয়াকারকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাদেরকে বলা হবে–তোমাদের এই

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কাজ লোক দেখানোর জন্যই ছিল, আমার উদ্দেশ্যে নয়। (দেখুন মিশকাত) হযরত আলী (রা.) বলেনঃ ফরযসমূহ আদায় করা। (রূহুল বয়ান) অর্থাৎ আল্লাহর ফরযসমূহ আদায় করাই ইস্তিকামত। এ হল খণ্ড খণ্ড (جزئی) ইস্তিকামতের বর্ণনা এবং পূর্ণাঙ্গ (کلی) ইস্তিকামত হল এই যে, দেহ ও মন সর্বাবস্থায় হকের উপর থাকা। মো'মিনের জন্য দু'টি বিষয়ের প্রয়োজন, ইজাবত ও ইস্তিকামত।

ইজাবত হল অঙ্গীকার করা এবং ইস্তিকামত হল তা পূরণ করা। সমস্ত কাজ সহজ কিন্তু ইস্তিকামত কঠিন বিষয়। اَلْاِسْتِقَامَةُ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ كَرَامَةٍ (ইস্তিকামত এক হাজার কারামত অপেক্ষা উত্তম) জনৈক বুযুর্গকে কেউ বলল, আমি আপনার কোন কারামত দেখিনি। তিনি বললেন, আমার কোন কাজ তুমি সুন্নাতের পরিপন্থি দেখতে পেয়েছো? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, এই ইস্তিকামতই আমার কারামত, আর কি চাও। বাতাসে উড়ে যাওয়া, পানির উপর হেঁটে যাওয়া বেলায়ত নয়। এইকাজ তো মশা-মাছিও ভালভাবে করতে পারে দাজ্জাল অনেক অদ্ভুত কাজ দেখাবে। (তা বেলায়ত নয়) দ্বীনের উপর অবিচলতাই বেলায়ত।

কতিপয় স্থানে ইস্তিকামতের পরীক্ষা হয়। আনন্দে, দুঃখে ও রাগে। বড় বড় পরহেযগার লোক বিবাহ-শাদীর সময় নাচ-গান ও অন্যান্য হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যায় এবং দুঃখের সময় কুফরী শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করে ফেলে।

রাগের সময় জুলুম ও সীমালঙ্ঘন করে বসে। যা থেকে বুঝা যাচ্ছে- সে এখনো কাঁচা রয়েছে।

ظفر آدمی اس کو نہ جانئے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا
جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا

যতই বুদ্ধিমান ও মেধাবী হোক না কেন সেই লোককে সফলকাম মনে কর না যার আনন্দে খোদার কথা স্মরণ থাকে না এবং ক্ষোভে খোদার ভয় থাকে না।

এক সাহাবী রাগে তার গোলামকে মারছিলেন এমতাবস্থায় একটি আওয়াজ কানে এল-তুমিও তো কারো অপরাধী গোলাম এবং তোমারও একজন মনিব রয়েছে। চোখ তুলে দেখতে পান-স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন। যখন কারো প্রতি রাগ আসে তখন মনে করবে-আমিও তো কারো অপরাধী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

نہ تھی اپنے جو عیبوں کی ہم کو خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر
پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا

আমাদের নিজেদের দোষ-ত্রুটির কোন খবর নেই আর আমরা অন্যান্যদের দোষগুণ দেখতে আছি। নিজের দোষ-ত্রুটির উপর দৃষ্টি পড়লে জগতের মধ্যে কাউকে মন্দ মনে হবে না।

বাদশাহ শাহজাহান নয় কোটি টাকা ব্যয় করে তৈরী করেছিলেন ময়ূর সিংহাসন। তৈরী হওয়ার পর সিংহাসন উদ্বোধনের জন্য আয়োজন করলেন বিরাট রাজকীয় অনুষ্ঠান। যখন সিংহাসনে বসলেন, বসা মাত্রই দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নফল আদায় করলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, এখন তো নফল আদায় করার সময় নয়? তিনি উত্তর দিলেন, ফিরআউন শুধু মিশরের রাজত্ব পেয়েছিল যা ভারত অপেক্ষা ছোট এবং হস্তীদাঁতের সিংহাসন তৈরী করেছিল যার মূল্য আমার সিংহাসন অপেক্ষা অনেক কম ছিল। কিন্তু যখন সে সিংহাসনে বসল তখন বলল, اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক। আজ আমি সারা ভারতবর্ষের একক অধিপতি এবং তার তুলনায় অনেক মূল্যবান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। নফ্স যেন অহঙ্কার করতে না পারে আমি মাটিতে মাথা রেখে বললাম, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى (পবিত্র আমার সুমহান প্রতিপালক) আমার হীনতা ও প্রভুর মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে নিলাম। এটাই ইস্তিকামত-আল্লাহ তায়া'লাকে সিংহাসনেও স্মরণ রেখেছে কাষ্ঠাসনেও।

বাদশাহ শাহ্জাহান দিল্লীর জামে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন, শাহ্জাহান স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। নির্দেশ দিলেন- ভিত্তিপ্রস্তার সেই স্থাপন করবে যার তাহাজ্জুদ নামায কখনো ক্বাযা হয়নি। এটা শুনে কেউ সাহস করেনি। তখন শাহ্জাহান নিজেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আবদুল্লাহ নামের একজন গোলাম ছিল। একবার বাদশাহ বললেন, আবদল এখানে এসো। সে বলল, গোলামের কি অপরাধ হয়েছে যে, অর্ধেক নাম নিয়েছেন? তিনি বললেন, এখন আমার অযু নেই, তাই আল্লাহর নাম অযু ছাড়া নেইনি।

জাহাঙ্গীর তার সহধর্মিনী নূরজাহানের এমন প্রেমিক ছিল যে, তার দফতরে যতক্ষণ নূরজাহান ভিতর থেকে জানালা দিয়ে তার হাত বাদশাহর পৃষ্ঠে না রাখতো বাদশাহর মস্তিষ্ক ঠিক থাকতো না এবং অফিস করতে পারতেন না। কিন্তু নূরজাহান ছিল রাফেযী। সে ইরান থেকে আবদুল্লাহ সূসতরীকে এনে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আগ্রার বিচারক নিযুক্ত করল। সে তার আসল পরিচয় গোপন রেখে নিজকে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী বলে পরিচয় দিতো এবং প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিল। সে একটি কিতাব লিখেছিল 'আল মাসায়িব ওয়ান নাওয়ায়িব'। তে লিখেছে–

زعمر خویش بیزارم کہ اونام عمر دارم

অর্থাৎ আমি আমার ওমর (জীবন)'র প্রতি অসন্তুষ্ট কারণ তার নাম ওমর।

এতে গোটা শহর উত্তেজিত হয়ে যায়। জাহাঙ্গীর যখন জানতে পারলেন তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এটা কি করেছো? আবদুল্লাহ জানতো–জাহাঙ্গীর নূরজাহানের নিয়ন্ত্রণে, তাই সে পরিষ্কার বলে দিল, আমি রাফেযী, এত দিন আমার আসল পরিচয় গোপন করেছিলাম। জাহাঙ্গীর বললেন, তুমি যদি তোমার অপবিত্র ওমরের (জীবন) প্রতি অসন্তুষ্ট হও তা হলে আমি চাই না যে, তোমার ওমর নিয়ে তুমি পৃথিবীতে থাকো। এই বলে তরবারি তুললেন এবং হত্যা করার জন্য নিজেই অগ্রসর হলেন। নূরজাহান পিছন থেকে জামা ধরে ফেলল। তিনি টান দিয়ে জামা মুক্ত করেনিলেন এবং তাকে হত্যাকরতঃ নূরজাহানকে বললেন:

جان من جان دادہ ام ایمان ندادہ ام

হে আমার প্রাণ! আমি তোমাকে প্রাণ দিয়েছি ঈমান দিইনি। ইস্তিকামতের মধ্যে এও রয়েছে যে, মানুষ সর্বাবস্থায় নিজের মূলকে স্মরণ রাখবে। হযরত আয়ায (রহ.) প্রতিদিন একটি নির্জন কক্ষে কিছুক্ষণ একাকী বসতেন। লোকেরা অভিযোগ করল, সোলতান মাহমূদ! হয়তঃ আয়ায চুরি করেছে যাকে প্রতিদিন গিয়ে গণনা করে। সোলতান নির্ধারিত সময়ে ওই নির্জন কক্ষে গিয়ে পৌছলেন এবং দরজা খুলতে বললেন। দেখতে পান–আয়ায একাকী বসে আছেন এবং পার্শ্বে রয়েছে তালাবন্ধ একখানা লোহার বাক্স। জিজ্ঞেস করলেন, এতে কি? তিনি বললেন, আমার দোষ গোপন করুন! বাদশাহ বললেন, এক্ষুণি খোল! তিনি খুললেন, তখন ওতে ছিল ফাটা টুপি, ফাটা জামা ও পুরাতন পায়জামা। বাদশাহ বললেন, এ কি? আরজ করলেন, মহারাজের এখানে এগুলো পরে এসেছিলাম। এখন নফসকে বলছি–বাদশাহর মেহেরবানী পেয়ে তোমার মূল ভুলে যেয়ো না। এইজন্য প্রতিদিন এগুলো একবার পরিধান করি। বাদশাহ কাঁদতে শুরু করেন এবং বললেন, তোমার মূল তুমি ভুলনি। কিন্তু আমি ভুলে গেলাম–মায়ের উদর থেকে উলঙ্গ এসেছিলাম কিন্তু আল্লাহর নে'মত পেয়ে তা ভুলে গেলাম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ এর কতিপয় বিশ্লেষণ রয়েছে। হয়তঃ পার্থিব বিপদাপদের সময় ফেরেশতাগণ তাদের অন্তরে সাহস ও সান্ত্বনা দেন। অতএব তারা বিপদ দেখে শঙ্কিত হয় না। এটাও ইস্তিকামতের একটা ফল। অথবা অন্তিম মুহূর্তে ফেরেশতাগণ সুন্দর আকৃতিতে এসে বলেন, يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো, তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এতে মৃত্যুর যাতনা কম অনুভূত হয় এবং আনন্দ পাওয়া যায়। মৃত্যুর সময় প্রীতিভাজনদের উপস্থিতি যন্ত্রণা লাঘবের কারণ হয়ে থাকে। এইজন্য মানুষের অন্তিম মুহূর্তে তার প্রীতিভাজন ও আত্মীয় স্বজনকে একত্রিত করা হয়।

شدت جانکنی ہو جب نزع کی جب ہو کشمکش
ورد زباں ہو یا خدا صل علی محمد
دم نزع سالک بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما
کہ قدم پہ آپ کے نکلے دم بس اسی پہ دار و مدار ہے

অন্তিম মুহূর্তের কঠিন সময়ে যখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে তখন যেন মুখে চালু থাকে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! মৃত্যু যাতনার ক্ষণে অসহায় সালিককে আপনার নূরানী চেহারা দেখাবেন যাতে আপনার চরণে আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হয়, ওতেই নির্ভর করে আমার সাফল্য।

অথবা কবরে যখন মুনকার ও নকীর মৃতব্যক্তিকে পরীক্ষায় সফলকাম পান তখন বলেন, نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ নববধূর ন্যায় শুয়ে পড়। অথবা হাশরের দিন ফেরেশতাগণ আমলনামা ডান হাতে দিয়ে বলবেন, তোমায় মোবারক হোক। প্রতীয়মান হল–ইস্তিকামত বেশ কঠিন কিন্তু খুব ভালফলদায়ক।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا ارْزُقْنَا الْاِسْتِقَامَةَ عَلٰى دِيْنِكَ بِجَاهِ حَبِيْبِكَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

(হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসীলায় আমাদেরকে তোমার দ্বীনের উপর অবিচলতা দান করুন!) বৃত্ত অঙ্কনের সেই যন্ত্রই সঠিক বৃত্ত অঙ্কন করতে পারে যার একটি পা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কেন্দ্রে দণ্ডায়মান থাকে আরেকটি নড়াচড়া করে। তোমরাও একটি পা শরীয়তের উপর কায়েম রাখো অপরটা পার্থিব বিষয়ে সচল রাখো, সমস্ত কাজ হয়ে যাবে। যদি শরীয়ত থেকে সরে যাও তা হলে কাজ এলোমেলো হয়ে যাবে। পাঁচতলায়ও মুসলমান থাকো গাছতলায়ও। সুখের দিনেও ঈমানের উপর অবিচল থাকো, দুঃখের সময়েও। যে সূচের সুতা থাকে তা কখনো হারিয়ে যায় না। তোমরাও শরীয়তের সুতায় যুক্ত থাকো কখনো নষ্ট ও ধ্বংস হবে না। অনুরূপভাবে যখন তাগা মোমের সাথে যুক্ত থাকে তখনই সেটা মোমবাতি হয়ে আলো প্রদান করে। তোমরাও নিজেদেরকে সৎকর্মপরায়ণ লোকদের সাথে যুক্ত রাখো, নিজেরাও আলোকিত হবে এবং সবাইকে আলোকিত করবে। যদি পৃথক হও তা হলে অন্ধকার হয়ে যাবে। সৎলোকদের সাহচর্য সৎলোকে পরিণত করে।

সূক্ষ্ম বিষয়: قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ এর মধ্যে অনেক ব্যাপকতা রয়েছে। মুখে উক্তি থাকতে হবে অন্তরে ভক্তি হতে হবে। অতঃপর যখন আল্লাহকে 'রব' বলে দিয়েছো তখন তাঁর পয়গাম্বরগণ ও কিতাবসমূহকে মেনে নেয়া আবশ্যক। যখন পয়গাম্বর আলাইহিস্ সালামকে মেনে নিয়েছো তখন তাঁর সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বায়তে ইজাম ও খাদেমগণকে মেনে নেয়া আবশ্যক। যাকে নিজের মালিক বলে দিয়েছো তার সমস্ত নির্দেশাবলী নিজের উপর অপরিহার্য করে নিয়েছো। অনুরূপভাবে যখন আল্লাহ তায়া'লাকে নিজের প্রতিপালক বলে দিয়েছো তখন তাঁর প্রীতিভাজনদের আনুগত্য এবং তাঁর বিধানাবলী মেনে চলা নিজের উপর অপরিহার্য করে নিয়েছো। কাফিরগণ আল্লাহ তায়া'লাকে লাখো বার তাদের প্রতিপালক বললে তার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। মুসলমান তাঁকে প্রতিপালক বললে তা গ্রহণযোগ্য। কেননা কাফিরগণ পয়গাম্বরগণকে অস্বীকার করতঃ ব্যবহারিকভাবে তাদের উক্তির খণ্ডন করছে। একই বাতাস সর্পের মুখে গিয়ে এক রকমের ক্রিয়া করে এবং বুলবুল বা মৌমাছির মুখে গিয়ে অন্য রকম ক্রিয়া করে। অনুরূপভাবে এক رَبُّنَا اللّٰهُ উক্তি মো'মিনের মুখ থেকে নির্গত হলে তার এই প্রভাব تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ পক্ষান্তরে কাফির ও মুনাফিকের মুখ থেকে নির্গত হলে তাতে কোন প্রভাব নেই। দোয়াসমূহেরও একই অবস্থা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পয়গাম্বরের আনুগত্য

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ.

হে মো'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহবান করে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রাসূলের সাড়া দিবে এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তরালে থাকেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে। (সূরা আনফাল, আয়াত-২৪)

এই আয়াতে করীমায় তিনটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। ইয়া (يا) দ্বারা সম্বোধন, ইস্তিজাবত (সাড়াদান)'র বিধান এবং يُحْيِيْكُمْ (তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে) এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা।

এক. সমস্ত উম্মতগণকে তাদের নাম নিয়ে ডাকা হয়েছে يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا (হে য়াহুদীগণ!) يَا بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ (হে বনী ইস্রাঈল!) ইত্যাদি। কিন্তু উম্মতে মোস্তফা আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে অত্যন্ত প্রিয় সম্বোধন اٰمَنُوْا দ্বারা ডাকা হয়েছে। যদিও মো'মিন তারাও ছিল কিন্তু এই সম্বোধন মুসলমানদের জন্য বিশেষ করা হয়েছে। কেননা মুসলমানদের পয়গাম্বর আলাইহিস সালাতু ওয়াস্ সালামকেও তাঁর পবিত্র নাম নিয়ে ডাকা হয়নি বরং ডাকা হয়েছে সুন্দরতম উপাধি দ্বারা। দ্বিতীয়তঃ সম্বোধন দ্বারা বুঝা যায় যে, তারপর ক্রোধ হবে না দয়া। একজনকে বলল, হে অপদার্থ! প্রতীয়মান হল-অসন্তোষ। একজনকে ডাকা হল- ওহে প্রিয়! প্রতীয়মান হল-অনুরাগ। এই সম্বোধন দ্বারা আল্লাহর অনুকম্পাই বুঝা যাচ্ছে। সব কিছু হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের বদৌলতেই।

দুই. اِسْتَجِيْبُوْا থেকে প্রতীয়মান হল-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দেয়া সর্বাবস্থায় ওয়াজিব। নামাযের মধ্যে থাকুক কিংবা স্ত্রী সহবাসে; সর্বাবস্থায় আনুগত্য অপরিহার্য। একদা হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)কে হুজুর ডাক দিলেন তখন তিনি নামাযে ছিলেন। তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে উপস্থিত হলেন। হুজুর ফরমালেন, এত দেরী কেন হল? তিনি আরজ করলেন, নামাযে ছিলাম। ফরমালেন, তুমি কি এই আয়াত পড়নি يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ অর্থাৎ যদিও নামাযের মধ্যে ছিলে কিন্তু আমার ডাক শুনে তৎক্ষণাৎ চলে আসা উচিৎ ছিল। কিছু কিছু অবস্থায় নামায ভেঙ্গে ফেলা জায়েয। তন্মধ্যে একটি হল মায়ের ডাকের সময় যখন মা জানে না যে, আমার ছেলে নামাযে রয়েছে এবং নামাযও নফল হলে। কোন প্রাণহানি ঘটার আশঙ্কা দেখা দিলে যেমন কোন অন্ধলোক কূপের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এবং নামাযী নামাযের মধ্য থেকে দেখতে পেয়েছে। এক দেরহাম পরিমাণ ক্ষতির আশংকায় যেমন নামাযীর সওয়ারী পালিয়ে যাচ্ছে অথবা রেল ছেড়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। (দেখুন শামী কিতাবুস সালাত) মায়ের ডাকে নামায ভেঙ্গে দেয়া জায়েয, পিতার ডাকে নয়। কেননা সম্মান পিতার বেশী তার জন্য দাঁড়িয়ে যেতে হবে এবং খেদমত মায়ের বেশী। (রূহুল বয়ান এই আয়াত প্রসঙ্গ) কিন্তু মায়ের ডাকে কেবল নফল নামায ভাঙ্গা যায় ফরয নয় এবং এতে নামায ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু হুজুর আলাইহিস্ সালামের ডাকে ফরয নামাযও ছেড়ে আসতে হবে এবং এই আসা যাওয়াতে নামায ভাঙ্গবে না।

সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত যে, তাঁরা সর্বাবস্থায় প্রিয়নবীর নির্দেশের আনুগত্য করতেন। তাহাভী শরীফ গোসল অধ্যায়ে রয়েছে–একজন সাহাবীকে হুজুর আলাইহিস্ সালাম ডাক দিলেন তখন সে তাঁর স্ত্রীর সাথে সহবাস করছিল। সহবাস শেষ না করে ওই অবস্থায়ই চলে এল। হুজুর ফরমালেন, لَعَلَّنَا اَعْجَلْنَا (হয়তঃ আমি তাড়াহুড়ায় ফেলে দিয়েছি) আরজ করল, হ্যাঁ, ইরশাদ করলেন, বীর্যপাতহীন সঙ্গমেও গোসল ওয়াজিব হয় অর্থাৎ বীর্যপাত হওয়ার পূর্বে স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে গেলেও গোসল করতে হবে। এই ঘটনা থেকে এই মাসআলা প্রমাণিত হল। অনুরূপভাবে সাহাবী হযরত হানযালা (রা.) জমীলাকে বিবাহ করেছেন। বাসর রাতে সহবাস করেছিলেন, গোসল করেননি এমতাবস্থায় উহুদ যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য আহবান পৌছল। ওই অবস্থায়ই তাঁর নববধূকে ছেড়ে রওয়ানা হন এবং শহীদ হয়ে যান। সাহাবীগণ দেখতে পান-শহীদগণের মধ্যে তাঁর লাশ মোবারক থেকে পানি ঝরছে এতে তারা আশ্চর্য হন। তাঁর সহধর্মিনী জানান তিনি অপবিত্র অবস্থায় ছিলেন। হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম ফরমালেন, তাকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছেন। এইজন্য তাঁর নাম গসীলুল মালায়েকা। (দেখুন তারীখের গ্রন্থাবলী ও হেদায়ার মোকাদ্দমা)

اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত ও গোলামীই সমস্ত ফরযের মূল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নুকতা (সূক্ষ্ম বিষয়): এখানে দু'টি বিষয় বুঝে নিতে হবে। প্রথমতঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাককে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন করা হল যে, সর্বাবস্থায় সাড়া দান অপরিহার্য করা হয়েছে? দ্বিতীয়তঃ ইরশাদ হয়েছে, لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ তারপর বলা হয়েছে دَعَاكُمْ (এক বচনের শব্দ)। আহবানকারী একজন কিন্তু আনুগত্য দু'জনের, আল্লাহ ও রাসূলের। কথা হল–মুসলমান পুরুষ হুজুরের গোলাম এবং মুসলমান নারী হুজুরের বাঁদী اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ (নবী মো'মিনদের প্রাণ অপেক্ষা ঘনিষ্টতর) اَوْلٰى এর অর্থ হয়তঃ اَقْرَبُ নিকটতর যেমন কাসেম নানুতভী সাহেব তাহ্যীরুল নাসে লিখেছেন অথবা اَمْلَكُ অধিকতর মালিক। দেখুন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত যয়নবের নিকট হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (তাঁর আযাদকৃত গোলাম)'র বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন তখন তিনি এবং তার ভাইগণ অস্বীকৃতি জানালেন। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হল مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ الاية অর্থাৎ যখন আল্লাহ ও রাসূল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন তখন কারো পক্ষে (তা) কবুল না করার অধিকার নেই। যেমন মনিব যেখানে ইচ্ছে তার দাসীকে বিবাহ দিতে পারে তা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার দাসীর নেই। এইরূপই হয়েছে এখানে। অথচ বিবাহ সম্পাদনের জন্য নারীর অনুমতির প্রয়োজন হয়ে থাকে। তা ছাড়া হুজুরের উপর যাকাত ফরয নয়। যাকাত দিলে কাকে দিবেন সবাইতো তার গোলাম, নিজের গোলামকে যাকাত দেয়া জায়েয নেই। তবে কোন কোনটা বিধান চালু করণের জন্য হয়েছে এটা তাঁর দয়া। যেমন নবী পত্নীগণ মো'মিনদের মাতা কিন্তু মীরাছ নেই। আর মালিকানাধীনের জন্য মনিবের ডাকে সাড়া দেয়া অপরিহার্য।

দ্বিতীয় বিষয়ের কারণ হল এই যে, হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ডাক মূলতঃ আল্লাহরই ডাক। এটাই কুরবে ইলাহী (খোদার সান্নিধ্য) ও ফানাইয়ত ফিয্যাত (আল্লাহর সত্তায় বিলীনতা)'র মাকাম যে, তাঁর কর্মকে নিজের কর্ম বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এইজন্য আয়াতে উল্লেখ তো রয়েছে আল্লাহ ও রাসূলের কিন্তু دعا শব্দ এনেছেন এক বচনের। সুতরাং এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও তোমরা নামাযের মধ্যে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক কিংবা কোন পার্থিব কাজে লিপ্ত থাক যখনই আল্লাহ নবীর মাধ্যমে ডাকবেন তৎক্ষণাৎ হাজির হয়ে যাও। হুজুরের নির্দেশ পালন করা যেন আল্লাহর নির্দেশ পালন করা।

তিন. لِمَا يُحْيِيْكُمْ এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথমতঃ এই ইবারত دعاكم এর متعلق (সংশ্লিষ্ট) এবং ما মওসূলা (موصوله) لام বর্ণটি الى অর্থে ব্যবহৃত। يحييكم সিলা (صله)। অর্থ হল– যখন তোমাদেরকে রাসূল এমন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

কাজের জন্য ডাকেন যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে। ঈমান,ইলম, জিহাদ, শাহাদত, নামায বা যে কোন কাজের জন্য ডাকেন-এসব কিছু রূহানী জীবন দান করে। এমনকি যদি তিনি ব্যক্তিগত কোন আনুগত্যের জন্য ডাকেন তা হলে তৎক্ষণাৎ চলে এসো, না নামাযের চিন্তা কর, না অন্য কোন ইবাদতের। কেননা তাঁর আনুগত্যই সমস্ত আমলের মূল।

مولی علی نے واری تری نیند پر نماز　　　اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے

معلوم ہوا کہ جملہ عبادت فروع ہے　　　اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিদ্রার জন্য মাওলা আলী (রা.) নামায কুরবান করেছেন তাও আসর যা সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। প্রতীয়মান হল-সমস্ত ইবাদত শাখা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামীই সমস্ত ফরযের মূল।

অথবা لام তা'লীলিয়্যা এবং এটা استجيبوا! এর متعلق (সম্পর্কিত) অর্থাৎ তাঁর ডাকে চলে এসো, কেননা তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করবেন। তার ব্যাখ্যা এই শে'র দ্বারা হতে পারে।

صد ہزاراں جبرئیل اندر بشر　　　بہر حق سوئے غریباں کن نظر

হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালামকে আল্লাহ তায়া'লা সেই মাহাত্ম্য ও রূহানিয়ত দান করেছেন যে, তিনি যে বস্তুকে স্পর্শ করেন তা জীবিত হয়ে যায় বরং ওই বস্তুও যার সাথে লাগে তাকেও জীবিত করে দেয় অতঃপর এটাও যার সাথে লাগে তাও জীবিত হয়ে যায়। এইজন্য কুরআন করীমে তাঁকে রূহ বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا– بِرُوْحِ الْقُدُسِ ইত্যাদি।

অতএব ফিরআউন যখন কিবতীগণকে সাথে নিয়ে মূসা আলাইহিস্ সালামকে ধাওয়া করল তখন সে একটি নর ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। মূসা আলাইহিস্ সালাম বনী ইস্রাঈলসহ নীলনদ শুকিয়ে তাতে ঢুকে যান এবং পানি পাহাড়ের ন্যায় উভয় পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে। ফিরআউন ঘাবড়ে গেল। ভাবতে লাগল পানিতে রাস্তা কিভাবে সৃষ্টি হল, আমি তাতে প্রবেশ করব কিনা? সিদ্ধান্ত নিল প্রবেশ করবে না। তখন হযরত জিবরীল আমীন একটি মাদী ঘোড়ায় আরোহণ করে আগে আগে যেতে লাগলেন। ফিরআউনের ঘোড়া নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে নীলনদে ঢুকে পড়ল এবং সবাই ডুবে মারা গেল। কিন্তু জিবরীলের ঘোড়ার খুর যেখানে পড়তো ওখানে ঘাস সৃষ্টি হতো। বনী ইস্রাঈলের একজন স্বর্ণকার তার খুরের নীচ থেকে মাটি তুলে নেয়। এখান থেকে নাজাত পেয়ে স্বর্ণের গোবৎস

তৈরী করে এবং তাতে ওই মাটি লাগিয়ে দেয়। এতে গোবৎসের মধ্যে প্রাণ সঞ্চালিত হয়ে নড়াচড়া সৃষ্টি হয় এবং তার পূজা আরম্ভ করে দেয়।

এ ছিল গরু পূজার সূচনা। যেমন নমরূদের অগ্নি থেকে অগ্নিপূজা ও ফাল্গুনী উৎসবের উৎপত্তি হয়েছে। যখন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের গোফন (যে যন্ত্রের সাহায্যে তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়) ভারী হয়ে যায় তখন শয়তান বলল, এখানে পরস্পর রঙ নিক্ষেপ করে অপকর্ম কর। এতে রহমতের ফেরেশতাগণ চলে যাবে এবং গোফন হালকা হবে। অতঃপর তাই করা হল। এটাই ছিল ফাল্গুনী উৎসবের সূচনা।

দেখুন, যে ঘোড়াকে জিবরীল স্পর্শ করেছে ওই ঘোড়ার সংস্পর্শে মাটিতে প্রাণ এসেছে এবং মাটির সংস্পর্শে গোবৎসের মধ্যে প্রাণ এসেছে। মাওলানা রূমী (রহ.) আরজ করেন, ইয়া হাবীবাল্লাহ! আপনি তো মানব কিন্তু এইরূপ হাজারো জিবরীলের রূহানিয়ত ও ক্ষমতা আপনার মধ্যে রয়েছে। যদি আমি অধমের প্রতি আপনি নজর (দৃষ্টি) দান করেন তা হলে আমিও জীবন পেয়ে যাব। তাঁর নজরের তো এই অবস্থা যে, একদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা হুজুরের চাদর মোবারক কাঁধে ধারণ করলেন তখন সপ্ত আসমান ও সপ্ত জমিন প্রকাশিত হয়ে যায় যাকে মাওলানা রূমী এইভাবে বর্ণনা করেছেন:

مصطفےٰ روزے بگورستان برفت　　　باجنازۂ یارازیاراں برفت

একদিন নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক সাহাবীর জানাযার উদ্দেশ্যে কবরস্থানে গমন করলেন।

خاک رادر گور آگندہ کرد　　　زیر خاک آں دانہ اش رازندہ کرد

কবরের মধ্যে মাটি ভরাট করলেন, মাটির নীচে (রোপন করা বীজের ন্যায়) তাঁকেও জীবিত করলেন।

چوں زگورستاں پیمبر باز گشت　　　سوئے صدیقہ شدو ہمراز گشت

পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কবরস্থান থেকে প্রত্যাগত হন অন্তরঙ্গ সহধর্মিনী আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)'র নিকট আগমন করেন।

چشم صدیقہ چوبر رویش فتاد!　　　پیشش آمد دست بروی می نہاد

হযরত সিদ্দীকার দৃষ্টি যখন তাঁর চেহারা মোবারকে পড়ল সম্মুখে এসে তাঁর বস্ত্রাদিতে হাত লাগিয়ে দেখতে লাগলেন।

گفت پیغمبر چہ می جوئی شتاب　　　گفت باراں آمد امروز از سحاب

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি ফরমালেন, হে আয়েশা! তুমি কি দেখছো? তিনি আরজ করলেন, আজ মেঘ হতে বারি বর্ষণ হয়েছে।

جامہایت می بجویم در طلب　　　تر نمی بینم زباراں اے عجب

অথচ আশ্চর্য আমি আপনার বস্ত্রাদিতে ওই বৃষ্টির কোন চিহ্ন দেখছি না।

گفت چہ بر سر فگندی از ازار　　　گفت کردم آن ردایت را خمار

হুজুর ফরমালেন, তুমি মাথায় কি পরেছিলে? তিনি আরজ করলেন, আপনার চাদর মোবারক।

گفت بہر آں نمودے پاک جیب　　　چشم پاکت را خدا باران غیب

হুজুর ফরমালেন, হে পুণ্যশীলা! ঐ চাদর পরিধানের বরকতে তোমার পবিত্র চক্ষুদ্বয়ে আল্লাহ অদৃশ্য বৃষ্টি দেখিয়েছেন।

نیست ایں باراں ازیں ابر شما　　　ہست باراں و دیگر و دیگر سما

যে বৃষ্টি তুমি দেখেছো, তা এই দৃশ্যত আসমানের নয় বরং তা ভিন্ন বৃষ্টি তার মেঘ ও আসমানই ভিন্ন।

উম্মতে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন ওলিয়ে কামিল হযরত খিযির আলাইহিস্ সালামকে খিযির এইজন্য বলা হয় যে, তিনি যেখানে পা মোবারক রাখেন ওখানে সজীবতা এসে যায়। খিযির অর্থ-সবুজ ও তাজা। তাঁর পবিত্র চরণে রয়েছে এই জীবন। তা ছাড়া যখন তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নির্দেশে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর সহচর যুশা আলাইহিস সালামকে নিয়ে রওয়ানা হন তখন পথিমধ্যে ভাজা মাছ নাশতাদানে রাখলেন। যখন দু'দরিয়ার মিলনস্থলে পৌছলেন তখন ওই মাছ সেখানকার আবহাওয়ার প্রভাবে জীবিত হয়ে পানিতে সাঁতরিয়ে যায় এবং পানিতে ছিদ্র হয়ে যায়। ওই আবহাওয়ার মধ্যে জীবনদানের এই প্রভাব হযরত খিযির আলাইহিস্ সালামের বরকতে হয়েছিল।

এতো আউলিয়ায়ে উম্মতের অবস্থা তা হলে ওয়ালিয়ে উম্মত কি ধরনের জীবন দান করেন নিজেই অনুমান করুন। এইজন্য আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারসমূহের নিকট মুর্দা দাফন করা উত্তম। কারণ আল্লাহর যে অনুগ্রহরাজি তাদের উপর হচ্ছে তারা তাদের প্রতিবেশীগণকে তা থেকে বঞ্চিত করবেন না। কোন বড় লোকের নিকট বসলে তাকে যে পাখা করা হচ্ছে তার বাতাস আমাদের নিকটও পৌছে যাবে। এই কারণে মদীনা পাকের নামায পঞ্চাশ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাজার নামাযের সমান এবং মক্কা মুয়ায্যমায় এক লাখের সমান। কারণ ওখানকার আবহাওয়া নামাযের জন্য অধিক উপযোগী। যেমন পাহাড়ী এলাকার ফল খুব বড় ও মোটা হয়ে থাকে।

মক্কা মুকার্‌রমার নামাযে মদীনা মুনাওয়ারার নামায অপেক্ষা সওয়াব বেশী কিন্তু মর্যাদায় ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। এইজন্য যদি মদীনা শরীফে জমাআত সহকারে নামায পড়া হয় তা হলে ইমামের ডান দিকে সওয়াব বেশী কিন্তু বাম দিকে মর্যাদা বেশী। কারণ বাম দিকে রওজা পাকের নৈকট্য রয়েছে। রওজা পাকের অবস্থান বাম দিকে। যেমন মানব দেহের মধ্যে অন্তরের অবস্থান বাম দিকে। মর্যাদা এক কথা সওয়াব অন্য কথা। যদি বাদশাহ কোন সিপাহীকে সন্তুষ্ট হয়ে লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করে এবং উজিরকে কিছু না দেয় তা হলে সিপাহী এই পুরস্কারের কারণে উজির অপেক্ষা বড় হয়ে যাবে না। মর্যাদা উজিরেরই বড় থাকবে।

একদা কিছু লোক হযরত তালহা (রা.)'র ঘরে দাওয়াত খাওয়ার জন্য গমন করে। দস্তরখান ছিল ময়লাযুক্ত। গৃহস্বামী ওটা আগুনে ফেলে দেয়। কিছুক্ষণ পর তাকে নিরাপদে বের করল তখন ওটা পরিষ্কার হয়েছিল। তালহা (রা.) বলেন, একবার হুজুর আলাইহিস্ সালাম এ দ্বারা হাত মোবারক পরিষ্কার করেছিলেন তখন থেকে এটাকে আগুন জ্বালায় না। মানুষ তো মানুষ প্রাণহীন বস্ত্রও শরীর মোবারকের ছোঁয়া পেয়ে প্রাণবন্ত হয়ে যায়। বারংবার দেখা গেছে–আল্লাহর অলিদের দেহের কাফনও দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও নষ্ট হয়না। যখন প্রাণহীন বস্তু অর্থাৎ, বস্ত্রাদির এইরূপ জীবন হতে পারে যে, মাটি ইস্পাতের মত কঠিন বস্তুকে গলিয়ে দেয় কিন্তু সাধারণ কাপড়কে গলাতে পারে না। তা হলে সৃষ্টির সেরা মানুষ তো প্রাণময় তার জীবন লাভ করা তো সহজেই অনুমেয়। এই তো কয়েক বছর পূর্বে বাগদাদে হযরত হোযায়ফা ইবনে য়ামান (রা.)'র পবিত্র মাযার খুলে তাকে স্থানান্তর করতঃ সালমান ফার্সী (রা.)'র কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। তখন জানা গেছে যে, জখমে (তাজা) রক্তের চিহ্ন রয়েছে এবং কাফন সেই রূপই অবিকৃত ছিল (যেইরূপ দাফনের সময় দেয়া হয়েছিল) এগুলো শিক্ষণীয় যে, তেরশ' বছরে কাফনের বস্ত্র গলেনি।

যদি এখনো ওলামা ও মাশায়েখদের মাধ্যমে নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী কারো নিকট পৌছে, তা হলে আনুগত্য ও সাড়া দেয়া অপরিহার্য। এইজন্য আযান শুনলে মসজিদে উপস্থিতি এবং হজ্বের মৌসুমে হারামাইন শরীফাইনে উপস্থিতি অপরিহার্য। এই হুকুম এক হিসেবে এখনো বহাল রয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঈসালে সওয়াব

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۭ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

রাসূল, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তিনি ঈমান আনয়ন করেছেন এবং মো'মিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে। তারা বলে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না, আর তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৫)

এই আয়াতে করীমায় কতিপয় বিষয় প্রণিধানযোগ্য:

প্রথমত: সূরা বাকারার শেষে এই আয়াত কেন ইরশাদ হল? দ্বিতীয়ত: এই আয়াতের অবতরণ কি প্রসংগে হয়েছে? তৃতীয়ত: এ থেকে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া গেল এবং কি কি মাসআলা জানা গেল?

এক. সূরা বাকারার শেষে এই আয়াতে করীমা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা এই মোবারক সূরার শুরুতে খোদাওয়ান্দ কুদ্দুসের পক্ষ হতে এই কিতাব নাযিল হওয়ার আলোচনা ছিল, শেষে তাঁর মাহবূবের আলোচনা। অবশিষ্ট পূর্ণ সূরা আল্লাহ্ ও রাসূলের যিক্‌রের মধ্যখানে রয়েছে। এই একই অবস্থা কলেমা, নামায, দুনিয়ার জীবন ও সমস্ত দোয়া-মুনাজাতের যে, প্রথমে খোদার যিক্‌র, শেষে তাঁর হাবীবের যিক্‌র। নামায শুরু হয় اَللّٰهُ اَكْبَرُ দ্বারা শেষ হয় দরুদ শরীফ দিয়ে। দুনিয়াতে এসো তখন আযান শুনো এবং দুনিয়া থেকে যাও তখন কলেমা পড়ে পড়ে যাও। দোয়া শুরু কর আল্লাহ্‌র হামদ্ ও সানা (প্রশংসা ও গুণকীর্তন) দিয়ে এবং শেষ কর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ দিয়ে। প্রত্যেক কাজ এরূপই হওয়া উচিত। তাছাড়া যখন শাহী ফরমান জারি হয় তখন প্রথমে সোলতানের নাম থাকে তারপর বিধান শেষে আদালতের মোহর এবং

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মন্ত্রী ও সচিবদের সত্যায়ন। সূরা বাকারায় প্রথমত: সোলতানী নাম মধ্যখানে কুরআনী আহকাম (বিধান) শেষে আদালতে মোস্তফা আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের সত্যায়নের মোহর এবং সিদ্দীক, ফারূক প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের (রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহুম) সত্যায়ন। অর্থাৎ- এই বিধানাবলী আল্লাহ্ তায়া'লা পাঠিয়েছেন এবং সত্যায়ন করেছেন মাহবূবে মোস্তফা আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ও তাঁর গোলামগণ। এই অবস্থায় اٰمَنَ এর অর্থ হবে صَدَّقَ

দুই. এই আয়াত অবতরণের প্রেক্ষাপট হল এই- যখন পূববর্তী আয়াত وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ الاية নাযিল হল, যার মধ্যে ইরশাদ হয়েছে- আল্লাহ্ তায়া'লা অন্তরের কল্পনাসমূহের হিসাবও গ্রহণ করবেন। তখন সাহাবায়ে কেরামের একটি দল প্রিয়নবীর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, ইয়া হাবীবাল্লাহ্! সমস্ত বিধানের আমরা আনুগত্য করেছি এবং অঙ্গীকার করছি যে, তা পালন করব। কিন্তু মনের কল্পনা ও কুমন্ত্রণা নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যদি তার উপরও হিসাব হয় তাহলে মুক্তির উপায় কি? হুজুর আলাইহিস্ সালাম ফরমালেন, তোমরা কি আমার নিকট আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছো? এবং তোমরা কি বনী ইস্রাঈলের ন্যায় বলতে চাও سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا আমরা শুনেছি কিন্তু মানব না? তারা আরজ করল, না। তখন اٰمَنَ الرَّسُوْلُ الاية নাযিল হল। এই আয়াতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামদের সুপারিশ করা হয়েছে যে, মাহবূব! এরা তো আপনার খাদেম ও অনুগত, আমি বলছি- রাসূলও ঈমান আনয়ন করেছেন এবং এই মুসলমানগণও। এ থেকে প্রতীয়মান হয়- সাহাবায়ে কেরামের ঈমান খোদায়ে কুদ্দুসের সত্যায়িত। যারা তা অস্বীকার করে তারা কুরআনকে অস্বীকার করে। বরং তাঁদের ঈমানের প্রতিও আমাদেরকে ঈমান আনতে হবে।

এই আয়াতে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম ও সাহাবায়ে কেরামের ঈমানকে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নচেৎ اَلْمُؤْمِنُوْنَ শব্দে তো রাসূলও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেন কোন অপদার্থ তাঁকে নিজের মত মো'মিন মনে করে ভাই বলার দুঃসাহস না দেখায়। যদিও মো'মিন শব্দ নবী ও উম্মতকে অন্তর্ভুক্ত করে কিন্তু ঈমানের ধরনে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। কেবল শব্দগত সামঞ্জস্য। দেখুন, আল্লাহ্ও মো'মিন কুরআন করীমে ইরশাদ হয়েছে, আল মো'মিনুল মুহায়মিনুল আযীয। কিন্তু এই মো'মিন শব্দ এবং আমাদের মো'মিন হওয়ার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ্কে ভাই বলা যাবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনুরূপভাবে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামকেও মুসলমান ভাই বলা যাবে না। হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের ঈমান এবং আমাদের ঈমানের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। হুজুর আল্লাহ্‌কে দেখে অবগত হয়েছে আমরা শুনে, জান্নাত, দোযখ, হাশর ও নশর সব কিছু হুজুরের দৃষ্টির অধীনে। সব কিছুর প্রতি রয়েছে চূড়ান্ত বিশ্বাস (حَقُّ الْيَقِيْن)। পক্ষান্তরে আমাদের ঈমান শ্রবণ নির্ভর। হুজুরের জন্য তাঁর নবুওয়াতের জ্ঞান হুজুরী (যা অর্জনরে জন্য চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না) কেননা নিজের সত্তা ও গুণাবলীর জ্ঞান (নিজের জন্য) হুজুরী হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের জন্য হুসূলী (যা অর্জন করার জন্য চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয়) তাহলে কিরূপে সাম্য হতে পারে? তাছাড়া আমরা কেবল মো'মিন, আর হুজুর আল্লাহ্ তায়া'লার মো'মিন এবং মুসলমানদের ঈমান। কসীদা বুরদার রচয়িতা বলেছেন,

اَلصِّدْقُ فِى الْغَارِ وَالصِّدِّيْقُ لَمْ يَرِمَا

وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا فِى الْغَارِ مِنَ الرَّمِ

অর্থাৎ সওর গুহায় মো'মিন ও ঈমান তথা সিদ্দীক ও মুসাদ্দাক বিহী উভয়ই বিদ্যমান ছিলেন। এইজন্য আমাদের কলেমায় হুজুর আলাইহিস্ সালামের পবিত্র নাম রয়েছে। হুজুরের কলেমায় উম্মতের নাম নেই। তাছাড়া আমরা মো'মিন, হুজুর মো'মিন বানানেওয়ালা। এর চেয়েও বড় পার্থক্য হয়েছে বাশারিয়াতের মাসআলায়। يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ হিসাবের মাসআলার বিশ্লেষণ হল এই যে, গুনাহ্ ও গুনাহের ইচ্ছার হিসাব গ্রহণ করা হবে। পাপের ইচ্ছাও পাপ। অন্তরে হঠাৎ আসা কল্পনার না হিসাব হবে, না ধর-পাকড়। لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (আল্লাহ্ কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব অর্পন করেন না, যা তার সাধ্যাতীত) এটাই বর্ণনা করেছে। হাদীস্ শরীফে ইরশাদ হয়েছে رُفِعَ عَنْ اُمَّتِى الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ بِمَا وَسْوَسَتْ بِهِ نَفْسُهُ (আমার উম্মতের জন্য তাদের মনের কুমন্ত্রণাজনিত ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করা হয়েছে) এইজন্য আম্বিয়ায়ে কেরাম গুনাহ্ ও গুনাহের ইচ্ছা থেকেও পবিত্র হয়ে থাকেন। য়ূসুফ আলাইহিস্ সালাম গুনাহের ইচ্ছা করেননি। এইজন্য আয়াত وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ 'র অর্থ হল- তিনিও রমণীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তেন যদি না তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতেন। এর বিশ্লেষণ আমাদের কিতাব 'ক্বাহরে কিবরিয়ায়' দেখুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আম্বিয়ায়ে কেরাম সব সময় আরিফবিল্লাহ্ এবং ঈমানী বিষয়াবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে থাকেন। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম জন্মগ্রহণের সাথেই ফরমায়েছেন اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا (তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন) হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম জন্মগ্রহণের সাথে সাথেই সাজদাকরতঃ ফরমায়েছেন رَبِّ هَبْ لِىْ اُمَّتِىْ (প্রভু! আমার উম্মত আমাকে দাও) প্রতীয়মান হল- পালনকর্তাকেও চিনতেন, নিজের নবুওয়াত সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল এবং উম্মতকেও চিনতেন। এইজন্য ফরমায়েছেন, كُنْتُ نَبِيًّا وَّاٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ (আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম আলাইহিস্ সালাম পানি ও মাটিতে মিশ্রিত ছিলেন)

সুতরাং اٰمَنَ দ্বারা হয়ত কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার সংক্ষিপ্ত ঈমান (اجمالى ايمان) কে বুঝানো হয়েছে অথবা বিস্তারিত ঈমান (ايمان تفصيلى) কে বুঝানো হয়েছে যা পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর অর্জিত হয়েছে। যেমন রয়েছে- لِيَعْلَمَ اللهُ আয়াতে। আর مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ দ্বারাও এই বিস্তারিত জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। অথবা تدرى অর্থ বিবেক দ্বারা জানা। প্রতীয়মান হল- মুসলমানগণের ঈমান ও পয়গাম্বরের ঈমানের মধ্যে ঈমানের ধরন ও সময়েরও পার্থক্য রয়েছে। তাঁদের ঈমান সবার পূর্বে। لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ দ্বারা নবীগণের রিসালতের মধ্যে পার্থক্য করাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কতেককে রাসূল স্বীকার করা এবং কতেককে স্বীকার না করা। কতেককে নবী বিয্‌যাত (মৌলিক নবী) স্বীকার করা এবং কতেক নবী বিল আরয (ছায়া নবী)। যেমন তাহযীরুন্ নাসে বলেছেন কাসেম নানুতভী সাহেব। কেননা নবীদের মূল নবুওয়াতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পদমর্যাদা ও বুযর্গীর মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ (এই রাসূলগণ, তাঁদের মধ্যে কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি) এর প্রমাণ। এইজন্য এখানে مِنْ رُّسُلِهٖ বলেছেন, مَرَاتِبِ رُسُلِهٖ বলেননি। অথবা সেই পার্থক্য বুঝানো হয়েছে যা দ্বারা কোন কোন নবীর অবমাননা হয়ে থাকে। এইজন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে لَا تُفَضِّلُوْنِىْ عَلٰى يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى আমাকে য়ূনুছ আলাইহিস্ সালামের উপরও শ্রেষ্ঠত্ব দিওনা। পক্ষান্তরে নিজেই ফরমায়েছেন اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ অর্থাৎ আমি সমস্ত মানব সন্তানের সরদার। যা দ্বারা অন্য পয়গাম্বরগণের অবমাননা হবে এইরূপ প্রশংসা হারাম। অথবা মর্মার্থ হল এই যে, আমরা নিজেদের পক্ষ হতে নবীগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। যে পার্থক্য আল্লাহ্ [illegible]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করি। لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا আয়াতে অনেক ব্যাপকতা রয়েছে। হয়তঃ নফস দ্বারা ব্যাপকভাবে মানুষ, জানোয়ার, বৃক্ষ ইত্যাদির নফ্স বুঝানো হয়েছে। তখন তার মর্মার্থ হল এই যে, কোন প্রাণীর উপর সাধ্যাতীত কষ্টকর কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয় না। মানুষ হোক কিংবা অন্য কিছু। দেখুন, ঘাস, খড়, বৃক্ষ ইত্যাদির মধ্যে চলার শক্তি নেই সুতরাং আল্লাহ্ তায়া'লা সেগুলোকে দণ্ডায়মান অবস্থায়ই পানি, খাবার সেখানেই পৌছে দেন। পশুপাখি ইত্যাদির মধ্যে চলার শক্তি আছে কিন্তু উপার্জনের নেই। সুতরাং তাদের বাসায় দানা পানি যায় না বরং তাদেরকে আহার করতে হয় ক্ষেত-খামারে গিয়ে। যেহেতু মানুষের মধ্যে চলারও শক্তি রয়েছে, উপার্জনেরও। সুতরাং তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, চলো এবং উপার্জন কর। তারপরও শৈশবে দুর্বল থাকে সুতরাং দুধের ঝর্ণা এবং দ্রুত হজমশীল খাদ্য উপার্জন ছাড়াই দান করেন। যুবক হলে বায়ু, পানি বিনামূল্যে দান করেন। অন্ন ও বস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাতেও অনেক সাহায্য করেছেন বৃষ্টির পানি, রৌদ্র, চন্দ্রালোক এসব কিছু পরিশ্রম ছাড়াই দান করেছেন। অথবা نَفْسًا দ্বারা মানুষের নফ্সকে বুঝানো হয়েছে। অতএব, মর্মার্থ হল এই যে, মানুষের মধ্যে যে পরিমাণ সামর্থ রয়েছে সেই পরিমাণই তাকে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। যে কাজ তার দ্বারা হবে না কিংবা যা খুব কঠিন হবে তার দায়িত্ব অর্পণ করেননি। বিশেষতঃ মুসলমানগণ থেকে সেই কষ্টকর দায়িত্বগুলোও তুলে দিয়েছেন যা বনী ইস্রাঈলের উপর ছিল। সর্বত্র নামায বৈধ করেছেন, পানি দ্বারা সবকিছু পবিত্র করার সুযোগ দান করেছেন। তাদের নামায কেবল ইবাদতখানায় হতো, তাদেরকে এক চতুর্থাংশ সম্পদ যাকাত বাবদ দিতে হতো। অপবিত্র কাপড়, নাপাক শরীর কেটে ফেলার নির্দেশ ছিল। তাওবার জন্য কঠিন শর্তাবলী ছিল। কিন্তু হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের উসীলায় মুসলমানদের জন্য এইরূপ কঠিন বিধান প্রদান করেননি।

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ এর অর্থ হল- নেক আমল (সৎকর্ম) ও বদ আমল (অসৎ কর্ম) স্বয়ং আমলকারীর জন্যই, তা না অন্য কেউ পাবে এবং না তাতে অন্য কেউ শরীক হবে। কিন্তু উভয় বাক্যাংশের উপর আপত্তি হচ্ছে প্রথমতঃ আমলের সওয়াব তো অন্য কেউও পেয়ে থাকে। এইজন্য কুরআন করীম মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যে, অন্যান্য মুসলমানদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া কর। যদি কারো দোয়া ও আমল কারো জন্য কাজে না আসে তাহলে এটা কেন? হযরত সা'দ কূপ খনন করিয়ে বলেছিলেন, এটা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমার মায়ের জন্য। অপরাপর অনেক হাদীস রয়েছে যা দ্বারা সওয়াব বখশিশ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বাক্যাংশের উপর এই প্রশ্ন যে, কুরআনে ইরশাদ হয়েছে وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ অর্থাৎ কাফির সরদারগণ তাদেরও বোঝা বহন করবে এবং তাদের অনুসারীদেরও। হাদীস শরীফে রয়েছে- যে ব্যক্তি মন্দ সুন্নাত অর্থাৎ মন্দ পন্থা আবিষ্কার করবে তার উপর নিজের গুনাহ্ও এবং অপরাপর আমলকারীদের গুনাহ্ও বর্তাবে। এখন প্রণিধানযোগ্য বিষয় হল- এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে- নিজের আমল নিজেরই কাজে আসবে। হাদীস বলছে- অন্যরাও উপকার পাবে। প্রথম প্রশ্নের উত্তর কয়েক ধরনের হতে পারে। প্রথমতঃ 'লাম' মালিকানা অর্থ (ملکیت) বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ নিজের আমলেরই মালিক। ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনের সওয়াবের হাদিয়ার আশায় এখন আমল না করা মারাত্মক ভুল।

بعد مرنے کے تمہیں اپنا پرایا بھول جائے
فاتحہ کو قبر پر پھر کوئی آئے یا نہ آئے

অর্থাৎ মৃত্যুর পর তোমাকে আপন-পর সবাই ভুলে যাবে, অতঃপর ফাতেহা পাঠের জন্য কবরের নিকট কেউ আসতেও পারে নাও আসতে পারে।

এটাই মর্মার্থ- لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى এর। দ্বিতীয়তঃ এই আয়াতে করীমায় শারীরিক ফরযসমূহ আদায়ের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যদি কেউ বদনী (শারীরিক) ইবাদত যেমন নামায, রোযা কারো পক্ষ থেকে আদায় করে তা হলে সে ফরয থেকে অব্যাহতি পাবে না। বাকী মালী (আর্থিক) ইবাদত, তাতে উকিল নিযুক্ত করা জায়েয। যেমন যাকাত আদায় করার ব্যাপারে এবং বদনী ও মালির সমন্বয়ে ইবাদত, তাতে ওযরের সময় অন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করা জায়েয, ওযর ছাড়া নয়। যেমন হজ্ব বদল, মৃত্যুর পর কিংবা অতিবার্ধক্যে অন্য কাউকে নিজের পক্ষ থেকে হজ্ব করার জন্য পাঠানো যায়। তৃতীয়তঃ এইরূপ হবে না যে, কর্তা একেবারেই সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে, সে অবশ্যই পাবে। সওয়াব বখ্শিশ দ্বারা নিজে বঞ্চিত হবে না। এইজন্য শিশুদের হাদিয়া গ্রহণ করা নিষিদ্ধ কিন্তু খতম ইত্যাদি সওয়াবের হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয। কারণ তাতে শিশুর কোন ক্ষতি নেই। শামী ১ম খণ্ডে রয়েছে- সাদকা বা খতমের সওয়াব সকল মুসলমানকে যেন বখ্শিশ করে। কারণ এতে সওয়াব

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিভক্ত হয় না বরং পুরোপুরি পাওয়া যায়। এই ব্যাখ্যাগুলো ছাড়া সমন্বয় সম্ভব নয়। كَسَبَتْ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে শারীরিক ইবাদতের প্রতি। কেননা শারীরিক (বদনী) ইবাদতকে كسب বলা হয় আর্থিক (মালী) ইবাদতকে নয়। দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর হল এই যে, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির বোঝা এইভাবে বহন করবে না যে, অপরাধী পাপমুক্ত হয়ে যাবে। বরং সরদারের উপর নিজের অপরাধ কর্মের বোঝাও হবে এবং অন্যান্যদেরও। কেননা সে সরদার, যার ব্যাখ্যা দিচ্ছে এই আয়াত فَمَا اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ (অতঃপর আল্লাহ্ ব্যতীত যে ইলাহসমূহের তারা ইবাদত করত তারা তাদের কোন কাজে আসল না)। অন্যত্র ইরশাদ রয়েছে لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى (কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না) মোট কথা বোঝা বহন করা এক বিষয়, গুনাহ্ নেয়া অন্য বিষয়। সরদার বোঝা নিবে, গুনাহ্ নিবে না। হাদীস শরীফে রয়েছে- যে কোন ব্যক্তি অত্যাচারবশত: হত্যা করে তাতে ক্বাবীলের অংশও থাকে কেননা সে প্রথম হত্যাকারী, হত্যাকাণ্ড সেই আবিষ্কার করেছে।

এও বলা যায় যে, মন্দ কাজের আবিষ্কারের গুনাহ্ সকলের সমান হয়ে থাকে কিন্তু আবিষ্কারকের নিজের কর্মের গুনাহ্ হবে, অন্যান্যদের নয়। তবে এটা বর্ণনায় আসছে যে, কর্জদাতা কর্জ গ্রহীতার পুণ্য নিয়ে যাবে এবং গীবতকারী (পরনিন্দাকারী) অপরের গুনাহ্ নিয়ে যাবে। এ দ্বারা কোন আপত্তি উঠছে না। কারণ এতো কর্মের ব্যাপার যা কর্তা করেছিল এবং সেই ছিল তার মালিক। সে নিজেই অপরকে দিয়ে দিল। যদি কোন কিছু আমি উপার্জন করি তাহলে সেটা আমার। কিন্তু যখন কাউকে প্রদান করি তাহলে সেটা তার হয়ে যাবে। কারো ঋণ যখন আমার জিম্মাদারীতে নিয়ে নেব তাহলে সেটা আমার সম্মতিতে আমার উপর বর্তালো। গীবতের মধ্যে সানন্দে অপরের গুনাহ্ নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেয়।

যদি এই আয়াত সম্পূর্ণ যাহেরী (বাহ্যিক) অর্থে রাখা হয় তাহলে পৃথিবীতেও কেউ কিছুর মালিক হবে না এবং কেউ কারো বোঝা বহন করবে না। অথচ উত্তরাধিকার (মীরাস), বেচা-কেনা, দান (তোহ্ফা) ইত্যাদির মাধ্যমে মালিক হয়ে থাকে এবং জিম্মাদারী, ওকালতি অংশীদারিত্ব ইত্যাদির মাধ্যমে অপরের বোঝাও বহন করে থাকে। আয়াতকে তো দুনিয়া কিংবা আখিরাতের সাথে সীমাবদ্ধ করা হয়নি। সুতরাং আয়াতের সেটাই মর্মার্থ যা আমরা বর্ণনা করেছি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا এর মধ্যে বান্দাদের জন্য দোয়া প্রার্থনার শিক্ষা রয়েছে। অথবা এখানে এবং অপরাপর দোয়াগুলোতে قُوْلُوْا উহ্য রয়েছে। অথবা এই বাক্যগুলো আল্লাহ্ ফরমায়েছেন যেন বান্দাগণ তা শুনে এইরূপই বলেন। যেমন পাঠদানের সময় শিক্ষক বলেন, আলিফ, বা, তা। এইজন্য যে, ছাত্রও যেন এইরূপ বলে। অথবা শব্দাবলী বান্দাদের এবং ফরমায়েছেন আল্লাহ্ তায়া'লা। যেমন কোন আনজুমানের (পরিষদ) সদস্য ফরমে সভাপতি লিখেন- 'আমি এই আনজুমানের উন্নয়নে সচেষ্ট থাকব, মাসিক চাঁদা ঠিকভাবে আদায় করব।' যখন কেউ সদস্য হয় তখন এই ফরমে স্বাক্ষর করে। এই কথা তো সদস্যের কিন্তু কলম সভাপতির। এই আলোচনা দ্বারা 'আ'রিয়া' সম্প্রদায়ের এই প্রশ্ন চলে গেল যে, اِيَّاكَ نَعْبُدُ ইত্যাদি থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, 'কুরআন কোন বান্দার গড়া গ্রন্থ নচেৎ খোদা কার ইবাদত করছে এবং কার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছে' অপনোদিত হয়ে গেল। কেননা এই জাতীয় আয়াতসমূহে বান্দাদের দ্বারা এই কথাগুলো বলানোই উদ্দেশ্য। উৎসর্গ হও সেই দয়ালু প্রতিপালকের জন্য; যিনি নিজেই আমাদেরকে প্রার্থনা শিক্ষা দিচ্ছেন এবং নিজেই নে'মত দান করছেন। নিজেই আবেদনের পদ্ধতি শিক্ষা দিচ্ছেন আবার নিজেই কবুল করছেন। আমরা তো প্রার্থনাও জানতাম না। প্রার্থনা করার জন্যও তো (যোগ্য) মুখের প্রয়োজন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নূর নবীর বাশারিয়ত

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَیَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ.

বলুন, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্। (সূরা কাহাফ, আয়াত- ১১০)

এই আয়াতে করীমায় কতিপয় বিষয় প্রণিধানযোগ্য:

প্রথমত: এই আয়াতের উদ্দেশ্য কি? দ্বিতীয়ত: قُلْ দ্বারা কি উপকারিতা পাওয়া গেল? তৃতীয়ত: 'বশর' এর অর্থ কি? চতুর্থত: مِثْلُكُمْ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? পঞ্চমত: يُوْحٰى اِلَیَّ এর মধ্যে কি রহস্য নিহিত?

এক. মানুষ জমিন ও আসমানকে পরিমাপ করেছে কিন্তু নিজকে পরিমাপ করতে পারেনি। সবকিছুর হাকীকত অনুধাবনের পেছনে লেগে রয়েছে কিন্তু নিজের হাকীকত সম্পর্কে উদাসীন। যদি নিজের পরিচয় জানতো তাহলে আল্লাহর পরিচয়ও জানতে পারতো مَنْ عَرَفَ نَفْسَهٗ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهٗ (যে ব্যক্তি নিজের পরিচয় পেয়েছে সে তার প্রতিপালকের পরিচয় লাভ করেছে) বাতিল (ভ্রান্ত) মাযহাবসমূহ এটাও বাতলে দিতে পারেনি যে, হে মানুষ! তোমার হাকীকত কি? কোন মাযহাব মানুষকে এত বাড়িয়ে দিয়েছে যে, খোদাকে অস্বীকার করেছে। কেউ কেউ নিজেই খোদা সেজে বসেছে। আসমানী মাযহাবসমূহকেও মূর্খরা মুছে ফেলেছে যে, আম্বিয়ায়ে কেরামকে খোদা বা খোদার পুত্র বা খোদার অংশীদার দাবী করে বসেছে। পক্ষান্তরে কতেক নির্বোধেরা নবীগণকে তাদের মত অসহায় মানুষ বলে দাবী তুলেছে। প্রথম দল সীমালংঘন এবং দ্বিতীয় দল সীমাহ্রাসে রয়েছে। ইসলাম এই উভয় ত্রুটি থেকে পবিত্র। ইসলাম চায়- মানুষ না সীমা অতিক্রম করুক না আম্বিয়ায়ে কেরামের শানে সীমালংঘন ও সীমাহ্রাস নিয়ে কাজ করুক।

হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের কয়েকটি মো'জেযা দেখে লোকেরা তাঁকে ইবনুল্লাহ্ (আল্লাহর পুত্র) বলে দিয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত উযাইর আলাইহিস্ সালামের মো'জেযা দেখে তাঁকে য়াহুদীরা ইবনুল্লাহ্ বলেছে। আর দর্শকগণ নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমতার এই দৃশ্য অবলোকন করেছে যে, আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, অস্তমিত সূর্য ফিরে এসেছে, বৃক্ষ ও পশুপাখি সাজদা করেছে, [illegible] বরকতে মৃত জীবন্ত হয়েছে। সুতরাং প্রবল

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আশংকা ছিল যে, হয়ত মূর্খ লোকেরা এই দয়ালু সত্তার মধ্যেও উলূহিয়্যাতের অংশ রয়েছে বলে বিশ্বাস করে বসবে। এই উদ্দেশ্যেই ইসলামের প্রবর্তক তার প্রত্যেকটা কথা ও কাজে নিজের আবদিয়তকে প্রকাশ করেছেন এবং এই আয়াতের মধ্যে নিজের বাশারিয়তের ঘোষণা দিয়েছেন। কলেমায় পড়ালেন عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ যেন মানুষ অসংখ্য মো'জেযা দেখে তাঁকে খোদা না বলে।

দুই. قُلْ শব্দ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ বলার অনুমতি কেবল হুজুরের জন্যই রয়েছে, সবার জন্য নয়। এইজন্য قُوْلُوْا مِثْلُكُمْ বলা হয়নি। যদি প্রশ্ন উঠে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এর মধ্যেও তো قل রয়েছে। তা হলে এই قل দ্বারা الله احد বলার নির্দেশ হুজুরের জন্যই রয়েছে এবং হুজুরের ফরমান অনুযায়ী অন্য লোকেরা اَللّٰهُ اَحَدٌ বলবে। যদি রিসালতের শিখানো তাওহীদের মোকাবেলায় কেউ তার বিবেকের বাত্‌লানো তাওহীদ মান্য করে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া কুরআনের অন্যত্র সাধারণ মুসলমানগণকে তাওহীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু কুরআনে কোথাও নবীকে বশর বলার সাধারণ অনুমতি দেয়া হয়নি। বরং 'বশর' বলাকে কাফিরদের উক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। قَالُوْا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا فَكَفَرُوْا (তারা বলতো, মানুষই কি আমাদেরকে পথের সন্ধান দিবে; অতঃপর তারা কুফরী করল।) مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا (তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ) وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ (যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে) ইত্যাদি।

মাওলানা রুমী (রহ.) বলেন:

کار پاکاں را قیاس از خود مگیر　　گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر

হে প্রিয় বৎস! পবিত্র ব্যক্তিগণকে নিজের মত অনুমান কর না শে'র (شیر) অর্থাৎ বাঘ যদিও লিখার মধ্যে শি'র (شیر) অর্থাৎ দুধ এর অনুরূপ কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে।

شیر آں باشد کہ مرد اورا خورد　　شیر آں باشد کہ مردم را درد

যদিও شیر (শে'র) ও شیر (শি'র) লিখনীর মধ্যে সমান দেখা যায় কিন্তু শি'র হল মানুষ যা খায় আর শে'র হল যা মানুষকে ছিড়ে ফেটে খায়।

جملہ عالم زیں سبب گمراہ شد　　کم کسے ز ابدال حق آگاہ شد

এই ভুল অনুমানের কারণে সমস্ত জগদ্বাসী বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তবে স্বল্প সংখ্যক লোকই আল্লাহর বন্ধুগণ সম্পর্কে ওয়াকিফ রয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اشقیارا دیدۂ بینا نہ بود نیک وبد در چشم شاں یکساں نمود

হতভাগা লোক সত্য দর্শনের চক্ষু থেকে বঞ্চিত, এইজন্য তাদের চোখে ভাল ও মন্দ সমান দেখায়।

ہمسری با انبیاء برد اشتند اولیا را ہمچوں خود پنداشتند

অতএব, তারা নবীগণের সমকক্ষতার দাবী করেছে এবং অলিগণকে নিজেদের সমান মনে করেছে।

گفت ایک ما بشر ایشاں بشر ما و ایشاں بستہ خوابیم و خور

যদি কেউ তাদের এই বেআদবীর উপর আপত্তি উত্থাপন করে তখন তারা বলে দেয়- আমরাও মানুষ তারাও মানুষ, আমরা ও তারা আহার, নিদ্রা ইত্যাদির বাধ্য। সুতরাং পার্থক্য কোথায়?

ایں نہ دانستند ایشاں از عمی ہست فرقے درمیاں بے منتہی

কিন্তু তারা তাদের বাতেনী দৃষ্টিহীনতার কারণে এটা বুঝতে পারেনি যে, এতদুভয়ের মধ্যে অশেষ পার্থক্য রয়েছে।

ہر دو یک گل خورد زنبور و نحل لیک شد زاں نیش وزاں دیگر عسل

উদাহরণ স্বরূপ, দু' প্রকারের বোলতা (অর্থাৎ ভীমরুল ও মৌমাছি ফুল ও মুকুলের রস) একই স্থান থেকে চোষণ করেছে কিন্তু একটা থেকে তৈরী হয়েছে বিষ এবং অপরটা থেকে মধু।

ہر دو گوں آہو گیا خوردند آب زیں یکے سرگیں شد وزاں مشک ناب

দ্বিতীয় উদাহরণ, দু ধরনের হরিণ একইভাবে ঘাস খেয়েছে এবং একই ঘাট থেকে পানি পান করেছে। কিন্তু একটাতে রয়েছে বিষ্ঠা এবং অপরটাতে বিশুদ্ধ কস্তুরী।

ہر دوئے خوردند از یک بخور آں یکے خالی و آں پر از شکر

তৃতীয় উদাহরণ, দুই প্রকারের বেণু একই ঘাট (অর্থাৎ মাটি) থেকে পানি চুষে পরিতৃপ্ত হয় কিন্তু একটা রয়েছে ফাঁপা এবং অপরটা চিনিপূর্ণ।

صد ہزاراں ایں چنیں اشباہ بیں فرق شاں ہفتاد سالہ راہ بیں

এইভাবে লক্ষ লক্ষ উদাহরণ দেখতে পাবে যেগুলোর মধ্যে সত্তর বছরের পথের (অর্থাৎ বিস্তর) পার্থক্য দৃশমান রয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ایں خورد گردد پلیدی زیں جدا آں خورد گردد ہمہ نور خدا

অনুরূপভাবে এ যখন আহার করে, তা থেকে আবর্জনা বের হয় আর তিনি (নবী) যা আহার করেন তার সবটুকুই আল্লাহর নূরে পরিণত হয়।

তা ছাড়া যাকে বিশেষ গুণাবলী প্রদান করা হয় তাকে সাধারণ গুণ দ্বারা ডাকা তার গুণাবলী অস্বীকার করারই নামান্তর। খান বাহাদুর, নবাব সাহেব, কালেক্টর সাহেব ইত্যাদি যাকে সরকার প্রদান করে, যদি তাকে ইনসান বা বশর বা নাম নিয়ে ডাকা হয় তাহলে সে শাস্তিযোগ্য হয়ে যায়। অতএব, যে মহান সত্তাকে খোদায়ী সরকারের পক্ষ থেকে নবী, রাসূল, মুয্যাম্মিল ও মুদ্দাস্সিরের উপাধি প্রদান করা হয়েছে তাকে সাধারণ উপাধি দ্বারা স্মরণ করা নিঃসন্দেহে অপরাধ। আল্লাহ্ তায়া'লা তো ডাকেন يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ (হে নবী!)। يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ (হে রাসূল!) আর আমাদের উদ্দেশ্যে ফরমায়েছেন لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য কর না।) সুতরাং বশর (মানুষ) বলা হারাম।

তিন. اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ এর মধ্যে বশর শব্দ বলা হয়েছে। ইনসান বা আদমী ইত্যাদি নয়। কারণ بَشَرٌ অর্থ ذُوْ بُشْرَه (চর্মধারী) যেমন حَسَنٌ (সৌন্দর্য) অর্থ ذُوْ حَسَنٍ (সৌন্দর্যধারী)। সুতরাং অর্থ হল এই যে, আমি বাহ্যিক রং, রূপ, চেহারা ও অবয়বে তোমাদের মতই কিন্তু বাস্তব বিষয় হল يُوْحٰى اِلَيَّ আমি ছাহেবে ওহী। যদি ইনসান বলা হতো তাহলে ইনসান বলা হয় শরীর ও নফসের সমষ্টিকে অথচ নবীদের নফ্স আমাদের নফ্সের মত নয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বাহ্যিক আকার আকৃতিতে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয় কিন্তু তাঁদের বাশারিয়ত মালাকিয়ত অপেক্ষা শক্তিশালী।

মি'রাজের রাতে সিদ্‌রায় রূহুল আমীনের মালাকী শক্তি শেষ হয়েছিল। কিন্তু হুজুরের বাশারী শক্তি তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম হযরত মালাকুল মাওতকে থাপ্পর মেরেছিলেন তখন তার মালাকী শক্তি ওই বাশারী শক্তির থাপ্পর সহ্য করতে পারেনি ফলে চোখ নষ্ট হয়ে যায়। প্রতীয়মান হল নবীগণের বাশারিয়ত ফেরেশতাদের মালাকিয়ত অপেক্ষা উন্নতরতর। এখানে ইরশাদ হয়েছে مِثْلُكُمْ এবং হাদীসে রয়েছে اَيُّكُمْ مِثْلِيْ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيُسْقِيْنِيْ (অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছ? আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান। (দেখুন নুরুল আনওয়ার সওমে ভিসাল প্রসঙ্গ) অন্যত্র ফরমান, وَلٰكِنِّيْ لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ (আমি তোমাদের কারো মত নই)। সুতরাং কুরআনের বাহ্যিক ইবারত এর পরিপন্থী মনে হচ্ছে। কিন্তু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

না। এর অর্থ সেটাই যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল জানেন। অনুরূপভাবে بَشَرٌ ও مِثْلُكُمْ لِذَنْبِكَ ইত্যাদির প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং তার অর্থ আল্লাহ্ ও রাসূলের সোপর্দ কর। এই নিয়ম খুবই উত্তম।

ছয়. এও অনুধাবণ করা আবশ্যক যে, হুজুরের মত হওয়া সত্তাগতভাবে অসম্ভব। যেমন খোদার মত হওয়া অসম্ভব। জগতের (عالم) মধ্যে আমরা কেন কেউই হুজুরের মত হতে পারে না। কারণ কুরআন হুজুরকে ফরমায়েছে রাহমাতুল লিল আলামীন, আল্লাহ্ যার প্রতিপালক তার জন্য হুজুর রহমত। সুতরাং যদি কাউকে হুজুরের মত ধরে নেয়া হয় তা হলে সেও আলমের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব হুজুর তার জন্যও রহমত এবং সে হুজুরের কৃপাধন্য (مرحوم) তাহলে সাদৃশ্য থাকছে কোথায়? কুরআন করীম বলেছে خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ (শেষনবী) হুজুর ফরমায়েছেন, اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ (আমি আদম সন্তানের সরদার) সুতরাং যদি হুজুরের মত কেউ হয়ে থাকে তাহলে সেও আদম সন্তানই হবে এবং নবী হবে। যদি হুজুর তার সরদার ও শেষ না হন তাহলে নকীয (نقيض) অর্থাৎ سالبه جزئيه প্রযোজ্য হবে, এই আয়াত ও হাদীসের موجبه كليه বাতিল হবে। তাছাড়া হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম শেষ নবী এবং শেষ কিতাবধারী। প্রথম সুপারিশকারী, প্রথমে হুজুরের নূর সৃষ্টি হয়েছে, কিয়ামতের দিন প্রথমে তিনিই কবর থেকে উঠবেন, প্রথমে তিনিই জান্নাতে প্রবেশ করবেন। সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ একজনই হতে পারে। প্রকৃত শুরু (ابتداء حقيقى) ও প্রকৃত শেষ (انتهاء حقيقى) একজনের উপরই হতে পারে। (দেখুন, মাওলানা ফজলুল হক খায়রাবাদীর ইমতিনাউন নাযীর, শরহে তাহযীব য়াযদী ও আমাদের তফসীরে নঈমী ১ম পারা) তাছাড়া এই আয়াতে রয়েছে قصر موصوف على الصفت আর قصر حقيقى তো অসম্ভব। দেখুন মুখতাসারুল মাআনী, কসরের আলোচনা।

অতএব, ইযাফতে সাফী (اضافت صافى) প্রমাণিত। অর্থাৎ আমি তোমাদের মত মানুষই। এর অর্থ এই নয় যে, বাশারিয়ত ছাড়া অন্য কোন গুণ নেই, না কায়েম না লা কায়েম; না কায়েদ না লা কায়েদ। কেননা ارتفاع نقيضين অসম্ভব। সুতরাং অর্থ হল আমি বশরই, না খোদা, না খোদার অংশ, না খোদার পুত্র। এতে কোন বিতর্ক নেই।

حق یہ کہ ہیں عبدالہ اور عالم امکاں کے شاہ
برزخ ہیں وہ سر خدایہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

প্রকৃত বিষয় হল, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং আলমে ইমকানের (নশ্বর জগত) বাদশাহ্ তিনি وجوب (অবিনশ্বর) ও امكان (নশ্বর) এর পর্দা এবং খোদার

www.AmarIslam.com

এও স্মর্তব্য যে, এখানে قل বলা হয়েছে। অর্থাৎ হে মাহবূব! শিষ্টাচারিতার ভিত্তিতে আপনি বলুন। না আমি আপনাকে বশর বলে ডাকব, না অন্য কাউকে অনুমতি প্রদান করব। আমি তো يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ (হে নবী!) يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ (হে রাসূল!) يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (হে বস্ত্রাবৃত!) يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (হে বস্ত্রাচ্ছিত!) বলে ডাকব এবং মানুষকে নির্দেশ প্রদান করব لَاتَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا রাসূল আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে এইভাবে আহ্বান কর না যেভাবে একে অপরকে আহ্বান করে থাকো। এইজন্য ফাতেমা যাহরা হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে আব্বাজান বলে ডাকতেন না। আয়েশা সিদ্দীকা স্বামী বলে, হযরত আলী ভাই বলে, হযরত আব্বাস ভাতিজা বলে ডাকতেন না। বরং সবাই ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবীবাল্লাহ্, ইয়া শফীআল মুযনিবীন, রাহমাতুল লিল্ আলামীন বলে প্রিয় সম্বোধন দ্বারা ডাকতেন। যখন এই মহাত্মাগণ, যাদের বংশগত সম্বন্ধের ফলে এই ধরনের সম্বোধন দ্বারা ডাকার অধিকার হতে পারতো; তাঁরা এই ধরনের শব্দাবলী দ্বারা ডাকতেন না, তাহলে আমরা গোলাম ও নিম্নস্তরের লোকদের ভাই বলে সম্বোধন করার কি অধিকার আছে? স্মর্তব্য যে, مِثْلُكُمْ দ্বারা কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি বলুন, হে কাফিরগণ! তোমরা আমার নিকট হতে পলায়ন কর না, আমি ফেরেশতা বা জিন বা খোদা নই, বরং তোমাদের স্বজাতি মানুষ হই। সিদ্দীক আকবরকে ফরমায়েছেন اَيْكُمْ مِثْلِىْ তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছ? অপরিচিত মানুষদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য তাদের সাথে এক ধরনের কথা আর জানা শোনা লোকদের সাথে অন্য ধরনের।

মাসনভী শরীফে রয়েছে- এক ব্যক্তি একটি ময়না পাখি পালন করেছিল পাখিটাকে বুলি শেখানোর জন্য সব ধরনের চেষ্টা করল। কিন্তু সে সফল হতে পারেনি। তার এক বন্ধু বলল, যদি তুমি তাকে বুলি শিখাতে চাও তাহলে মানুষের কায়া পরিমাণ একখানা আয়না সংগ্রহ কর এবং আয়নার সম্মুখে ময়নার খাঁচা ঝুলিয়ে দাও। তারপর পিছন থেকে তুমি নিজেই বলবে। তাহলে ময়না খুব তাড়াতাড়ি বুলি শিখে ফেলবে। অতএব সে এইরূপই করল। এবার ময়না সুন্দরভাবে বলতে শুরু করে। ময়নার মালিক আশ্চর্য হয়ে যায়। তার বন্ধুর নিকট এর রহস্য জিজ্ঞেস করল। সে বলল, তুমি ময়নার স্বজাতি নও, সে তোমাকে ভয় করতো। এখন আয়নার সম্মুখে যখন তার খাঁচা এল সে মনে করল এই আয়নার মধ্যে আমার স্বজাতি রয়েছে এবং আমার সাথে কথা বলছে। এই জাতীয় সংগতির কারণে তাড়াতাড়ি বুলি শিখে ফেলেছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাওলানা বলেন, আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে ফয়েয দান ও ফয়েয গ্রহণের ধারা কায়েম হতে পারে না। সুতরাং মোস্তফা রূপের আয়না স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝখানে রাখা হল এবং এই আয়নার পিছন থেকে কথা বলেছে কুদরত। মুখ ছিল মোস্তফার, কথা ছিল খালেকে (স্রষ্টা) মোস্তফার وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى (তিনি মনগড়া কথা বলেন না, এতো ওহী যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।) আর মাহবূবকে হুকুম দিলেন এই অপরিচিতদেরকে বলে দিন اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ তোমরা আমার নিকট থেকে পালিয়ে যেয়ো না। দেখ, আমি তো তোমাদের মত মানুষই। যাতে আপনার প্রতি অন্তরঙ্গ হয়ে ফয়যে ইলাহী কবুল করতে পারে। মাওলানা রূমী বলেন,

گفت من آینۂ مصقول دوست

ترکی و ہندی بہ بیند آنچہ اوست

হুজুর ফরমালেন, আমি তো প্রেমাস্পদের স্বচ্ছ আয়না, তুর্কী ও হিন্দী যে যেরূপ সে ওই রূপই দেখবে।

সুন্দর বলেছেন আ'লা হযরত-

خود رہے پردہ میں اور آئینہ حسن خاص کا

بھیج کر انجانوں سے کی راہداری واہ واہ

নিজে পর্দার অন্তরালে থেকে সৌন্দর্যের বিশেষ আয়না পাঠিয়ে অশিক্ষিতদেরকে পথ দেখিয়েছেন বাহ্! বাহ্!

এখন হুজুর ফরমায়েছেন, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, লোকেরা বলল, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

لباس آدمی پہنا جہاں نے آدمی جانا

مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے

মানুষের পোশাক পরিধান করেছেন তাই জগত তাঁকে মানুষ হিসেবে জেনেছে। মুয্যাম্মিল (বস্ত্রাবৃত) হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং তাজাল্লী (খোদার নূরের ঝলক) হয়ে বের হবেন।

যখন অন্তরঙ্গ হয়ে গেল তখন ফরমালেন اَيُّكُمْ مِّثْلِيْ এই কৌশলের কারণে বাশারিয়তের ঘোষণা দিয়েছেন নচেৎ এত স্পষ্ট কথার উপর এভাবে জোর দেয়ার কি কারণ ছিল? আল্লাহ্ তায়া'লা দৃষ্টিমান চক্ষু দান করুন। আমীন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইস্তিগ্‌ফার ও তাক্‌ওয়া

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ.

যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব হতে রক্ষা কর; তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, ব্যয়কারী এবং উষাকালে ক্ষমাপ্রার্থী। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১৬ ও ১৭)

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে বেহেশত্ ও তার নে'মতসমূহ মুত্তাকীদের জন্য। কুরআন করীমে মুত্তাকী লোকদের বড় বড় মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। কোথাও ইরশাদ হয়েছে وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (যে কেউ আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তার (মুক্তির) পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন রিয্‌ক।) কোথাও ফরমায়েছেন, اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ (যারা ঈমান আনে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে) যা থেকে প্রতীয়মান হল- মুত্তাকী মো'মিনই আল্লাহর ওলি। এখানে বলা হয়েছে- মুত্তাকী কারা এবং তাক্‌ওয়া কাকে বলা হয়?

এখানে কতিপয় বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত: তাক্‌ওয়ার কয়টি স্তর আছে? অতঃপর এটা কোন্ তাক্‌ওয়ার আলোচনা? দ্বিতীয়ত: এখানে আটটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। ১. তাদের উক্তি- আমরা ঈমান এনেছি। ২. আমাদের পাপ ক্ষমা কর। ৩. আমাদেরকে আগুনের আযাব হতে রক্ষা কর। ৪. ধৈর্য ধারণ করা। ৫. সত্য বলা ৬. আনুগত্য করা ৭. দান করা ৮. উষাকালে উঠে মাগফিরাতের দোয়া করা।

এক. তাক্‌ওয়ার আভিধানিক অর্থ হল- বিরত থাকা বা ভয় করা। শরীয়তের পরিভাষায় তাক্‌ওয়া হল পরকালের ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে বিরত থাকা। তার মোট চারটি স্তর রয়েছে। প্রথমত: শিরক ও কুফর থেকে বিরত থাকা। এ হল প্রথম স্তর, যাকে তাক্‌ওয়ায়ে আ'ম্মা (সাধারণ তাকওয়া) বলা হয়। দ্বিতীয়ত:

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হারাম বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকা। তৃতীয়তঃ সন্দেহজনক বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ যে বস্তুতে হারাম হওয়ার সন্দেহ থাকে, তা থেকে পরহেয্ করা। اِتَّقُوا الشُّبُهَاتِ যদি কেউ বলে, মীলাদ শরীফের মাহফিলে সন্দেহ রয়েছে যে, হারাম না জায়েয? কেননা কতেক আলেম এটা নাজায়েয বলেন। এ ধারণা ভিত্তিহীন। তাদের জন্য সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা.)'র উটের গোশত ও দুধ থেকে বিরত থাকা এবং সে প্রসংগে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়াই যথেষ্ট উত্তর- يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَّةً (হে মো'মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর।) সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ প্রথমে য়াহুদী ছিলেন এবং উটের গোশত হারাম জানতেন। ইসলাম গ্রহণের পর উটের গোশত থেকে পরহেয করতে থাকেন এই মনে করে যে, য়াহুদীরা তাকে হারাম বলে, ইসলামের মধ্যে তা খাওয়া ফরয নয়। সুতরাং আমি খাই না। আল্লাহ্ তায়া'লা ফরমালেন, হে মো'মিনগণ! তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ কর শয়তানী ধ্যান-ধারণা অনুসরণ কর না। চতুর্থতঃ আল্লাহ্ ছাড়া সবকিছু থেকে বিরত থাকা। এ হল সূফীয়ায়ে কেরাম ও আল্লাহ্র ওলীগনের তাক্ওয়া।

দুই. এখানে দ্বিতীয় স্তরের মুত্তাকীদের আলোচনা রয়েছে। কেননা ঈমানের পাশাপাশি আমলেরও উল্লেখ রয়েছে। আযাব ছাড়াই জান্নাতের যোগ্যতা অর্জন এই তাকওয়া দ্বারাই হয়ে থাকে। প্রথম স্তরের তাক্ওয়া অর্থাৎ ঈমান ছাড়া তো জান্নাত হারাম। দ্বিতীয় তাক্ওয়া অর্থাৎ পরহেয্গারী ছাড়া কিছুকালের জন্য জাহান্নামে যেতে হতে পারে। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরওয়ালাদের বড় মর্যাদা ও ফযীলত রয়েছে। জান্নাত ছাড়াও আরো উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। এখানে কেবল জান্নাতের যোগ্যতা অর্জনের উল্লেখ রয়েছে যা দ্বিতীয় স্তরওয়ালাদের জন্য প্রযোজ্য।

তিন. يَقُوْلُوْنَ এর উপর প্রশ্ন- আল্লাহ্ তো তাদের ঈমান সম্পর্কে জানেন তথাপি তারা اٰمَنَّا বলে নিজেদের ঈমানের সংবাদ কেন দিচ্ছে? এই উক্তির তিনটি উপকারিতা রয়েছে। প্রথমত: নিজেদের মাগফিরাতের যোগ্যতা অর্জন করার কথাই আরজ করা উদ্দেশ্য। رَبَّنَا বলে আরজ করল- তুমি আমাদের প্রতিপালক এবং যে কোন বিপদে নিজের মুরব্বীকে ডাকে। اٰمَنَّا বলে আরজ করল- আমরা অনুগত প্রজা, ভুল-ভ্রান্তির ক্ষমার যোগ্য যার ওয়াদা দিয়েছো তুমি নিজ গুণে। দ্বিতীয়ত: সৎকর্মের বরকতে সাহায্য প্রার্থনা করা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনুরূপভাবে বুযর্গদের ওসীলায় দোয়া করাও সুন্নাতসম্মত। ওতেও রয়েছে ঈমানের বরকতে দোয়া। যেমন বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে- তিন ব্যক্তি একটি পাহাড়ের গুহায় আটকে পড়ে। তখন এক ব্যক্তি তার মাতা-পিতার খেদমত, দ্বিতীয় ব্যক্তি কঠিন মুহূর্তে ব্যভিচার থেকে বেঁচে যাওয়া এবং স্বর্ণ মুদ্রা ওখানে রেখে দেয়ার বরকতে এবং তৃতীয় ব্যক্তি শ্রমিকের মজুরিকে ছাগল, পশু ও শস্যের ভাণ্ডারে পরিণত করার বরকতে দোয়া করেছে এবং মুক্তি পেয়েছে। তৃতীয়ত: কিছু সৎকর্ম গোপনে করা উচিত। যেমন অধিকাংশ নফল নামায। পক্ষান্তরে কিছু সৎকাজ প্রকাশ করা প্রয়োজন। এইজন্য ঈমানকে নিজের আকৃতি, পোশাক এবং প্রত্যেক কাজে প্রকাশ করুন পাঞ্জেগানা নামায, ঈদ ও জুমা সবার সাথে জামাআত সহকারে পড়ুন। প্রসিদ্ধ গুনাহের তাওবাও প্রসিদ্ধ নিয়মে করুন। কেননা اَلتَّوْبَةُ عَلٰى قَدْرِ الْحُوْبَةِ (তাওবা পাপের পরিমাণ অনুযায়ী হতে হবে।) কিছু কিছু নফল মসজিদে পড়ুন। যেমন তাহিয়্যাতুল ওজু, ইশরাক ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ, বাকীগুলো ঘরে। মোটকথা ঈমানকে প্রকাশ করাও জরুরী। এইজন্য ফরমায়েছেন يَقُوْلُوْنَ অর্থাৎ তাদের ঈমানকে ওসীলা হিসেবে গ্রহণকরত: আল্লাহর দরবারে উপস্থাপন করে।

চার. গুনাহ্সমূহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং নিজকে পাপী মনে করাও তাক্ওয়ার লক্ষণ। আগুনের শাস্তি এইজন্য বলা হয়েছে- জাহান্নামে যদিও ঠাণ্ডা স্তরও রয়েছে কিন্তু তার মূল আগুন বাকীগুলো অনুগামী। 'সবর'র অর্থ হল নফ্সকে আবদ্ধ করা। তা তিন প্রকার। আল্লাহর আনুগত্যে আবদ্ধ করা, পাপাচার হতে আবদ্ধ করা এবং বিপদের সময় ধৈর্যহীনতা থেকে আবদ্ধ করা। আনুগত্যে আবদ্ধ করার অর্থ হল এই যে, সর্বদা আনুগত্যের উপর অটল থাকা, এটা নয় যে, কিছুদিন আনুগত্য করল তারপর ছেড়ে দিল অথবা যখন অজু ও নামাজ ভারী মনে হয় তখন ছেড়ে দেয় তারপর পড়ে। এটা কাম্য নয় বরং সর্বাবস্থায় পুণ্যকাজ করবে। পাপাচার হতে ধৈর্য হল এই যে, যদি কোন পাপ, সিনেমা কিংবা সূদ, ঘুষ ও অবৈধ বেচাকেনার দিকে মন আকৃষ্ট হয়, তা থেকে নফ্সকে বাধা দিবে এটাও মুত্তাকীর লক্ষণ। এগুলোর উপর মুত্তাকীই অটল থাকতে পারে।

পাঁচ. صَادِقِيْنَ এরও তিনটি প্রকার রয়েছে। صدق فى القول অর্থাৎ কথায় সত্যবাদী হওয়া, صدق فى الفعل অর্থাৎ কাজে সত্যবাদী হওয়া ও صدق فى النيت অর্থাৎ নিয়তে সত্যবাদী হওয়া। কথায় সত্যবাদিতা হল এই যে, কারো

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাথে ওয়াদা করা হলে তা পূরণ করবে, সংবাদ প্রদান করা হলে সত্য সংবাদ প্রদান করবে। কেননা মুনাফিকের তিনটি লক্ষণ, যখন ঝগড়া করবে তখন গালমন্দ করবে, কথা বললে মিথ্যা বলবে এবং আমানত রাখা হলে খেয়ানত করবে। কাজে সত্যবাদিতা হল এই যে, কোন কাজ শুরু করলে তা পূর্ণ করবে এবং নিয়ত ভাল করবে। কুরআন ও তাক্ওয়াকে যেন প্রতারণার ফাঁদ হিসেবে গ্রহণ না করে। হাফেজ শীরাযী (রহ.) বলেন,

حافظا مئے خور و رندی کن و خوش باش وے
دام تزویر مکن چوں دگران قرآن را

দিগরা একটি পাখি যার ডানায় সৃষ্টিগতভাবে কিছু রেখা রয়েছে যা দেখতে কুরআনের অক্ষর মনে হয়। পাখিটা মৃত হয়ে জিহ্বা বের করতঃ পড়ে থাকে। যখন পিপড়াগুলো তার জিহ্বায় একত্রিত হয়ে যায় তখন আস্তে করে খেয়ে ফেলে। কবি বলেন, হে হাফেজ! অন্যান্য গুনাহ্ সহজ কিন্তু কুরআনকে ধোকা ও প্রতারণার জন্য পড়া গুরুতর গুনাহ্। কয়েকটি স্থানে মিথ্যা বলার জন্য পাকড়াও করা হবে না। প্রথমত: প্রাণের আশংকার সময় কুফরী শব্দ প্রকাশ করা (অন্তরের বিশ্বাস ঠিক রেখে)। দ্বিতীয়ত: বিবদমান মুসলমানদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য ইত্যাদি। দেখুন শামী, ৫ম খণ্ড, কিতাবুল কিরাহিয়্যা। নিয়ত ও ইচ্ছার সত্যবাদিতা হল এই যে, যে কোন ভাল কাজ করবে তা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করবে اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (যাবতীয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল) দুনিয়ার কাজ, আহার-নিদ্রা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ছেলে-মেয়ের লালন-পালন, চাকরী, কৃষিকাজ ইত্যাদি যদি ভাল নিয়ত অর্থাৎ ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকার জন্য হয় তাহলে সেটাও সওয়াবের কাজ। যদি নামাযও লোক দেখানো ইত্যাদির জন্য হয় তাহলে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। প্রত্যেক কাজ ভাল নিয়তে করা উচিত। ফজরের নামাযের নিয়তে রাত্রি ঘুমানোও ইবাদত।

ছয়. اَلْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ 'র মধ্যে অনেক ব্যাপকতা রয়েছে। قٰنِتِيْنَ এর মধ্যে সব ধরনের আনুগত্য চলে এসেছে, আত্মিক হোক বা শারীরিক বা আর্থিক। মানুষ যেন নিজকে সম্পূর্ণ শরীয়তের হাতে সঁপে দেয়।

جہاں کردیا نرم نرما گئے وہ جہاں کردیا گرم گرما گئے وہ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শরীয়ত যেখানে মানুষকে কোমল রাখে ওখানে কোমল থাকে আর যেখানে উত্তপ্ত করে ওখানে উত্তপ্ত হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে مُنْفِقِيْنَ এর মধ্যেও ব্যাপকতা রয়েছে। জিহাদের মধ্যে প্রাণ ব্যয় করা, যাকাত ইত্যাদিতে কিংবা সন্তানদের লালন-পালনে কিংবা মাতা-পিতার সেবায় সম্পদ ব্যয় করা সবই ইন্ফাক। সাহাবায়ে কেরামের মাতাগণ তাদের সন্তানদেরকে এই নিয়তেই লালন-পালন করত যে, এটা কোন সময় ইসলামের কাজে আসবে। দেখুন হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম ও ওই বৃদ্ধার ঘটনা যে উহুদের মধ্যে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের আঁচল জড়িয়ে ক্রন্দন করেছিল অথচ তার স্বামী ও ছেলে সবাই শহীদ হয়েছে। কিন্তু সে কারো জন্য কোন চিন্তা করেনি এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনাকে পেয়েছি তো সব কিছুই পেয়েছি। আমি তো সন্তানদেরকে এই জন্যই লালন-পালন করেছিলাম।

সাত. وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ দ্বারা হয়ত তাহাজ্জুদ নামাযকে বুঝানো হয়েছে। কারণ তার বড় ফযীলত রয়েছে। যে ব্যক্তি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করবে তার চেহারা নূরানী হবে। অথবা উষাকালে উঠে ইস্তিগফার পাঠকারীকে বুঝানো হয়েছে। হযরত লোকমান তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তুমি মোরগের চেয়ে নিকৃষ্ট হয়ো না। জিজ্ঞেস করল কিভাবে? তিনি বললেন, মোরগ তো সকালে উঠেই আল্লাহর যিক্র করে আর তুমি শুয়ে থাকবে!

حیف تو سوتا رہے مسجد میں ہوتی ہو اذان
مرغ ماہی سب اٹھیں یاد خدا کے واسطے

হায়! মসজিদে আযান হচ্ছে আর তুমি ঘুমিয়ে আছ! মোরগ, মৎস্য সব কিছুই উঠেছে খোদার যিক্রের উদ্দেশ্যে।

بِالْاَسْحَارِ থেকে প্রতীয়মান হল- অন্যান্য সময়ের চেয়ে উষাকালের ইস্তিগফার উত্তম। এইজন্য হযরত য়ূসুফ আলাইহিস্ সালামের জামা যখন তাঁর মহানুভব আব্বার নিকট এল তখন তাঁর ছেলেরা আরজ করল, আব্বাজান! আমাদের বড় অপরাধ হয়েছে। আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মাগফিরাতের দোয়া করুন। এই প্রেক্ষিতে হযরত য়া'কুব আলাইহিস্ সালাম ফরমালেন سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ আমি আমার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব। ওই

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সময়ে দোয়া করেননি যেন উষাকালে দোয়া করা হয়। কোন প্রাণী উষাকালে কখনো নিদ্রিত থাকে না। যদি মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তাহলে তা পশুর চেয়েও নীচে চলে গেল। যদি সকালে উঠে দরজা খোলা হয় এবং ঘরে ঝাড়ু দেয়া হয় তাহলে ঘরে বরকত থাকবে। তাছাড়া যখন কোন ব্যক্তি ফজরের সুন্নাত ঘরে পড়ে এবং জায়নামাযেই নিয়মিত সত্তরবার اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّیْ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَیْهِ পাঠ করে। অতঃপর ফজরের ফরয মসজিদে জমাআত সহকারে পড়ে তাহলে ইনশাআল্লাহ্ ওই ঘরে প্রচুর বরকত হবে এবং পরস্পরে মিলেমিশে থাকবে। এটা পরীক্ষিত। ইস্তিগফার বড়ই মোবারক বিষয়। নিঃসন্তান পড়লে ইনশাআল্লাহ্ সন্তানওয়ালা হয়ে যাবে। দুর্ভিক্ষে পড়া হলে বৃষ্টিপাত হবে। গরীব নিয়মিত পড়লে ধনী হয়ে যাবে। মোটকথা, শত শত বিপদের চিকিৎসা ইস্তিগফার একটিই। অতঃপর উষাকালের ইস্তিগফারের তো সুবহানাল্লাহ্ কি বলার আছে? নূহ্ আলাইহিস্ সালাম তাঁর গোত্রকে ফরমায়েছেন-

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُّرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ الاية

তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন, তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদীনালা।

আমাদের বাবা আদম আলাইহিস্ সালাম পৃথিবীতে এসে সর্বপ্রথম যে কাজটি করেছেন তা হল ইস্তিগফার। আল্লাহ্ তায়া'লা তাওবা ও ইস্তিগফারের তাওফীক দান করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইসলামের যথার্থতা

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ.

ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৯)

এই আয়াতে করীমায় কতিপয় বিষয় প্রণিধানযোগ্য:

প্রথমতঃ পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এর কি সম্পর্ক? দ্বিতীয়তঃ এই আয়াতের উদ্দেশ্য কি? তৃতীয়তঃ দ্বীন ও মাযহাবের মধ্যে পার্থক্য কি? চতুর্থতঃ ইসলামের যথার্থতায় যুক্তিগত কি কি দলীলাদি রয়েছে এবং দ্বীনে ইসলাম আল্লাহর কেন পছন্দ?

এক: পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে-মুত্তাকীরাই জান্নাতের অধিকার রাখে। তারপর আলোচনা হয়েছে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, ফেরেশতা ও জ্ঞানীগণও এই বিষয়ে সাক্ষী। অতএব হয়ত কেউ বলত জান্নাত লাভের জন্য তাক্ওয়ার প্রয়োজন যে ধর্ম অনুসরণে হোক না কেন। যেমন কতেক মূর্খ মুফাসসিরগণ তাদের তাফসীরে লিখেছে যে, প্রত্যেক ধর্ম স্ব স্ব স্থানে যথার্থ। যেটাই নিয়মিতভাবে পালন করবে নাজাত পেয়ে যাবে এবং নাজাতের জন্য ইসলামের অনুসরণ জরুরী নয়। অথবা شَهِدَ اللّٰهُ আয়াত দ্বারা কেউ প্রতারণা করত যে, কেবল তাওহীদই মুত্তাকী হওয়ার জন্য যথেষ্ট যে কোন ধর্মে অবস্থান করে হোক না কেন! এই দু'ধারণাকে খণ্ডন করার জন্য ইরশাদ হয়েছে-গ্রহণযোগ্য ধর্ম আল্লাহর নিকট ইসলামই। অন্যত্র আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন:

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

(কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত) এ থেকে প্রতীয়মান হল ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মে অবস্থান করে কোন আমল করা হলে তা কবুল হবে না। প্রথমে অনুগত প্রজা হোন তার পর অন্য কথা শোনা হবে। ইসলাম ব্যতীত না শয়তানী তাওহীদ গ্রহণযোগ্য, না ইবাদত ও রিয়াজতের কোন গুরুত্ব।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে–দ্বীন ইসলাম ছাড়াও আরো আসমানী দ্বীন পৃথিবীতে এসেছে। যেমন দ্বীনে ঈসাভী, দ্বীনে মূসাভী ও দ্বীনে ইবরাহীমি ইত্যাদি। অতএব ওই যুগে তাদের নাজাতের মাধ্যম কি ছিল? তখন তো পৃথিবীতে ইসলামের আগমনই ঘটেনি। এর দু'ধরনের জবাব রয়েছে। প্রথমতঃ এ হল ইসলামের আগমনের পরের হুকুম। এর পূর্বে ওই ধর্মগুলো স্ব স্ব যুগে হেদায়তপূর্ণ ছিল। কিন্তু এখন যদি কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন অবলম্বন করে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এইজন্য হযরত খিযির আলাইহিস্ সালাম নবী মোস্তফা আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের অনুসরণে ধন্য এবং হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম এই দ্বীন অনুযায়ী আমলকরতঃ পৃথিবীতে তশরীফ আনবেন।

দ্বিতীয়তঃ এখানে ইসলামের আভিধানিক অর্থ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আসমানী ধর্মের প্রত্যেকটা স্ব স্ব যুগের ইসলাম ছিল। কিন্তু (দ্বীনের) সূর্য উদিত হওয়াতে বাতিগুলোর প্রয়োজনীয়তা নেই। لَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا مَا وَسِعَهُ اِلَّا اِتِّبَاعِىْ যদি মূসা আলাইহিস্ সালাম আজ পৃথিবীতে থাকতেন তা হলে তাঁকেও হুজুর আলাইহিস্ সালামের অনুসরণ করতে হতো। কেননা, তাঁর শরীয়ত রহিত হয়ে গেছে।

দুই. এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হল এই যে, পৃথিবীতে প্রত্যেক সম্প্রদায় এটাই বলে যে, আমরা ঈমানদার, সবাই ঈমানেরই বুলি আওড়ায়। কিন্তু মাকবূল হল সেই যাকে আল্লাহ তায়া'লা তাঁর রেজামন্দির সনদ দান করেন। এক প্রেমাস্পদের অনেক প্রেমিক রয়েছে সবাই বলে মেহবূব আমাকে পছন্দ করে। এখন ফয়সালার কেবল এই একটি সূরতই রয়েছে যে, স্বয়ং মেহবূবকে জিজ্ঞেস কর, তুমি কাকে পছন্দ কর? এখানে এই নিয়মে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা কেন ঝগড়া কর? তোমরা আমাকে রাজী করার জন্যই তো দ্বীন গ্রহণ কর? আমি বলছি আমি ইসলামই পছন্দ করি, মুসলমানগণই আমার মাকবূল বান্দা।

তিন. দ্বীন আকায়েদ (ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস) কে বলা হয় এবং মাযহাব শাখাগত (فرعى) মাসআলাগুলোকে বলা হয়। এইজন্য বলা যায় যে, হানাফী, শাফেয়ী ইত্যাদিতে রয়েছে মাযহাবী দ্বন্দ্ব, দ্বীনি দ্বন্দ্ব বলা যায় না। কিন্তু আমাদের এবং খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে, এভাবে আমাদের এবং কাদিয়ানী ও দেওবন্দীদের মধ্যে রয়েছে দ্বীনি দ্বন্দ্ব। আমরা ও তারা ধর্মের মধ্যে পরস্পর বিরোধী। সুতরাং ইসলাম তার সকল হক মাযহাবগুলোকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। এর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। হানাফী, শাফেয়ী,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মালেকী, হাম্বলী তা ছাড়া কাদেরী, চিশতী, নক্শবন্দী, সাহরওয়ার্দী সবক'টিই সঠিক। এগুলো ইসলামেরই অন্তর্ভুক্ত।

চার. কুরআনকে যারা মানে তারা তো এই আয়াতে করীমাকে দেখেই ইসলামের যথার্থতা স্বীকার করে নিবে। কিন্তু যে কুরআনকে মানে না সে এতে সন্তুষ্ট হবে না। তার জন্য এই আয়াতের সমর্থন যুক্তিগত দলীলাদি দ্বারা এভাবে করা যেতে পারে যে, কোন কিছুর যথার্থতা বা উপকারী হওয়ার উপর দু'ধরনের দলীলাদি কায়েম করা যায়। প্রথমতঃ তার কর্তা বড়। দ্বিতীয়তঃ তার উপকারিতা প্রচুর। একটি ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে এইরূপ বলা হয় যে, এই ব্যবস্থাপত্র ভাল। কেননা এটা হাকীম আজমল খাঁর ব্যবস্থাপত্র। অথবা এ দ্বারা লাখো মানুষ উপকার পেয়েছে,মোটকথা কোন বস্তুর মাহাত্ম্য বস্তুওয়ালার মাহাত্ম্য বা তার উপকার দ্বারা প্রকাশিত হয়। অথবা এভাবে বুঝুন-যদি কেউ কোন অপরিচিত শহরে গিয়ে পৌছে তখন সে ওই হোটেলে অবস্থান করবে যেখানে খাবার, বায়ু, পানি, শৌচাগার ইত্যাদি সবকিছুর সুব্যবস্থা থাকে। বিশেষতঃ যখন ওই হোটেলে এগুলোর পাশাপাশি ভাড়াও কম হয়। এই বিচারে ইসলামের যথার্থতা সম্পূর্ণ প্রকাশমান যে, ইসলাম সেই মাযহাব যার প্রতিষ্ঠাতা মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সমৃদ্ধকারী সিদ্দীক ও ফারূকের মত ব্যক্তিত্বগণ। তা ছাড়া ইসলাম এমন ব্যবস্থাপত্র (প্রেসক্রিপশন) যার ব্যবহারে আরবের লোক যারা ছিল জগদ্বাসীর দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত, যারা নিজেদের মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছিল তারা মানুষ, নয় বরং মানুষ গড়ার কারিগরে পরিণত হয়েছে। যারা ছিল পশু রাখাল তারা মানুষের সভ্যতার শিক্ষকে পরিণত হয়েছে। যারা লুটতরাজ করত তারা জগতের রক্ষকে পরিণত হয়েছে। আর এই ইসলামের প্রতি উদাসীন হয়েই আমরা হীন ও লাঞ্ছিত হয়ে পড়ি। মোটকথা এই তিনটি মাধ্যমে ইসলামের যথার্থতা সুস্পষ্ট। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা কেমন? স্বয়ং ইসলাম কেমন ব্যবস্থাপত্র? এবং তার বিধানাবলী কেমন? ইসলাম অনুসরণ করে মানুষ কি হতে কি হয়েছিল এবং তা ত্যাগ করে আবার কি হতে কি হয়ে পড়েছে? এই তিনটি গুণ ইসলামের পক্ষে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।

ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে এমন সৌন্দর্য রয়েছে যা কোন মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে পাওয়া যেতে পারে না। একেতঃ তাঁর জীবনের সমুদয় ঘটনা এইভাবে সংকলিত হওয়া যে, তার সনদে যাদের নাম আসবে তাদেরও ইতিহাস লিখা হবে। যদি খ্রিষ্টান, য়াহুদী, পৌত্তলিক ইত্যাদির নিকট জিজ্ঞেস করা হয় যে, তোমরা তোমাদের ধর্মগুরুগণের জীবনী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রমাণ সহকারে বর্ণনা কর, তা হলে তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। হিন্দুরা তো নিশ্চিতভাবে এও বলতে পারে না যে, যার উপর বেদ এসেছে তিনি মানুষ ছিলেন কিনা? কেননা তাদের মধ্যে অনেক মানুষ আগুন ও পানির উপর বেদ অবতীর্ণ হয়েছে বলে বিশ্বাসকরতঃ এগুলোর পূজা করে। তারা ওই ঋষি-মুনিদের জীবন বৃত্তান্ত কি বর্ণনা করবে? কিন্তু ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী এইরূপই যে, আপাদমস্তকের সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিস্তারিত এবং জীবনের বাইরের ও ভিতরের সব কিছুই তাঁর সহধর্মিনীগণ ও সাহাবায়ে কেরাম এইভাবে সংকলন করেছেন যে, কোন কথাই বাদ রাখেননি। এমনকি রেওয়ায়তের মধ্যে এও এসেছে যে, মাহবূবের মাথা মোবারকে বিশখানা চুল সাদা ছিল। একজন রাবী হাদীস বর্ণনা করতঃ ছাত্রকে একটি খেজুর দান করলেন। আরেকজন হাদীস বর্ণনা করতঃ মুচকি হাসলেন এবং শিক্ষার্থীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আমার নিকট এর কারণ কেন জিজ্ঞেস করছো না? আরজ করা হল, বলুন! তিনি বললেন, হুজুর এই বাণী ইরশাদ করতঃ মুচকি হেসেছিলেন অথবা হুজুর খেজুর দান করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের প্রেম ছিল মজনূনের প্রেম অপেক্ষা উন্নততর। কেউ রূপকথা হিসেবে বলে দিয়েছে যে, একদা রক্তমোক্ষণ করিয়েছিল লায়লা আর রক্ত বের হয়েছে মজনূনের। কিন্তু এখানে বাস্তবেই এইরূপ ঘটেছে যে, মাহবূব মোস্তফার রোগ হলে সিদ্দীক আকবর দুর্বল হয়ে যেতেন আর মাহবূব সুস্থ হলে সিদ্দীক সবল হয়ে উঠতেন। তিনি নিজেই বলছেন:

مَرِضَ الْحَبِيْبُ فَزُرْتُهٗ فَمَرِضْتُ مِنْ حَذْرِيْ عَنْهُ

شُفِيَ الْحَبِيْبُ فَزَارَنِيْ فَشُفِيْتُ مِنْ نَظْرِيْ اِلَيْهِ

অর্থাৎ মাহবূব রোগাক্রান্ত হয়েছেন আমি তাঁকে দেখে নিজেই অসুস্থ হয়ে যাই। মাহবূব আরোগ্য লাভ করেছেন তাঁকে সুস্থ দেখে আমি ভাল হয়ে যাই।

কিন্তু মজনূন লায়লার জীবনী লিখেনি। সাহাবায়ে কেরাম এবং হুজুরের পুত-পবিত্র সহধর্মিনীগণ নিঃসঙ্কোচে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের ভিতরের বাইরের জীবনী সংকলন করে দিয়েছেন। মজনূন দিওয়ানে কায়সে তার বিরহ-বেদনার কাহিনী লিখেছে। কিন্তু লায়লার কোন গুণাগুণ লিখেনি, লায়লার ইতিহাস জগতের সম্মুখে উপস্থাপন করার সাহসও করেনি। মাজনূন জানতো-লায়লা কেবল আমার মাহবূবা, সমগ্র জগতের নয়। তার প্রত্যেকটা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অঙ্গভঙ্গি আমার পছন্দ ভাল হোক বা মন্দ। কিন্তু যদি ওই অঙ্গভঙ্গিগুলো গ্রন্থকারে লিখা হয় তা হলে লাখো মানুষ উপহাস করবে। আমি আমার লায়লার দুর্নাম কেন করব! কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম জানতেন-হুজুর তো জগতের মাহবূব اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا শাহিদ অর্থ মাহবূবও রয়েছে। তাঁর অঙ্গভঙ্গিগুলো যে দেখবে প্রেমিকই হয়ে যাবে। অতএব ওই মহাত্মাগণ হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের জীবনী পৃথিবীবাসীকে বলে যান যে, দেখ, আমাদের পয়গাম্বরের মধ্যে এই সৌন্দর্যাবলী রয়েছে। পড় ও গোলাম হয়ে যাও।

হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম পৃথিবীর এমন সংস্কার করেছেন যার উপমা অন্য কোন মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে পাওয়া যায় না। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে কেবল মিশর ও ফিরআউনের প্রতি তাবলীগ (ধর্মপ্রচার) করার জন্য পাঠানো হয়েছে। তখন তিনি আরজ করলেন: وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ মাওলা! আমার স্বজনবর্গের মধ্য থেকে আমাকে একজন উজির ও সাহায্যকারী দান করুন, আমার জিহ্বা ও অন্তর খুলে দিন। তারপরও বলা হয়েছে: اِنَّنِيْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى আমি তো আপনাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি। এটা তখনই বলা হয়েছে যখন আরজ করেছিলেন: قَالَا رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰى তারা বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশঙ্কা করি যে, আমাদেরকে ত্বরায় শাস্তি দিতে উদ্যত হবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করবে। মোটকথা সব ধরনের সান্ত্বনা ও অভয়বাণী প্রদান করা হয়েছে। বাহুবল হিসাবে ভাইকে প্রদান করা হয়েছে এবং বলে দেয়া হয়েছে ফিরআউনকে ভয় করবেন না, আমি আপনাদের সাথে আছি। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র জগতের জন্য হেদায়ত হিসাবে পাঠিয়েছেন, পার্থিব কোন সাহারা (ভরসা) দান করা হয়নি। কেননা তিনি একমাত্র য়াতীম সন্তান (در يتيم)। জন্মের পূর্বেই তাঁকে য়াতীম করে ফেলা হয়েছে। নিকট আত্মীয় স্বজন যারা ছিল তারাও হয়ে যায় রক্তপিপাসু। আবু জাহল ও আবু লাহাব ছিল ফিরআউন অপেক্ষা ভয়ঙ্কর। ফিরআউন ডুবে যাওয়ার সময় বলেছিল: اٰمَنْتُ بِرَبِّ مُوْسٰى وَ هَارُوْنَ আমি মূসা ও হারূনের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম। কিন্তু আবু জাহল বদর যুদ্ধে মৃত্যু বরণের সময় অসিয়ত করে যায়-আমার মাথা একটু নিচের দিক থেকে কাটবে, যেন প্রতীয়মান হয় যে, এটা কোন সরদারের মাথা। সমগ্র জগতের পথপ্রদর্শন কিন্তু পার্থিব কোন সহায়-সম্বল নেই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এতদসত্ত্বেও মোট ২৩ বছর বরং প্রকৃত পক্ষে দশ বছরের ধর্মপ্রচার জগতের চেহারা পাল্টে দিয়েছে। ধর্মহীনদেরকে ধর্মপরায়ণ, মূর্তিপূজারীদেরকে খোদার ইবাদতগুজার এবং জানি না কাকে কি কি বানিয়ে দিয়েছে। এটা সত্য যে, পাহাড়কে টুকরা টুকরা করা সহজ, সমুদ্রের গতি পাল্টে দেয়া সহজ কিন্তু নষ্ট জাতিকে সঠিক পথে আনা খুবই কঠিন বিশেষতঃ যখন এইরূপ সহায়-সম্বলহীন হয় যা উল্লেখ করা হয়েছে।

আজ কোন মাযহাব তার প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে এমন কোন সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারবে না যার চাইতে অধিক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে বর্তমান না থাকে। যদি পৌত্তলিকরা বলে, রামচন্দ্রের মধ্যে এমন বাহুবল ছিল যে, সে ভারী কামানকে দু'টুকরা করে দিয়েছে। তা হলে আমার মনিবের মধ্যে খোদাপ্রদত্ত সেই শক্তি ছিল যে, আঙ্গুলের ইশারায় পূর্ণ চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দু'টি কামানে পরিণত করেছেন।

পাঁচ. ইসলাম পার্থিব জীবনের এমন সুব্যবস্থা করেছে যে, মাতৃগর্ভে স্থিতিশীল হওয়া থেকে শুরু করে সমাহিত হওয়া পর্যন্ত নয় বরং মৃত্যুর পর সম্পদ বণ্টন করা পর্যন্ত সমস্ত বিধি-বিধান বর্ণনা করেছে। নতুন কোন বিধান তৈরীর প্রয়োজনই আমাদের নেই। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন জীবন পেশ করেছেন যে, ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, সন্তান-সন্ততির অভিভাবক, বীর-বাহাদুর, দয়ালু ও মেহেরবান মোটকথা সর্বস্তরের মানুষের জীবন-যাপন তিনি করেছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নীতিমালা তৈরীর প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু ইসলামের অনুসারীদের জন্য নীতিমালা তৈরীর প্রয়োজন নেই। বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি ও শাসকগোষ্ঠী এই কষ্ট থেকে মুক্ত।

ছয়. অতঃপর নীতিমালা তৈরী কোন আরাম ও শান্তিতে হয়নি বরং তৎক্ষণাৎ এমন নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত কাজে আসবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে মানতে হবে। আজ হিন্দুদের মধ্যে গুঞ্জন চলছে- একাধিক নারী বিবাহ করা উচিৎ। কেননা, নারীদের তুলনায় পুরুষ কম। তারপরও যুদ্ধ ইত্যাদিতে মারা যায়। যদি এক পুরুষ একাধিক স্ত্রী না রাখে তা হলে নারীরা যাবে কোথায়? প্রত্যেক হাতে চারটি আঙ্গুল রয়েছে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি একটা যা পুরুষ। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী রাখতে পারে। কিন্তু নারীর যদি চারজন স্বামী হয় তা হলে লজ্জাহীনতা ছাড়াও শিশুর বংশ থাকবে অজানা এবং শিশুর লেখাপড়া ইত্যাদির দায়িত্বভার কেউ নিবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনুরূপভাবে গোশত খাওয়ার মাসআলা, যদি পশুদের যবাহ করা না হয় তা হলে পশু এতই বেড়ে যাবে যে দেশের সমস্ত উৎপন্ন ফসল তাদের উদরপূর্ণ করতে পারবে না অতঃপর মানুষ কি খাবে। আর দুধও এতই সস্তা হয়ে যাবে যে, দুধের মূল্য দিয়ে তাদের খাদ্যও হবে না। এইজন্য সরকার বেকার কুকুরগুলোকে নিধন করে ফেলে। মোটকথা, ইসলামের বিধান স্বভাবজাত বিধান। অনুরূপভাবে দাড়ি ও খাত্না-দাড়ি দ্বারা চেহারার নূর বৃদ্ধি পায়, আকৃতি কমণীয় হয় এবং এতে যৌনশক্তি বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া গোঁফের লোমগুলোতে বিষাক্ত জীবাণু থাকে। যদি এর সাথে পানি লেগে পেটে যায় তা হলে ক্ষতিকর। খাত্না অনেক রোগের চিকিৎসা। খাত্নাবিহীন পুরুষাঙ্গে ময়লা জমে থাকার কারণে চুলকানি হতে পারে। এতে হস্তমৈথুনের মত রোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তা ছাড়া এতে স্ত্রী যত তৃপ্তি পায় খাত্না বিহীন পুরুষ হতে তা পায় না। এইজন্য ভিন্ন জাতির নারীরা যদি একবার মুসলমানদের বিবাহ বন্ধনে এসে যায় অতঃপর তাদেরই হয়ে যায়। এইজন্য কিতাবী নারীদের সাথে বিবাহ বৈধ। আল্লাহ প্রদত্ত কোন শক্তিকে বাড়ানো দোষ নয়, হ্যাঁ অপাত্রে ব্যয় করা দোষ। সুরমা লাগিয়ে দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ করা দোষ নয়, হ্যাঁ পর নারীকে দেখা অপরাধ। তা ছাড়া হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামকে যবাহ থেকে রক্ষা করা হয়েছিল এবং তার স্মরণে একটি অঙ্গের অতিরিক্ত চর্ম কেটে ফেলার বিধান দেয়া হয়েছে এবং কুরবানী চালু করা হয়েছে।

মোটকথা ইসলামের প্রত্যেক মাসআলায় হাজারো সৌন্দর্য রয়েছে যেগুলো ভিন্ন জাতিরাও স্বীকার করতে বাধ্য। অদ্যাবধি কাফিরগণ আপত্তি করে আসছিল যে, কুরআনে স্থানে স্থানে জিহাদের হুকুম রয়েছে অথচ জিহাদ খুবই খারাপ কাজ। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি যে, সমর জীবন ছাড়া কোন জাতি এক মুহূর্তও সসম্মানে থাকতে পারে না। একটি কূপ হতে একটি ভূমিতে পানি দেয়া হয় কিন্তু গমের সাথে সাথে ঘাস এই পরিমাণ জন্মে যে, তা কেটে ফেলা না হলে গম বাড়তে পারে না। এক ব্যক্তি খাদ্যগ্রহণ করে, খাদ্য থেকে পীত, কফ ইত্যাদি যখন বৃদ্ধি পায় তখন তার চিকিৎসা করা দরকার। যদি হাতের কোন অংশে পচন ধরে যায় তা হলে তা কেটে ফেলা আবশ্যক যেন সংক্রমিত হয়ে গোটা হাতকে নষ্ট না করে।

এই উদাহরণসমূহ থেকে প্রতিভাত হল– খোদাপ্রদত্ত রিযিক গ্রহণকরতঃ এইরূপ কিছু মানুষ ছড়িয়ে পড়ে যাদের অস্তিত্ব সত্য প্রচারের জন্য ক্ষতিকর। তাদের থেকে পৃথিবীকে পবিত্র করা আবশ্যক। এখন তো কাফিরগণও স্বীকার করছে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যে, কঠোরতা অবলম্বন করা না হলে উন্নয়ন হতে পারে না। অনুরূপভাবে ইসলামী দণ্ডগুলো কঠোর, জেল বা জরিমানার দণ্ড ইসলামে নেই। কারণ জেলদণ্ড প্রদানের অবস্থায় বদমাশ গরীব এইজন্য অপরাধ করবে যে, ওখানে রুটি তো পেটভরে পাওয়া যাবে। তা ছাড়া কয়েদীদের আহার ও বস্ত্রের জন্য সরকার জরিমানাও করবে। এতে সরকার অপরাধ কামনা করবে কেননা সেটাও তো আয়ের এটা উৎস। সুতরাং জেল অপরাধ বৃদ্ধির কারণ হবে, অপরাধ বন্ধের নয়। এইজন্য এই রাষ্ট্রগুলোতে চুরি ও অপরাধ বেশী। এই কারণে তাকে হিন্দুস্তান অর্থাৎ চোরের রাজ্য বলা হয়। দেখুন, ইসলামী আইন কানুন দ্বারা অপরাধ কমে যায়। তা ছাড়া ইসলাম অনেক অপরাধের মূলোৎপাটন করেছে অর্থাৎ মদ্যপান হারাম করেছে, মুদ্রা, নারী ও জমির ব্যাপারে অনেক শর্তারোপ করেছে যে, সুদ হারাম এবং পর্দা ফরয কারণ এগুলো অপরাধের মূল। ব্যভিচারের শাস্তি প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড, চুরির শাস্তি নির্ধারণ করেছে হাত কর্তন যেন না থাকে বাঁশ না বাজে বাঁশি। এই বিষয়াবলীতে মনোযোগ দিলে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম নিঃসন্দেহে সত্য দ্বীন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রহিতকরণের বর্ণনা

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত হতে দিলে তা হতে উত্তম কিংবা তার সমতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা বাকারা, আয়াত-১০৬)

এই আয়াতের মধ্যে কতিপয় বিষয় প্রণিধানযোগ্য:

প্রথমতঃ এই আয়াতের শানে নুযূল কি? দ্বিতীয়তঃ নসখ (রহিতকরণ)'র অর্থ কি? এবং নসখ কত প্রকার? তৃতীয়তঃ কিসের নসখ কিসের দ্বারা হয়? চতুর্থতঃ এর উপর কি কি আপত্তি আছে এবং তার জবাব কি? পঞ্চমতঃ নসখের রহস্য (হিকমত) কি?

এক. যখন কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়ার অনুকূলে وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ দ্বারা দলীল উপস্থাপন করল এবং কাফিরদের মধ্যে মোকাবিলার শক্তি হল না তখন তারা অযথা আপত্তি করতঃ সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে শুরু করে। যেমন কুরআন যদি আল্লাহর কিতাব হয় তাতে মাছি ও মাকড়ের মত তুচ্ছ জিনিসের আলোচনা কেন করা হল? এর উত্তর: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا আয়াতে দেয়া হয়েছে। ওই দুর্বল আপত্তিগুলোর মধ্যে একটি আপত্তি ছিল নসখ প্রসঙ্গে যে, খোদার কিতাবের মধ্যে নসখ হওয়া উচিৎ নয়।

মুশরিকগণ আপত্তি করেছে য়াহুদীরা তা সমর্থন করেছে যে, আল্লাহর বাণীর মধ্যে নসখ কিরূপে হয়? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ব্যভিচারী নারীদেরকে কখনো শুধু শাসন করার হুকুম দেন فَاٰذُوْهُمَا কখনো গৃহে অবরুদ্ধ করে রাখার حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ কখনো কশাঘাত করার فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ যদি আল্লাহর বাণী হতো তা হলে প্রথম থেকে ওই বিধান কেন আসেনি যা পরে পাঠানো হয়েছে? মুর্খ মানুষ তার বিধান পরিবর্তন করে থাকে জ্ঞানীলোক নয়। তখন এই আয়াতে করীমা নাযিল হয়েছে।

দুই. نسخ (নসখ)'র আভিধানিক অর্থ হল অপসারণ বা স্থানান্তর করা (রূহুল বয়ান) শরীয়তের পরিভাষায় হুকুমের শেষ মেয়াদকাল বর্ণনা করাকে নসখ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বলে। নস্‌খের তিনটি ধরন রয়েছে। নস্‌খে তিলাওয়াত (তিলাওয়াত রহিতকরণ) ও নসখে তিলাওয়াত ওয়া হুকুম (তিলাওয়াত ও হুকুম উভয়ই রহিতকরণ) প্রথমটির উদাহরণ যেমন اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا এই আয়াতের হুকুম অর্থাৎ ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারীর রাজম (প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড) তো বাকী রয়েছে কিন্তু তিলাওয়াত রহিত। দ্বিতীয়টির উদাহরণ وَصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ এই আয়াতের তিলাওয়াত বাকী কিন্তু হুকুম অর্থাৎ ওফাতের মেয়াদকাল (ইদ্দত) এক বৎসর রহিত। তৃতীয়টির উদাহরণ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একটি আয়াত ছিল عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَّعْلُوْمَاتٍ অর্থাৎ দশ চুমুক দুধে নারী দুধমা হয়। (রূহুল বয়ান) কিন্তু এখন এই আয়াতের না হুকুম রয়েছে না তিলাওয়াত। এক চুমুকেও রযাআত (স্তন্যপান সম্পর্কীয় বিবাহ অবৈধতা) প্রমাণিত হয়। এই প্রকার সমূহের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا আয়াতে।

অতঃপর নস্‌খ তিন প্রকার (১) নস্‌খ ইলাল আসহাল (نسخ الى الاسهل) অর্থাৎ রহিত করে সহজতরের প্রতি নিয়ে যাওয়া (২) নস্‌খ ইলাল আশাক্ক (نسخ الى الاشق) অর্থাৎ রহিত করে কঠিনতরের প্রতি নিয়ে যাওয়া কিন্তু তাতে সওয়াব বেশী (৩) নস্‌খ ইলাল মাসাভী (نسخ الى المساوى) অর্থাৎ রহিত করে সমতুল্যের প্রতি নিয়ে যাওয়া। প্রথমটির উদাহরণ যেমন প্রথমে ওফাতের ইদ্দত ছিল এক বছর তারপর হয়েছে চার মাস দশ দিন। দ্বিতীয়টির উদাহরণ যেমন জিহাদ বর্জন রহিত হয়েছে জিহাদের হুকুম দ্বারা। জিহাদ যদিও কঠিনতর কিন্তু উপকারী। তৃতীয়টির উদাহরণ যেমন বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ফিরে নামাযের মধ্যে কা'বামুখী হওয়া। এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا 'র মধ্যে যে, خير সহজতর ও উপকারী কঠিনতরকে অন্তর্ভুক্ত করে।

তিন. আহকাম ছাড়া অন্য কিছুর নস্‌খ হতে পারে না খবর বা আল্লাহর গুণাবলীর নস্‌খ হতে পারে না। অনুরূপভাবে নস্‌খের চারটি ধরন রয়েছে। কুরআন দ্বারা কুরআন রহিতকরণ (نسخ القران بالقران) হাদীস দ্বারা কুরআন রহিতকরণ (نسخ القران بالحديث) যেমন তা'যীমি সাজদাহ কুরআন দ্বারা প্রমাণিত কিন্তু পরবর্তীতে হাদীস দ্বারা রহিত। হাদীস দ্বারা হাদীস রহিতকরণ (نسخ الحديث بالحديث) যেমন অপরাধীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত কিন্তু পরে হাদীস দ্বারা রহিত। অনুরূপভাবে কুরআন দ্বারা হাদীস রহিত করণ (نسخ الحديث بالقران) যেমন اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ রমযানের রাত্রিবেলা স্ত্রীসহবাস হাদীস

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল কুরআন তা হালাল করেছে। বাকী এটা বলা যে, হাদীস দ্বারা কুরআন করীম কিভাবে রহিত হতে পারে? আল্লাহর হুকুমকে নবী মোস্তফার বাণী খণ্ডন করবে? হাদীসে রয়েছে كَلَامِىْ لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللّٰهِ অনুরূপভাবে কুরআন দ্বারাও হাদীস রহিত হতে পারে না। আল্লাহ তায়া'লা হুজুরের বাণীকে খণ্ডন করবেন কি?

এই উভয় আপত্তি অর্থহীন। কেননা নসখের অর্থ খণ্ডন নয় বরং মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার বর্ণনা। হাদীসে كَلَامِىْ দ্বারা সেই বাণীকে বুঝানো হয়েছে যা হুজুর আলাইহিস্ সালাম নিজের পক্ষ থেকে ফরমাতেন। নচেৎ হাদীসও কালামে ইলাহী (আল্লাহর বাণী)। কুরআনের মধ্যে ভাষাও আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং হাদীসের মধ্যে বিষয় বস্তু আল্লাহর, ভাষা মোস্তফা আলাইহিস্ সালামের। এটাই পার্থক্য কুরআন ও হাদীসে কুদ্‌সী ইত্যাদিতেও। এইজন্য নামাযের মধ্যে হাদীসের তিলাওয়াত জায়েয নেই। হ্যাঁ, হাদীসে গায়রে মুতাওয়াতির দ্বারা কুরআনের নস্‌খ জায়েয নেই কেননা, তা হাদীস হওয়ার ব্যাপারে সংশয় রয়েছে। নিশ্চিত বিষয় সংশয়যুক্ত দ্বারা রহিত হয়না। অতএব হাদীস দ্বারা কুরআনের এবং কুরআন দ্বারা হাদীসের নস্‌খ জায়েয। হ্যাঁ, বিশেষকরণ যা এক প্রকারের নস্‌খ এটা গায়রে মুতাওয়াতির অর্থাৎ হাদীসে মাশহুর দ্বারাও হতে পারে। এইজন্য চারজন নারীকে এক সাথে বিবাহ করা বৈধ কিন্তু সৈয়্যিদুনা আলী হযরত ফাতেমা যাহরা (রা.)'র উপস্থিতিতে দ্বিতীয় বিবাহ বৈধ ছিল না। মৃত্যুর পর সমস্ত মানুষের সম্পদ বণ্টন হয় কিন্তু হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম তা থেকে পৃথক। যে কোন বিষয়ে দু'জন সাক্ষীর প্রয়োজন কিন্তু আবু খোযায়মা আনসারী একজনের সাক্ষী দু'জনের সমতুল্য। এগুলো বিশেষত্ব।

চার. নসখের মাসআলায় অজ্ঞ লোকেরা কিছু সংশয় পোষণ করে। প্রথমতঃ আল্লাহর বাণীতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না। কুরআন বলছে: مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ (আমার কথার রদবদল হয় না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার করি না)। আর নস্‌খও তো রদবদল। এইজন্য উসূলবিদ্‌গণ তাকে বয়ানে তাবদীল (بيان تبديل) বলেন। তা ছাড়া ইরশাদ হচ্ছে: لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا (এই কুরআন যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো হতো তবে তারা ওতে অনেক অসঙ্গতি পেতো)। নস্‌খও এক প্রকার অসঙ্গতি। সুতরাং নস্‌খ বাতিল। রহিত হওয়া এরই আলামত যে, এটা আল্লাহ তায়া'লার কালাম নয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এর জবাব স্পষ্ট যে, হুকুমের মেয়াদকাল বর্ণনা করাকে নস্‌খ বলা হয়। যেহেতু এরপর পরবর্তী সময়ের জন্য অন্য হুকুম চালু হচ্ছে। এইজন্য তাকে বয়ান তো বলে কিন্তু বয়ানে তাবদীল। আর আয়াতের মধ্যে রয়েছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অস্বীকৃতি। অর্থাৎ এটা সম্ভব নয় যে, সৎকর্মপরায়ণদের সাথে ওয়াদা ভাল করা হবে কিন্তু প্রদান করা হবে না। এইজন্য ফরমায়েছেন: وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ তা ছাড়া নস্‌খ ইখতিলাফ (অসঙ্গতি) নয় বরং প্রথম হুকুমের বর্ণনা। তাকে ইখতিলাফে অন্তর্ভুক্ত মনে করা ভুল। কারণ ইখতিলাফ দ্বারা ঘটনার বিপরীত তথ্য প্রদানকে বুঝানো হয় অথবা কালামে ইলাহীর ফাসাহত (সাবলীলতা) ও বালাগত (ভাষার অলঙ্কার) একরূপ না হওয়া। যেমন মানুষের কথা কিছু উন্নত মানের এবং কিছু নিম্নমানের হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহর এই কালাম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক রূপই ফসীহ। মোট কথা, কুরআন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও ভুল সংবাদ প্রদান থেকে পবিত্র। তা ছাড়া কুরআন একই রূপ ফসাহত ও বালাগতপূর্ণ। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল এই যে, নস্‌খ বক্তার অজ্ঞতা বা অক্ষমতা প্রমাণ করে। যদি তাঁর জানা থাকতো–এই হুকুম সর্বদা কাজ দিবে না তা হলে প্রথম থেকেই সেই হুকুম চালু করতেন যা পরে দিয়েছেন। অথবা প্রথম হুকুম তাঁর কুদরতে সর্বদা চালু রাখতেন। এটা কি কখনো একটা কখনো আরেকটা? এর উত্তর হল এই যে, কালের ভিন্নতা ভিন্ন ভিন্ন আহকামকে চায়। কামিল হাকীম তিনিই যিনি যুগের প্রয়োজন অনুপাতে আহকাম (বিধানাবলী) প্রেরণ করেন। একজন ডাক্তার তার রোগীকে চিকিৎসাকালে বিভিন্ন ওষুধ পরিবর্তন করে প্রয়োগ করে। যতই রোগীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে ডাক্তারের ওষুধ নির্বাচনও পরিবর্তন হয়। এই চিকিৎসার পরিবর্তন ডাক্তারের জ্ঞানেরই দলীল, অজ্ঞতার নয়। অতঃপর যখন রোগী সুস্থ হয়ে উঠে তখন একটি প্যাটেন্ট ওষুধ নির্বাচন করে যে, এখন থেকে সর্বদা এটাই খাবে, আর কোন পরিবর্তন হবে না। তেমনিভাবে পূর্বের দ্বীন এবং স্বয়ং কুরআনেরও প্রাথমিক আহকাম পরিবর্তন হতে থাকে। পরে কিয়ামত অবধির জন্য প্যাটেন্ট জীবনব্যবস্থা অর্থাৎ কুরআন দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তায়া'লার জানা ছিল যে, শিশু যুবক ও মধ্যবয়সী হয়ে অবশেষে বৃদ্ধ হবে এবং শেষে তার খাদ্য এই হবে। কিন্তু সৃষ্টি করা হয়েছে ছোট্ট শিশু এবং খাদ্যও খুব নরম। অথচ তাঁর শক্তি ছিল যে, তাকে বৃদ্ধই সৃষ্টি করবেন। তখন তো মায়ের বারোটা বেজে যেতো। যেমনিভাবে পৃথিবীর প্রত্যেক কিছু পরিবর্তন হতে হতে অবশেষে তার পূর্ণতায় পৌঁছে আর পরিবর্তন হয় না। দেখুন, মানবদেহ,বৃক্ষ ইত্যাদিকে। তেমনিভাবে আল্লাহর দ্বীনও পরিবর্তন হতে হতে যখন পূর্ণতায় এসে গেল তখন নসখের ধারা শেষ হয়ে গেল। اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

لَكُمْ دِيْنَكُمْ (আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম) এবং খতমে নবুওয়াতের কারণও এটাই যে, পৃথিবীতে অস্থায়ীভাবে স্থান-কাল ভেদে পয়গাম্বর আসতে থাকেন। অবশেষে ইসলামের পয়গাম্বর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম তশরীফ আনেন যা মূল উদ্দেশ্য।

তৃতীয় আপত্তি হল এই যে, কুরআন করীম বলছে مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ অর্থাৎ হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহর কিতাবসমূহের সত্যায়ন করেন। সত্যায়ন করা ও নসখের মধ্যে রয়েছে বৈপরীত্য। তা ছাড়া হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম পৃথিবীতে আগমন করতঃ জিয়্য়া (কর) রহিত করবেন, শুকর হত্যা করবেন। ইসলাম যখন রহিত হওয়ার যোগ্য নয় এই রহিত করণ কেন হবে? তা ছাড়া ফারুকী শাসনামলে যাকাতের ব্যয়খাত থেকে مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْب (যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হতো) কে কেন রহিত করা হয়েছে? এটাও اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ এর বিরুদ্ধ।

এর উত্তর হল এই যে, সত্যায়ন (تصديق) ও রহিতকরণ (تنسيخ) এর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। সত্যায়ন এরই হয়েছে যে, বাস্তবিকই এগুলো খোদা প্রদত্ত কিতাব এবং স্ব স্ব যুগে আমলের যোগ্য ছিল। কিন্তু এখন সূর্যের উপস্থিতিতে এই বাতি ও লাইটগুলোর প্রয়োজন নেই। যখন ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র পরিবর্তন করে তখন তার পূর্বের ব্যবস্থাপত্রকে ভুল বলে না। সেটাকে সত্যায়ন করতঃ বলে, এখন তা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। مصدقا এর দ্বিতীয় অর্থ এও রয়েছে যে, ওই কিতাবসমূহে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের শুভাগমনের সংবাদ দেয়া হয়েছে: وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ যদি হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের শুভাগমন না হতো তা হলে ওই সংবাদ ভুল প্রমাণিত হতো। অতএব হুজুরের শুভাগমন ওই কিতাবসমূহের সত্যায়ন।

হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম জিয়্য়াকে রহিত করবেন না। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই তার সময়সীমা বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, জিয়্য়ার হুকুম ঈসা আলাইহিস্ সালামের আগমন পর্যন্ত থাকবে। হুকুম তো হুজুরের তা বাস্তবায়ন করবেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম। যেমন পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের কতেক বিধান যা কুরআন ও হাদীসে কাহিনী হিসেবে উল্লেখিত হয়ে আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় হয়েছে। যেমন وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الاية (তাদের জন্য তাওরাতে আমি বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ) এই বিধানাবলীর উপর আমাদের আমল কেবল এইজন্য যে, আমাদের নবী এগুলো উল্লেখ করেছেন; এই জন্য নয় যে, তাওরাত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

ইত্যাদির বিধানাবলী আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয়। অনুরূপভাবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অবতীর্ণ হওয়াতে হুজুর আলাইহিস সালাম জিয্য়ার হুকুম শেষ করেছেন।

ফারুকী শাসনামলে মুআল্লাফাতুল কুলূবের কারণ (علت) চলে যাওয়ার ফলে তাদেরকে (যাকাতের ব্যয়খাত থেকে) পৃথক করা হয়েছে। তাকে নস্‌খ বলা হয় না। কারণ ছিল নওমুসলিমদের দুর্বলতা। একটি বস্ত্র নাপাক আমরা বলি, তা দিয়ে নামায হতে পারে না। যখন পাক করে দেয়া হল হুকুম বদলে গেল, এখন তা দিয়ে নামায জায়েয হবে। এ তো নস্‌খ নয় বরং ইল্লত চলে যাওয়ার ফলে হুকুম চলে গেল। নচেৎ কিয়াস ও ইজমা দ্বারা কুরআন বা সুন্নাহর নস্‌খ জায়েয নেই। যেমন তাফসীরাতে আহমদিয়াতে উল্লেখ রয়েছে।

পাঁচ. নসখের মধ্যে অনেক রহস্য রয়েছে। কিছু তো উপরের আলোচনা থেকে জানা গেল আর কিছু নিম্নে বর্ণনা করা হল: রহিত বিধান সৃষ্টির প্রয়োজনে সাময়িকভাবে চালু করা হয়েছিল পরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যেমন হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের শরীয়তে ভাইয়ের সাথে বোনের বিবাহ জায়েয ছিল, যদি এক সাথে জন্ম না নেয়। কেননা এ ছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল না। নারীরা কোত্থেকে আসবে? হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামের শরীয়ত দ্বারা এই হুকুম রহিত হয়েছে। কোন কোন সময় এইজন্য হয়ে থাকে যে, প্রথম হুকুম মানুষের স্বভাবে গেড়ে বসেছে, হঠাৎ বর্জন করা কষ্টসাধ্য হবে। তাতে অনেক পরিবর্তন করতঃ পরবর্তীতে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যেমন মদের নিষেধ, প্রথমে তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়েছে তারপর নেশাবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর সম্পূর্ণ হারাম করে দেয়া হয়েছে। প্রথম থেকেই সম্পূর্ণ নিষেধ করলে কষ্টসাধ্য হতো। হঠাৎ মদ্যপান ত্যাগ করা তাদের জন্য কঠিন ব্যাপার ছিল। অনুরূপভাবে রোযা যদি হঠাৎ ফরয হতো তা হলে কষ্টসাধ্য হতো। সুতরাং প্রথমে আশুরার কেবল একটি রোযা ফরয হয়েছে। তার পর প্রত্যেক মাসে তিনটি তারপর রমযান মাসের রোযা কিন্তু ফিদ্য়া (একদিনের রোযার পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে দু'বেলার খাদ্য দান করা)'র অবকাশ ছিল। অতঃপর ফিদ্য়ার বিধান বন্ধ হল কিন্তু সাহরী খাওয়া নাজায়েয ছিল। তারপর সাহরী হালাল হল কিন্তু রমযানের রাত্রিবেলায় স্ত্রীসহবাস হারাম। অতঃপর এই অবস্থায় এসেছে যেটা বর্তমানে আছে। যদি রোযার সমুদয় বিধান হঠাৎ আসতো তা হলে মানুষের জন্য কঠিন হতো। কোন কোন সময় মাহবূবের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য নসখ হয়ে থাকে। যেমন মি'রাজে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের পরিবর্তে পাঁচওয়াক্ত হয়েছে। যদি প্রথম থেকেই পাঁচ ওয়াক্ত হতো তা

হলে এতে না হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের অবদান অনুভূত হতো না হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের মাহাত্ম্যের। এখন প্রতীয়মান হল-হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের সেই মাহাত্ম্য রয়েছে যে, আবেদনের প্রেক্ষিতে খোদার ইবাদতের মধ্যেও পরিবর্তন হয়ে যায়। অনুরূপভাবে কিবলা পরিবর্তন যদি প্রথম থেকেই কা'বা কিবলা হতো তা হলে হুজুর আলাইহিস্ সালামের সেই মাহাত্ম্য প্রতিভাত হতো না যা এখন হয়েছে যে, মাহবূবের সন্তুষ্টির জন্যই কা'বা কিবলা হয়েছে। قِبْلَةً تَرْضَاهَا

নস্‌খের জন্য রহিত হুকুমের উপর আমল জরুরী নয় এবং উম্মতের জানাও আবশ্যক নয়। কেবল হুজুরের জানাই যথেষ্ট। এইজন্য পঞ্চাশ ওয়াক্তের উপর না কেউ আমল করেছে, না উম্মত জানতে পেরেছে। রহিত হয়ে পাঁচ ওয়াক্তই রয়ে যায় এবং এই পাঁচ ওয়াক্তই আমলে আসে।

কোন কোন সময় রহিতকারী (ناسخ)'র শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর জন্য نسخ হয়ে থাকে। যেমন প্রথম থেকে যদি পৃথিবীতে ইসলাম চলে আসতো তা হলে তার নিয়ম কানূনের পূর্ণাঙ্গতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হতো না। জগদ্বাসী যখন অন্যান্য নিয়ম-কানূন দেখে ইসলামী নিয়ম-কানূন দেখেছে এখন اَلْاَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِاَضْدَادِهَا (বস্তুসমূহকে তার বিপরীত বস্তু দ্বারা পরিচয় করা যায়) অনুযায়ী তার গুরুত্ব প্রকাশিত হয়েছে। এই কারণে আল্লাহ্ তায়া'লা বিপরীত বস্তু সৃষ্টি করেছেন যেন রাত্রি দ্বারা দিনের, রোগ দ্বারা স্বাস্থ্যের, ক্ষুধা দ্বারা পরিতৃপ্তির গুরুত্ব জানা যায়।

কোন কোন সময় নসখের কারণ এও হয়ে থাকে যে, প্রত্যেক কিছু তার মূলে পৌঁছে শেষ ও রহিত হয়ে যায়। মূল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাবস্থায় অস্থির ও ব্যাকুল থাকে। মানুষ তার দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অস্থির থাকে কিন্তু দেশে পৌঁছে শান্ত হয়ে যায়। সমস্ত নদ-নদী সাগরের দিকে এত জোরে প্রবাহিত হচ্ছে যে, পথের মধ্যে যে কিছুই তাদেরকে এই যাত্রায় বাধা দেয় তাকে উপড়ে ফেলে। স্বশব্দে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যখনই সাগরে পৌঁছল ওই শব্দ ও গতি শেষ হয়ে গেল। সাগরে পৌঁছে নিজকে হারিয়ে ফেলল এবং নীরবে ঘোষণা করল, তুমি এবং আমি পৃথক কোন সত্তা নই। অবশেষে এটা কেন? কেবল এইজন্য যে, নদী সাগর থেকে সৃষ্ট। এখান থেকে বাষ্প হয়ে মেঘ জমেছে তা পাহাড়-পর্বতে বরফ বা বৃষ্টি আকারে পড়েছে এবং তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে নদী। নদী তার মূলের দিকে প্রবাহিত এবং তাকে পেয়ে নিজকে বিলীন করে দিল।

অনুরূপভাবে হাদীসে রয়েছে اَللهُ مُعْطِىْ وَاَنَا قَاسِمٌ (আল্লাহ্ দানকারী এবং আমি বিতরণকারী) আরো ইরশাদ হয়েছে: كُلُّ الْخَلَائِقِ مِنْ نُوْرِىْ (সমস্ত সৃষ্টি

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমার নূর হতে সৃজিত) নবুওয়াতের সাগর যা'তে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সকল নবুওয়াত ওদিকে প্রবাহিত হয়ে আসছিল। ফিরআওনী শক্তি ও নমরূদী শক্তি নবুওয়াতে ইবরাহিমী ও নবুওয়াতে মূসাভীর গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে এবং খান খান হয়ে যায় কিন্তু নবুওয়াতে মোস্তফায় পৌছে সবাই হারিয়ে যান।

জরুরী জ্ঞাতব্য: নসখ বান্দাদের হিসেবে তাবদীল এবং আল্লাহর ইলম হিসেবে মেয়াদকালের বর্ণনা। এইজন্য তাকে বলা হয় বয়ানে তাবদীল অর্থাৎ বর্ণনাও এবং তাবদীলও। لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, আমার নিকট তাবদীল (পরিবর্তন) হবে না। কেননা খোদার নিকট বয়ান (বর্ণনা) আছে, তাবদীল নেই।

স্মর্তব্য যে, পৃথিবীর প্রত্যেক কিছুতে নসখ ও তাবদীল রয়েছে। রাত্রি দ্বারা দিন রহিত হয় এবং দিন দ্বারা রাত্রি রহিত। অনুরূপভাবে যৌবন দ্বারা শৈশব, বার্ধক্য দ্বারা যৌবন, মৃত্যু দ্বারা জীবন, রোগ দ্বারা স্বাস্থ্য, অস্বচ্ছলতা দ্বারা স্বচ্ছলতা রহিত হতে থাকে।

সুফীগণের নিকট ত্বরীকত পথের যাত্রীদেরকেও নসখের সম্মুখীন হতে হয়। সালিকের (আধ্যাত্মিক পথচারী) অবস্থাদির পরিবর্তন হতে থাকে। কোন কোন সময় তাদের জন্য উচ্চস্বরে যিকর (ذکر بالجهر) সংগতিপূর্ণ, কোন কোন সময় গোপনে যিকর (ذکر الخفی) উত্তম। কোন কোন সময় নীরব সাধনা (چله کشی) ও নির্জনবাসে লিপ্ত, কোন কোন সময় ধর্ম প্রচার ও গুণাবলীর প্রকাশে ব্যস্ত। হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম হেরা গুহায় ছয় মাস নীরব সাধনা করেছেন, এও ছিল এক অবস্থা। আবার কখনো সাফা পর্বতে নবুওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছেন, এও ছিল এক অবস্থা। কখনো সহধর্মিণীদের সাথে মেলামেশা আবার কখনো হযরত জিবরীলেরও উপস্থিতির সাহস হতো না।

اگر درویش بر حالے بماندے   دو دست از ہر دو عالم بر فشاندے

যদি দরবেশ (সর্বদা) এক অবস্থায় থেকে যায় তাহলে দু'জাহান থেকে তাদের হস্তদ্বয় গুটে নেয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের জীবন

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! আমি আপনার কাল পূর্ণ করছি এবং আমার নিকট আপনাকে তুলে নিচ্ছি এবং যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের মধ্য হতে আপনাকে মুক্ত করছি। আর আপনার অনুসারীগণকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিচ্ছি। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৫৫)

এই আয়াতে করীমায় কতিপয় বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের কোন্ ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে? দ্বিতীয়তঃ কতেক আম্বিয়ায়ে কেরামের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী কুরআন করীম কেন বর্ণনা করেছে? হয়ত সকলের ঘটনাবলী বর্ণনা করা হতো অথবা কারোরই না হতো! তৃতীয়তঃ এখানে কোন্ কোন্ দলের কি কি আপত্তি রয়েছে এবং তার জবাব কি?

এক. ইতোপূর্বে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের পূত পবিত্র জননী হযরত মারয়াম (রা.)'র জন্মগ্রহণের আলোচনা ছিল। এখানে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের বিরুদ্ধে য়াহুদীদের হত্যার ষড়যন্ত্র এবং তাঁকে আল্লাহ পাকের নিরাপত্তা দানের আলোচনা রয়েছে। এখানে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে চারটি–ওফাত, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে তুলে নেয়া, কাফিরদের মধ্য হতে নিরাপদ রাখা এবং তাঁর অনুসারীগণকে কাফিরদের উপর প্রাধান্য দেয়া।

যখন য়াহুদীরা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের মো'জেযাসমূহ দেখে নিশ্চিত হল যে, ইনিই সেই পয়গাম্বর যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তাওরাতে, তখন তাদের দ্বীনে মূসাভী রহিত হওয়া এবং তাদের কর্তৃত্ব চলে যাওয়ার ভয়ে তাঁর অনিষ্ট সাধনে লেগে যায় এবং তাঁকে ও তাঁর পূত পবিত্র মহিয়সী আম্মাকে জনসমক্ষে গালি দেয়া ও দুর্নাম করার পদ্ধতি অবলম্বন করে। হযরত ঈসা অত্যন্ত ধৈর্যধারণ করলেন। কিন্তু اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ الْحَلِيْمِ (আমি ধৈর্যশীলের রাগ থেকে আল্লাহর পানাহ চাই) ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় তিনি বদদোয়া করলেন। ফলে সকল বেআদব শুকর ও বানরে পরিণত হয়। এরপর কিছু য়াহুদীরা তখনকার বাদশাহকে খবর দিয়ে বলল, যদি কোন সময় তিনি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আপনার জন্য বদদোয়া করেন তবে আপনিও ধ্বংস হয়ে যাবেন। এইজন্য তাঁকে শহীদ করে দেয়াই উত্তম। অতএব একজন মুনাফিক কৌশলে হত্যা করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

তার নাম ছিল ত্বিত্বয়ানূস। একদা সে সুযোগ পেয়ে ওই গৃহে গমন করতঃ হত্যার সংকল্প করে যেখানে তিনি অবস্থান করতেন। কিন্তু দেখতে পায় তিনি ছাদ ফেটে আসমানে চলে যাচ্ছেন এবং সে দেখতে থাকে। ফিরে আসার সময় তার আকৃতি হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের মতই হয়ে যায়। তাকে (ঈসা আলাইহিস্ সালাম মনে করে) ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। (দেখুন, রূহুল বয়ান)

এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ গুণ যে, তাঁর সদৃশ আকৃতি কেউ ধারণ করতে পারে না। নচেৎ মানুষ হযরত সোলায়মান আলাইহিস্ সালাম ও হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের সদৃশ আকৃতি ধারণ করেছে। তবে শয়তান তার আওয়াজকে হুজুরের আওয়াজ সদৃশ করতে পারে। যেমন শয়তান সূরা নাজমকে হুজুরের মত পড়ে দিয়েছিল যার প্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয়েছে: اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ কিন্তু যখন কিছু আকাঙ্ক্ষা করে তখন শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করে। (তাফসীরের সাধারণ গ্রন্থাবলী)।

দুই. যে সমস্ত নবীর জন্ম ইত্যাদিতে কিছু বিস্ময়কর বিষয় ছিল তাঁদের কাহিনী বর্ণনা করেছে কুরআন। যেমন হযরত ইবরাহীম হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আলাইহিমুস সালাম। তা ছাড়া ওই ঘটনাগুলোকে বিরোধিতাকারীরা মন্দভাবে এবং ভক্তরা অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করতে শুরু করে এবং যা থেকে ভুল সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। যেমন য়াহুদীরা মাআযাল্লাহ হযরত বাতূল মারয়ামের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে এবং খ্রিষ্টান সম্প্রদায় তাঁকে খোদার স্ত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছে। সুতরাং তাঁদের মূল ঘটনাবলী সীমালঙ্ঘন ও সীমাহ্রাস ব্যতিরেকে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল। যাতে ভুল ধারণার অবসান হয়। ভুল ধারণার অবসান ঘটিয়ে মানুষকে সোজা পথে আনা ইসলামের কাজ। হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের পবিত্র জন্মগ্রহণে, স্তন্যপানে এমনকি স্বয়ং হযরত আমেনা খাতূনের বিবাহে অনেক আশ্চর্য ও অদ্ভুত ঘটনাবলী রয়েছে। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম শৈশবে কথা বলেছেন হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম জন্মগ্রহণ করতেই সাজদা করতঃ ফরমায়েছেন رَبِّ هَبْ لِيْ اُمَّتِيْ প্রসব বেদনার সময় হযরত মারয়ামের সাহায্য করেছেন হযরত জিবরীল আলাইহিস্ সালাম। ওই সময়ে হযরত আমেনা খাতূনের খেদমতে হাজির হয়েছেন স্বয়ং হযরত মারয়াম, হযরত আ'সিয়া ও বেহেশতী হুরগণ। হযরত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমেনার গৃহকে সাজদা করেছে খানায়ে কা'বা। হুজুরের বরকতে হযরত হালীমার খচ্চর হালীমাকে উত্তর দিয়েছে যে, আমার উপর রয়েছেন খাতমুল মুরসালীন (শেষনবী)। এটা তাঁরই শক্তি যে, আমার গতি দ্রুত হয়েছে। (মাদারিজ ও মাওয়াহিব)

কিন্তু এই ঘটনাবলী কুরআন বর্ণনা করেনি কারণ আল্লাহর জ্ঞানে এসেছিল যে, কুরআনের ন্যায় মাহবূবের সমুদয় ঘটনাবলী কোন কাট ছাট ছাড়াই পৃথিবীতে সংরক্ষিত থাকবে। ওতে য়াহুদীদের ন্যায় পরিবর্তন হবে না। তা ছাড়া ওই ঘটনাবলী থেকে কোন সম্প্রদায় এমন ভুল সিদ্ধান্ত বের করবে না যেমন পূর্ববর্তী নবীগণের ঘটনাবলী থেকে হযরত ঈসার ইলাহ হওয়ার সিদ্ধান্ত বের করেছে খ্রিষ্টান সম্প্রদায় এবং য়াহুদীরা নবুওয়াত অস্বীকারের। তা ছাড়া কুরআন পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাঁদের উম্মতগণের অবস্থাদি বর্ণনা করেছে। কুরআনের পর কোন কিতাব আসবে না এই জন্য তাদের ঘটনাবলী কোন্ কিতাবে বর্ণনা করবে? খোদার পরম অনুগ্রহ যে, আমরা শেষ উম্মত। নচেৎ আমাদের অপকর্মগুলো পূর্ববর্তী উম্মতদের ন্যায় পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হয়ে যেতো। আমাদের সর্বশেষ উম্মত হওয়াটাই আমাদের দোষ গোপনের কারণ হয়েছে।

তিন. এই আয়াতে করীমা থেকে দু'টি সম্প্রদায় আপত্তি করে। কাদিয়ানী ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়। কাদিয়ানীরা বলে, এ থেকে প্রতীয়মান হল- হযরত ঈসা ওফাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। কেননা কুরআনের ধারাবাহিকতায় ওফাতের উল্লেখ প্রথমে রয়েছে এবং তুলে নেয়ার কথা পরে- مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ সুতরাং অর্থ হল- আমি আপনাকে ওফাত দান করব অতঃপর রূহানীভাবে তুলে নেব।

খ্রিষ্টানরা বলে, কুরআন ফরমায়েছে, হযরত ঈসার অনুসারীগণ কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর বিজয়ী থাকবে। দেখ, আমরাই শাসনকর্তা এবং মুসলমান শাসিত।

জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, বৃটেন ইত্যাদি শক্তিধর দেশের সরকার খ্রিষ্টান। যা থেকে প্রতীয়মান হল-মুসলমান কাফির এবং খ্রিষ্টানগণই ঈসা আলাইহিস্ সালামের প্রকৃত অনুসারী। কুরআনের ওয়াদা আমাদের জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে। প্রথমটার উত্তর বিভিন্ন ধরনের রয়েছে। প্রথমতঃ যদি ধরে নেয়া হয় যে, مُتَوَفِّيْكَ'র অর্থ মৃত্যু দান করা তবেও وَاو ধারাবাহিকতাকে চায় না, কেবল একত্রিতকরণকে চায়। দেখুন, কুরআনে রয়েছে وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ (সাজদা কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর) অথচ রুকু সাজদার আগে। আরো ফরমায়েছেন: خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ (তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন) অথচ মৃত্যু হল জীবনের পরে। কেননা, জীবনাবসানের নামই তো

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মৃত্যু। আরো ফরমায়েছেন: خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ (তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমার পূর্ববর্তীগণকে) আরো ফরমায়েছেন: وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ الاية (অবশ্য প্রত্যাদেশ করা হয়েছে আপনারপ্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি) এই সমুদয় আয়াতে ধারাবাহিকতা পরিবর্তিত হয়েছে। দেখুন, পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি ওহী প্রথমে এসেছে কিন্তু আয়াতে তাঁদের উল্লেখ পরে হয়েছে। তা ছাড়া আয়াতের অর্থ যদি সেটাই হয় যা কাদিয়ানীরা বলছে যে, আপনাকে ওফাত দিয়ে আপনার রূহ তুলে নেব তবে এতে হযরত ঈসার বিশেষত্ব কি রইল? সবার রূহ তো মৃত্যুর পর আসমানের দিকে চলে যায়। অথচ এটা প্রশংসার স্থান এবং হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, য়াহূদীরা তাদের অপবিত্র সংকল্পে ব্যর্থ হবে। তদুপরি আয়াতে চারটি স্থানে كَ'র সম্বোধন রয়েছে – مُطَهِّرُكَ اتَّبَعُوْكَ ও مُتَوَفِّيْكَ, তিনটি স্থানে কাফ্ দ্বারা যা'তে মসীহ (হযরত ঈসার সত্তা)কে বুঝানো এবং মধ্যখানের একটি স্থানে (رَافِعُكَ দ্বারা) তাঁর রূহকে বুঝানো হওয়া ফাসাহাত বিরুদ্ধ। তা ছাড়া মসীহ দ্বারা দেহ ও রূহ উভয়কে বুঝানো হয় এবং তিনিই সম্বোধিত। সুতরাং হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের সত্তা যাকে সম্বোধন করা হয়েছে, সেই সত্তাকেই তুলে নেয়া হয়েছে।

اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ এর মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হে ঈসা! আমি আপনাকে হত্যা বা ক্রুশের মাধ্যম ব্যতিরেকে ওফাত দান করব। এইজন্য ওফাতদানকে নিজের প্রতি সম্বন্ধ করেছেন। নচেৎ সবাইকে আল্লাহই মৃত্যুদান করেন। এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখনো আপনার বয়স বাকী রয়েছে আপনাকে হত্যা করা সম্ভব নয়। আমি আপনার অবশিষ্ট বয়স পূর্ণ করার পরই ওফাত দান করব, এখন তুলে নিচ্ছি।

এই সকল আলোচনা তখনই যখন আমরা স্বীকার করে নিই যে, তাওয়াফ্ফা (توفى) দ্বারা মৃত্যুদানকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাওয়াফ্ফা'র অর্থ اَخْذُ الشَّىْءِ وَافِيًا অর্থাৎ, কোন বস্তুকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করা। এইজন্য বলা হয় وفائے عهد ওয়াদা পূরণ করা। মৃত্যুকে ওফাত এইজন্য বলা হয় যে, এ দ্বারা জীবনের দিনগুলো পূর্ণ হয়ে যায়। যদি বলা হয় যে, 'তাওয়াফ্ফা' দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে তা হলে তার প্রতি নির্দেশক কিছু (قرينه)'র প্রয়োজন হবে। কারণ এটা রূপক (مجازى) অর্থ। কুরআন করীমে, তাওয়াফ্ফা শব্দটি নিদ্রা ও পূর্ণরূপে গ্রহণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ – يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ ইত্যাদি। এখন অর্থ হল– হে ঈসা! আল্লাহ আপনাকে পরিপূর্ণরূপে নিবেন এবং তাঁর নিকট তুলে নিবেন। رَافِعُكَ দ্বারা বলে দেয়া হয়েছে যে,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অপরাপর লোকদের মত এটা হবে না যে, শরীর তো পৃথিবীতে রেখে দেয়া হবে, কেবল রূহকে তুলে নেয়া হবে। বরং مُتَوَفِّيْكَ আপনার জীবনকাল পূর্ণ করবই। তাফসীরে কবীর ২য় খণ্ড ৬৮৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

وَذُكِرَ هٰذَا الْكَلَامُ لِيَدُلَّ عَلٰى اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ رُفِعَ اِلَى السَّمَاءِ بِتَمَامِهٖ بِرُوْحِهٖ وَ جَسَدِهٖ.

অর্থাৎ এই বাক্যটি উল্লেখ করা হয়েছে যেন এই কথা বোঝায় যে, তাঁকে দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে সশরীরে আসমানে তুলে নেয়া হয়েছে। তা ছাড়া তাওয়াফ্ফা একটা জিন্স, যার তিনটি প্রকার রয়েছে। প্রথমতঃ রূহ কবজ করতঃ ফেরত প্রদান করা। দ্বিতীয়তঃ রূহ কবজ করতঃ আবদ্ধ করে ফেলা। তৃতীয়তঃ শরীরকে আসমানে তুলে নেয়া। প্রথমটাকে নিদ্রা, দ্বিতীয়টাকে মৃত্যু তৃতীয়টাকে রফয়ে জিসমানী বলা হয় এবং তৃতীয়টাকে নির্ধারণ করার নিমিত্তে رَافِعُكَ বৃদ্ধি করা হয়েছে। (তাফসীরে কবীর) এই দ্বিতীয় তাফসীরই উত্তম ও অধিক সঙ্গতিপূর্ণ, অনেক আয়াত ও শত শত হাদীস এটাকে জোরদার করে।

কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ এর মধ্যে مَوْتِهٖ এর সর্বনাম দ্বারা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে বুঝানো হয়েছে। অর্থ হল এই–সমস্ত আহলে কিতাব হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে আর এটা কিয়ামতের পূর্বক্ষণে হবে। যদি مَوْتِهٖ এর সর্বনাম দ্বারা আহলে কিতাবকে বুঝানো হয় তা হলে মৃত্যুকালীন ঈমান গ্রহণযোগ্য নয় তার উল্লেখ অর্থহীন। দেখুন وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ আয়াতে। আরো ইরশাদ হচ্ছে: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا যেমনিভাবে দোলনায় কথা বলা ঈসা আলাইহিস্ সালামের একটি মো'জেযা হয়েছে তেমনিভাবে বার্ধক্যে কথা বলাও মো'জেযা স্বরূপ হওয়া চাই। তা এইভাবেই হতে পারে যে, তিনি আসমান হতে অবতীর্ণ হয়ে কথা বলবেন। নচেৎ সকল মানুষই তো বার্ধক্যে কথা বলেন, এখানে প্রশংসার স্থানে কেন উল্লেখ করা হল? মোটকথা, কাদিয়ানী তাফসীর কেবল ধর্মহীনতা ও খোদাদ্রোহিতা। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন বরকে আসমানী বর খিরমনে কাদিয়ানী ইত্যাদি এবং আমাদের তাফসীরে নঈমী ৩য় খণ্ড।

তা ছাড়া এখানে رفع দ্বারা পদ মর্যাদাকে উন্নত করা বুঝানো হয়েছে বলে উল্লেখ করা য়াহূদীদের বিকৃত ব্যাখ্যা। কেননা যখন رفعএর কর্ম (مفعول) পৃথিবীর জড়পদার্থ হবে তখন শরীরকে তুলে নেয়াই বুঝানো হয়। যেমন: رَفَعَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَمَا এবং وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ কুরআন করীমে রয়েছে اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ যদি এখানে رفع দ্বারা রূহ অথবা পদমর্যাদাকে উন্নত করা বুঝানো হয় তবে 'ক্বতল' (হত্যা)'র বিপরীত হবে না অথচ بل তার পরবর্তী বিষয় পূর্ববর্তী বিষয়ের বিপরীত হওয়াকে চায়, ক্বতল ফি সাবীলিল্লাহ (আল্লাহর পথে নিহত হওয়া) ও তো পদমর্যাদা বৃদ্ধির কারণ, পরিপন্থী নয়। কারণ শাহাদত দ্বারা মর্যাদা বুলন্দ হয়।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ এবং ان ترفع فيها اسمه এর মধ্যে কর্ম পৃথিবীর জড় পদার্থ নয়। وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ এর মধ্যে নির্মাণের আলোচনা রয়েছে যা নির্মাণ উচ্চ করাকে চায়। হাদীসে রয়েছে: ثُمَّ رُفِعْتُ اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى এখানেও রয়েছে রফফে জিসমানী, রূহানী কিংবা মর্যাদার উন্নতি নয়। তা ছাড়া بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ এর মধ্যে রয়েছে 'কসরে কলব' এতে শর্ত হল উভয় গুণ বিপরীতমুখী হওয়া। এখানে ক্বতল ফী সাবীলিল্লাহ ও মর্যাদার উন্নতি পরস্পর বিপরীতমুখী নয়। মোটকথা, এই আয়াতে رفع দ্বারা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে সশরীরে আসমানে তুলে নেয়াকে বুঝানো হয়েছে।

খ্রিষ্টানদের প্রশ্নের উত্তর হল এই যে, মুসলমানগণই হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের প্রকৃত অনুসারী এবং প্রাধান্য দ্বারা ধর্মীয় প্রাধান্যকে বুঝানো হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ হল এই যে, গণনা শুরু হয় এক থেকে শেষ হয় একশতে। সুতরাং শত হল শেষ সংখ্যা। যার নিকট একশত টাকা থাকে তার নিকট পঞ্চাশও থাকে ষাটও এবং দশ, বিশও কিন্তু যার নিকট দশ থাকে তার নিকট বিশ, ত্রিশ ইত্যাদি থাকে না। আমাদের নবী শেষনবী তাঁর অনুসরণ সমস্ত নবীর অনুসরণ, তাঁর আনুগত্য সমস্ত পয়গাম্বরের আনুগত্য। অতএব মুসলমানগণই প্রকৃতপক্ষে হযরত মূসা ও ঈসার অনুসারী। মোটকথা হযরত আদম থেকে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত সকলের অনুগত। কিন্তু যার নিকট শেষনবীর গোলামীর সনদ নেই সে এই নে'মত থেকে বঞ্চিত। কুরআন করীমে ইরশাদ হচ্ছে: فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ অর্থাৎ হে মাহবূব! আপনি এই সমস্ত নবীর হিদায়তের সমন্বয়কারী হয়ে যান। এই অর্থ নয় যে, আপনি নবীগণের অনুসরণ করুন, তা হলে اِقْتَدِهِمْ হতো। বরং মর্মার্থ হল এই যে, যে গুণাবলী নবীগণকে পৃথক পৃথকভাবে দান করা হয়েছে সে সমুদয় গুণাবলী একত্রিত করে আপনাকে দান করা হয়েছে। এইজন্য সর্বনাম একবচন এসেছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আরো ইরশাদ হয়েছে: اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা এবং এই নবী ও যারা ঈমান এনেছে মানুষের মধ্যে তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্টতম। মোটকথা, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের সত্যিকার অনুগত কেবল মুসলমানগণ। প্রধান্য দ্বারা ধর্মীয় প্রাধান্য বুঝানো হয়েছে, পার্থিব রাজত্ব নয়। নচেৎ ইতোপূর্বে শত শত বছর মুসলমানদের রাজত্ব ছিল এবং এখনো খোদার ফজলে ইসলামী সাম্রাজ্য অনেক রয়েছে। তা হলে কি পূর্বে মুসলমান হকের উপর ছিল এখন খ্রিষ্টান? অথবা ভারতে খ্রিষ্টান হকের উপর রয়েছে এবং আফগানিস্তান ও কুসতুনতুনিয়ার মুসলমানগণ হকের উপর?

তা ছাড়া ভারতের চামার, মুচি যারা খ্রিষ্টান হয়েছে তারা কেন প্রাধান্য লাভ করেনি তাদের অবস্থা তো এই-হাতে ঝাড়ু, মাথায় মলের বোঝা, ফাটা পোশাক ও ফাটা জুতা এবং আমেরিকা ইত্যাদি দেশের অনুদানের উপর চলে তাদের ভরণপোষণ। ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের সাথে গির্জায় বসতে পারে না, মৃত্যু বরণ করলে তাদের কবরস্থানে দাফন হতে পারে না। তাদের জুতার স্থানে এরা স্থান পায়। এই মুচি, চামাররা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণের ফলে বাদশাহ কেন হয়নি?

প্রতীয়মান হল– প্রাধান্য দ্বারা ধর্মীয় প্রাধান্য বুঝানো হয়েছে। তা সর্বদা মুসলমানদের রয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ থাকবেই। তা এইভাবে যে, কা'বা ইসলামের ক্বিবলা, বায়তুল মোকাদ্দাস য়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের ক্বিবলা। এখনো যে পরিমাণ ধূমধাম ও জাকজমক কা'বার রয়েছে ওখানে নেই। সবসময় কা'বায় তাওয়াফ, প্রত্যেক বছর ওখানে লক্ষ লক্ষ আশেকদের সমাগম। প্রত্যেক দেশে হজ্বের জন্য বিমান ইত্যাদির বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ। বায়তুল মুকাদ্দাসে হাজারো আম্বিয়ায়ে কেরাম সমাহিত আছেন কিন্তু পবিত্র মদীনায় রয়েছেন সায়্যিদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনই।

কিন্তু আশেকদের সমাগম যা মদীনায় হয়ে থাকে তা কোথাও নেই। হজ্বের সময় চতুর্দিকে রাস্তা ঘাট যিয়ারতকারীগণ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে এবং সমুদয় মনযিল আবাদ সমস্ত গরীব মিসকীনগণ থাকে আনন্দে উদ্বেলিত। তা ছাড়া ইসলামী কিতাব হল কুরআন করীম এবং য়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের কিতাব তাওরাত ও ইনজীল। কিন্তু যে প্রচার কুরআন করীমের রয়েছে তা কোন কিতাবের নেই। এই যে, দামী দামী বাইবেল বিক্রয় হচ্ছে তা সত্য মিথ্যা মিশ্রিত অনুবাদ। ইবরানী (হিব্রু) ভাষায় যে ইনজীল আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তা হারিয়ে গেছে কিন্তু কুরআন তাঁর আসলরূপে বিদ্যমান, সেই ভাষা, সেই ক্বিরাত যা জিবরীল আমীন এনেছিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কুরআনের রয়েছে এইরূপ সংরক্ষিত প্রচার যে, তার লিখন পদ্ধতিও সম্পূর্ণ সংরক্ষিত। ক্বিরাত পদ্ধতি এইরূপ সংরক্ষিত যে, তার লক্ষ লক্ষ বিদ্যালয় এখনো চলছে। তা ছাড়া কুরআন করীমের রয়েছে অসংখ্য হাফেজ, তাওরাত, ইনজীল, বেদ ইত্যাদির একজন হাফেজও নেই। কুরআনের রয়েছে অসংখ্য তাফসীর কিন্তু ওই কিতাবসমূহের কোন তাফসীর নেই। কুরআন পৃথিবীতে এসে এক শতাব্দীর মধ্যে সারা পৃথিবীতে তাঁর স্থান করে নিয়েছে যে, সর্বত্র পৌঁছে গেছে। কিন্তু ওই কিতাবসমূহের এত ধীরগতি যে, এখনো পর্যন্ত পৃথিবী ঘুরে আসতে পারেনি। হিন্দুদের উক্তি মতে পৃথিবীতে বেদ এসেছে দু'কোটি বছর হয়েছে কিন্তু এইরূপ ধীরগতি যে, এত দীর্ঘকালে গোটা ভারতবর্ষও ঘুরে আসতে পারেনি।

শুকর অনেক সম্প্রদায় খায় কিন্তু গরু, ছাগল ইত্যাদি খায় মুসলমান সম্প্রদায়। যে বরকত এতে রয়েছে তা শুকরের মধ্যে নেই। গরুর গোশতের যে মার্কেট রয়েছে তার এক চতুর্থাংশও শুকরের নেই। ইসলাম যে বস্তুতে হাত দিয়েছে তারও উত্থান হয়ে গেছে।

খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ও এই আপত্তি করে যে, হযরত ঈসা হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। কেননা হযরত ঈসা রয়েছেন আসমানে এবং হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম যমীনে, হযরত ঈসা জীবিত এবং হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম ইন্তেকাল করেছেন। এই প্রশ্ন কাদিয়ানী মির্যাও করে থাকে। কিন্তু এই প্রশ্ন কেবল মূর্খতা। আসমানে অবস্থান করা, দীর্ঘজীবি হওয়া শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ নয়। নচেৎ তারকা, বৃক্ষ, শকুন ও সর্প মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম হবে। কারণ তারকা আসমানে থাকে, বৃক্ষ, শকুন ও সর্পের বয়স অনেক বেশী। অথচ মানুষ আশরাফুল মাখলূকাত তথা সৃষ্টির সেরা। তারা না আসমানে অবস্থান করে না তাদের বয়স হাজার, দু'হাজার বছর হয়। মুক্তা পানির নিচে থাকে এবং বুদবুদ উপরে কিন্তু মুক্তাই শ্রেষ্ঠতম।

کسے بگفت کہ عیسےٰ از مصطفےٰ اعلیٰ است کہ او بزیر زمین آں بہ اوج سماست

بگفتمش کہ نہ ایں حجت قوی باشد حباب بر سر آب و گہر تہ دریاست

অর্থাৎ কেউ বলল, হযরত ঈসা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা হতে শ্রেষ্ঠতম। কারণ তিনি রয়েছেন মাটির নীচে আর উনি রয়েছে আসমানের উপরে। আমি তাকে বললাম, এই দলীল সবল নয় কেননা বুদবুদ পানির উপরে থাকে আর মুক্তা সমুদ্রের তলদেশে থাকে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তা ছাড়া রাষ্ট্রপতি একজন অফিসারকে সরকারী দায়িত্ব পালনের জন্য পাঠালেন কিন্তু প্রজাগণ শান্ত হয়নি বরং অফিসারকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগল। রাষ্ট্রপতি অফিসারকে নিজের কাছে ডেকে নেন যাতে তার কোন ক্ষতি না হয়। অতঃপর দ্বিতীয় অফিসার পাঠালেন যিনি সকল বিদ্রোহী ও অবাধ্যদেরকে অনুগত করে নিয়েছেন তাকে নির্দেশ দিলেন যে, আপনি ওখানে থাকুন এবং সরকারী দায়িত্ব পালন করে যান। এটা প্রকাশমান যে, দ্বিতীয় অফিসার প্রথম অফিসার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম হবেন। কারণ তার মাধ্যমে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে।

হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের আসমানে গমন করতঃ নবী মোস্তফার শাসনামলের নিরাপদ পরিবেশে পৃথিবীতে তশরীফ আনা এবং হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের মেহমান হয়ে আরশে গমন করা এবং ওখানে ধূমধাম হওয়া অতঃপর অবাধ্যদেরকে বাধ্য করার জন্য পৃথিবীতে ফিরে আসা এবং যমীনে অবস্থান করা এতে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے

অর্থাৎ তূর ও মি'রাজের ঘটনা থেকে প্রকাশমান যে, নিজের পক্ষ হতে গমন করা এবং আল্লাহর পক্ষ হতে আহূত হয়ে গমন করার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে।

বরং বাস্তব বিষয় হল এই যে, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের পুনরায় আগমন করা এই অঙ্গীকারেরই বাস্তবায়ন যে, وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ الاية আল্লাহ তায়া'লা নবীগণ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, শেষ জমানার পয়গাম্বরের নবুওয়াতকাল যদি তোমরা পাও তবে তাঁর আনুগত্য করবে। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম নিজের আসীল (اصیل তথা মৌলিক অঙ্গীকার পূরণকারী) এবং অন্যান্য নবীগণের দলীল হয়ে দ্বীনে মুহাম্মদীর অনুসরণ করতে আসবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ.

স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি তার শপথ, আর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসবে তখন নিশ্চয় তোমরা তার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এই সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমি তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৮১)

এই আয়াতে করীমায় সেই অঙ্গীকার ও স্বীকারোক্তির উল্লেখ রয়েছে যা রাব্বুল আলামীন আম্বিয়ায়ে কেরাম হতে নিয়েছেন। এখানে দু'তিনটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। আয়াতের মূল মর্মার্থ ও ঘটনা কি? এতে কি কি নুকতা রয়েছে? এতে কি কি আপত্তি রয়েছে এবং তার উত্তর কি?

এক. মূল ঘটনা হল এই যে, যখন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে পৃথিবীতে পাঠানো হল তখন তাঁকে নামানো হল কলম্বোর পাহাড় চরণদ্বীপে এবং হযরত হাওয়াকে জিদ্দায়। সম্ভবতঃ তাকে জিদ্দা এইজন্য বলা হয় যে, ওখানে দাদী সাহেবার অবতরণ হয়েছে। তিনশত বছর পর্যন্ত খোদার ক্ষমা লাভের জন্য ক্রন্দন করতে থাকেন। এই দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের নাম স্মরণ হল যা তাঁকে সৃষ্টি করার সময় আরশের তোরণে লিখিত আকারে দেখেছিলেন। তার ওসীলা নিয়ে দোয়া করলেন। কবুল হল। فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ আয়াত দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে।

اگر نام محمد رانہ آوردے شفیع ادم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا

www.AmarIslam.com

হযরত আদম আলাইহিস সালাম যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারককে সুপারিশকারী হিসাবে না আনতেন তা হলে আদম আলাইহিস্ সালাম তাওবা লাভ করতে পারতেন না এবং নূহ আলাইহিস্ সালামও মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা পেতেন না।

তাওবা কবুল হওয়ার পর আরাফাতের ময়দানে হযরত হাওয়ার সাথে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের সাক্ষাৎ হল। এইজন্য তাকে আরাফাত বলে যে, এখানে হযরত আদম ও হাওয়ার মা'রেফত ও পরিচিতি হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হল–হিন্দুস্তান মূলত ইসলাম স্থান। কারণ ইসলামের প্রথম নবী এখানে এসেছেন। হযরত শীস আলাইহিস্ সালামের মাযার শরীফও অযোধ্যার ফয়যাবাদ জেলায় রয়েছে। তা ছাড়া ওলামা মাশায়েখ ও জ্ঞান বিজ্ঞানে এই দেশ কোনটার পেছনে নেই। ভারতের ভূমিতে অসংখ্য লেখক, ফকীহ ও মুহাদ্দিস সৃষ্টি হয়েছেন। কিন্তু তাকে হিন্দুস্তান এইজন্য বলা হয় যে, হিন্দু (هندو) অর্থ চোর-ডাকাত।

হাফেয শীরাযী বলেন,

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا
بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را

ستان অর্থ স্থান অর্থ হল–ডাকাতদের স্থান। ইসলামী সোলতানগণ গযনী হতে এসেছেন। তাদের দেশে ইসলামী দণ্ডবিধির কারণে চুরি ডাকাতি ইত্যাদির নাম গন্ধও ছিল না। এখানে এসে তারা চুরি দেখতে পেয়ে বললেন, ডাকাতদের স্থান।

অতঃপর না'মান পর্বতে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের পৃষ্ঠ হতে সমস্ত রূহ বের করে তাদের নিকট থেকে তিনটি অঙ্গীকার নিয়েছেন। প্রথমতঃ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?) এই অঙ্গীকার সবার থেকে নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আলেমগণ হতে যে, তোমরা খোদাপ্রদত্ত বিধানাবলী গোপন করবে না। হুবহু জনসাধারণের নিকট পৌছে দিবে। তৃতীয়তঃ আম্বিয়ায়ে কেরাম হতে। এই আয়াতে এই তৃতীয় অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ রয়েছে যে হে নবীগণ! যদি তোমরা পৃথিবীতে শেষ যমানার পয়গাম্বররের যুগ পাও তা হলে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে। ওই অঙ্গীকারের এ হল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুই. এই আয়াতে কতিপয় নুকতা (সূক্ষ্মরস) রয়েছে। প্রথমতঃ ميثاق (মীসাক) বলেছেন عهد (আহাদ) বা وعده (ওয়াদা) বলেননি। এখানে ছয়টি বিষয়ের পার্থক্য নির্ণয় করার মত। اقرار (ইকরার) دعوى (দা'ওয়া), وعده (ওয়াদা) عهد(আহাদ), ميثاق (মীসাক), اصر (ইসর)। অতীতের কথা যে, আমার জিম্মায় এতটুকু রয়েছে, তা হল ইকরার (স্বীকারোক্তি), অতীতের বিষয় অপরের জিম্মায় তুলে দেয়াকে দা'ওয়া (দাবী) বলা হয়। যেমন কর্জের দাবী। ভবিষ্যতে কারো জন্য কোন কিছু নিজের জিম্মায় স্বীকার করাকে ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) বলে। কিন্তু তাতে কঠোরতা থাকে না কেবল মৌখিক ওয়াদা। মনে থাকলে পূরণ করে, পূরণ করতে না পারলেও তার জন্য সমালোচিত হতে হয় না। যদি ওয়াদায় লিখে নিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে হেফাজতের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, তা হলে সেটা আহাদ। আহাদের অর্থ হেফাজত। যেহেতু এই ওয়াদার হেফাজত করা হয় সেহেতু এর নামকরণ করা হয়েছে আহাদ। যদি আরো বেশী দৃঢ় করা হয় যেমন সাক্ষী করা হলে অঙ্গীকারনামা রেজিষ্ট্রী করা হলে তখন হয়ে যায় মীসাক (ميثاق) যা وثوق থেকে নিগর্ত। وثوق অর্থ দৃঢ়তা। যদি এই অঙ্গীকারে কিছু চাপও প্রয়োগ করা হয় যে, এই অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ করলে এই শাস্তি প্রদান করা হবে, তখন হয় ইসর (اصر)। ইসর অর্থ চাপ। এই অঙ্গীকারকে যেহেতু অনেক দৃঢ় করা হয়েছিল যে, নবীগণের সাক্ষ্য এবং তার উপর রাজসাক্ষী হয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়া'লা। এইজন্য বলা হয়েছে 'মীসাক'। অর্থাৎ আমি নবীগণ হতে কেবল ওয়াদা নয়, আহাদ নয় বরং মীসাক নিয়েছি।

اَلنَّبِيّٖنَ এ দু'টি অভিমত রয়েছে। প্রথমতঃ এই অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল কেবল নবীগণ হতে। দ্বিতীয়তঃ নবীগণ হতেও এবং তাঁদের উম্মতগণ হতেও। যারা এই অঙ্গীকারে উম্মতগণকেও অন্তর্ভুক্ত করেন তারা বলেন, নবীগণ স্ব স্ব উম্মতগণের পক্ষ হতে প্রতিনিধিত্ব করতঃ উত্তর দিয়েছেন যেমন নামাযের মধ্যে কেবল ইমাম ক্বিরাত পাঠ করেন, কিন্তু মুক্তাদীদের পক্ষ হতে প্রতিনিধি হয়ে এবং اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ যেহেতু উম্মতগণকে নবীগণের মাধ্যমে কিতাব দান করা হয়েছে এইজন্য তাদেরকে এই সম্বোধন করা হয়েছে।

তাদের দলীল হল এই যে, আল্লাহ তায়া'লা জানতেন যে, এই নবীগণের মধ্যে কোন নবী হুজুরের যমানা পাবেন না সুতরাং তাঁদের থেকে অঙ্গীকার নেয়া অর্থহীন। হ্যাঁ, তাঁদের উম্মতগণ শেষ যমানার নবীর যুগ পাবে এইজন্য তাদের থেকে অঙ্গীকার নেয়াই ফলদায়ক। তা ছাড়া সামনে ইরশাদ হচ্ছে فَمَنْ تَوَلّٰى

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ আর আম্বিয়ায়ে কেরামের পক্ষে অঙ্গীকার ভঙ্গ সম্ভব নয়। কারণ তারা নিষ্পাপ। অতএব নবীগণকে এটা কিভাবে বলা যেতে পারে যে, যে কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে সে অপরাধী হবে। যাদের ধারণা কেবল নবীগণ হতে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে, তারা বলেন, اَلنَّبِيّٖنَ এর মধ্যে উম্মতগণকে অন্তর্ভুক্ত করা দলীল বিহীন। এই অঙ্গীকার ছিল নবী মোস্তফার মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্যই; আম্বিয়ায়ে কেরাম শেষনবীর যুগ পান বা না-ই পান। কিন্তু এই অঙ্গীকার নেয়াতে মাহাত্ম্যের প্রকাশ তো হয়ে গেল যে, আল্লাহ আকবর! ইনি এইরূপ উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন নবী যে, আল্লাহ তায়া'লা তাঁর রবূবিয়্যতের পাশাপাশি তাঁর রিসালতের অঙ্গীকারও নিয়েছেন। তা ছাড়া মি'রাজের নামাযে তাঁদের আনুগত্য ও হুজুরের নেতৃত্বের প্রকাশ করেছেন। তা ছাড়া হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম আসমান থেকে অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী মোস্তফা আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের আনুগত্য করবেন। তা ছাড়া এটা قضه شرطيه (শর্তমূলক বাক্য) যা امكان مقدمتين (বাক্যের উভয় অংশের সম্ভাব্যতা)কে চায় না। যদিও নবীগণের পক্ষে অঙ্গীকার ভঙ্গ সম্ভব নয় কিন্তু এটা বলাতে কোন অসুবিধা নেই। যেমনঃ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ (যদি আপনি শিরক করেন তবে আপনার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে)। সমস্ত রূহ থেকে তাঁর রবূবিয়্যতের স্বীকারোক্তি আদায় করেন অথচ কতেক রূহ এমন রয়েছে যারা মাতৃগর্ভে এসেই ফিরে যাবে কতেক বাল্যকালেই মরে যাবে, কতেক পৃথিবীতে পাগল হয়ে থাকবে, না আল্লাহকে চিনতে পারবে না নবীকে, না তাদের জন্য শরীয়তের বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে। বাল্যকালের চেনা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। নচেৎ কাফিরদের সমস্ত সন্তানদের প্রতি মুরতাদের বিধান আরোপিত হবে যে, মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করার পর কাফির হয়েছে। হাদীসে রয়েছে–শিশু স্বভাবজাত ধর্মে জন্মগ্রহণ করে থাকে। তদুপরি কুরআনে রয়েছে فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (আল্লাহর স্বভাবজাত ধর্ম যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন)। মোটকথা, এই অঙ্গীকারে রয়েছে হুজুরের মাহাত্ম্যের প্রকাশ।

এখানে نبيين বলেছেন رسل বা مرسلين বলেননি। কেননা রাসূল ও মুরসাল থেকে নবী ব্যাপক (عام)। আ'মের মধ্যে খাস (خاص) অন্তর্ভুক্ত। এর বিপরীত হয় না। যেহেতু নবুওয়াত দরবারের সকল স্তরের মহাত্মাগণকে অন্তর্ভুক্ত করা উদ্দেশ্য ছিল তাই আ'ম শব্দ বলেছেন। এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হল–যদি কোন নবীর নবুওয়াত প্রাপ্তি এবং কিতাব ও জ্ঞান প্রদত্ত হওয়ার পরও হুজুরের আত্মপ্রকাশ হয়ে যেতো তা হলে তৎক্ষণাৎ তাঁদের কিতাব ও নবুওয়াত রহিত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়ে যেতো। যেমন সূর্য্যের আত্মপ্রকাশে যে নক্ষত্র যেখানে থাকে ওখানেই লুকিয়ে যায়। আসমানের মধ্যখানে থাকুক বা প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে। অনুরূপভাবে যে নবী যে অবস্থায় থাকুন না কেন! হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের শুভাগমনে সমস্ত নবীর শরীয়তসমূহ কেন রহিত হচ্ছে? তার কতিপয় কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ হুজুর আলাইহিস সালাম হলেন মূল আর সবাই তাঁর স্থলাভিষিক্ত। মূলের আগমন হতেই স্থলাভিষিক্তের দায়িত্বভার শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ এইজন্য যে, সবাই হুজুরের দীপ্তিতে দীপ্যমান ছিলেন এবং প্রত্যেক কিছু তার কেন্দ্রে পৌছে স্থিতিশীল হয়ে যায়। যেমন নদী সমুদ্রে পৌছে স্থিতিশীল হয়ে যায়

یک چراغے ست کزاں انجمنے ساختہ اند

যদি জমাআত চলাকালে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম আগমন করেন তবে তখন হতে হুজুরই ইমাম। প্রথম ইমামের ইমামত রহিত। যেমন হযরত সিদ্দীকের কর্ম দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, একদা তিনি ছিলেন ইমাম, এমতাবস্থায় হুজুর তশরীফ আনলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি মুক্তাদী হয়ে পিছনে সরে যান। এ থেকে প্রমাণিত হল-হুজুর নবীয়্যুল আম্বিয়া (নবীগণের নবী)।

قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ এই কথার উপর নবীগণকে উত্তর দেয়ার সুযোগও দেয়া হয়নি। বরং তৎক্ষণাৎ বলা হয়েছে যে, আপনারা কি এটা স্বীকার করে নিলেন? এতে কয়েক ধরনের তাকীদ (জোরদার করণ) রয়েছে। প্রথমতঃ এইভাবে যে, আমর (امر) ও আহাদ (عهد)'র মধ্যে পার্থক্য হয়ে থাকে যে, আমর (আদেশ)কে মা'মূর (আদিষ্ট) শুনতে পেয়েছে, এতটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু আহাদ (অঙ্গীকার)'র মধ্যে আদিষ্ট ব্যক্তির মুখে উচ্চারণ করা আবশ্যক। সুতরাং তাঁদের মুখ দ্বারা উচ্চারণ করানো হয়েছে। যাতে প্রতীয়মান হয় যে, এটা কেবল আদেশ নয় বরং স্বীকারোক্তি গ্রহণ। দ্বিতীয়তঃ এখানে এই প্রশ্ন আল্লাহ তায়া'লার জানার জন্য নয় তিনি তো আলীম (সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত), বরং নবীগণের আনুগত্যের প্রকাশের জন্য।

ছাত্র শিক্ষকের নিকট জিজ্ঞেস করে জ্ঞান অর্জন করার জন্য। শিক্ষক ছাত্রকে পাঠ জিজ্ঞেস করে ছাত্রের পরিশ্রম জানার জন্য। কোন কোন সময় কারো সম্মুখে শিক্ষক পরীক্ষা নেন তার যোগ্যতা মানুষের নিকট প্রকাশ করার জন্য। তৃতীয়তঃ এখানে কেবল بَلٰى (হ্যাঁ) বলা হয়নি। বরং অধিক গুরুত্ব বুঝানোর জন্য اَقْرَرْنَا তাঁদের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করানো হয়েছে। যেমন বিবাহের ইজাব (প্রস্তাব দান) ও কবুলের (প্রস্তাবগ্রহণ) সময় قَبِلْتُ (আমি কবুল করলাম) মুখ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দিয়ে উচ্চারণ করানো হয়। কেবল 'হ্যাঁ' বলাকে যথেষ্ট মনে করা হয়না। অতঃপর নবীগণকে পরস্পরে সাক্ষী করলেন এবং নিজের রাজ সাক্ষ্যও কায়েম করলেন। এইজন্য ফরমায়েছেন مَعَكُمْ যেন প্রতীয়মান হয় যে, মূল সাক্ষী তোমরা, আমি তো তোমাদের সাক্ষ্যের সাক্ষী। যেমন রাষ্ট্রনায়ক সাক্ষীও এবং শাসনকর্তাও।

তিন. এই আয়াতের উপর কতিপয় প্রশ্ন রয়েছে। প্রথমতঃ যখন এই অঙ্গীকার স্মরণই থাকেনি সুতরাং এটা নিষ্ফল; উত্তর হল এই যে, নিষ্ফল তখনই হতো যখন না কারো স্মরণ থাকতো, এবং না স্মরণ করিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু যখন নবীগণ স্মরণ করিয়ে দিলেন, ফলদায়ক হয়েছে। সকল বিভাগে অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য নিয়মাবলী রাখা হয়। লিখিত পত্র, রেজিষ্টার, সাক্ষী ইত্যাদি। তবে কি ওই অঙ্গীকার নিষ্ফল?

মানুষ সর্বদা পুরাতন কথা ভুলে যায়। মাতৃগর্ভে থাকা, শৈশবে মায়ের লালন-পালন কিছুই স্মরণ থাকে না। মা এগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে খেদমতের অধিকার প্রমাণ করে। এইভাবে নবীগণ ও আল্লাহর কিতাবসমূহ সবাইকে এই অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। শিশু যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন এই অঙ্গীকার তার স্মরণ থাকে এবং এই অঙ্গীকারের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে। এইজন্য নীরব থাকে এবং আলমে আওয়াহ (আত্মার জগত) থেকে আগমনের ফলে ক্রন্দন করে কিংবা শয়তানের স্পর্শে। মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন:

بشنو از نے چوں حکایت می کند   واز جدائی ہا شکایت می کند

বাঁশির মুখ থেকে শুনো যখন তা আওয়াজ করে, হ্যাঁ, সে তার সুরে বিরহের অভিযোগ করছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এই আয়াত দ্বারা হুজুরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়না। কেননা, اَلنَّبِيِّيْنَ এর মধ্যে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামও অন্তর্ভুক্ত। যেমন অপর আয়াতে وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ. الاية। (স্মরণ করুন, যখন আমি নবীগণের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং আপনার নিকট হতেও এবং নূহ .... সূরা আহযাব, আয়াত-৭) প্রতীয়মান হল-অপরাপর নবীগণের নিকট হতে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি কোন নবীর জমানা পাও তবে তার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে এবং হুজুর আলাইহিস্ সালামের নিকট হতেও অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে যে, আপনি যদি কোন নবীর জমানা পান তার প্রতি ঈমান আনবেন। অতএব এই আয়াত দ্বারা হুজুরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এর উত্তর হল এই যে, এই আয়াতের দু'টি শব্দ বাতলে দিচ্ছে যে, এই অঙ্গীকার হুজুরের নিকট হতে নেয়া হয়নি বরং হুজুরের জন্যই নেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ দ্বিতীয়তঃ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ কেননা ما ব্যাপকতার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম ব্যতীত সমস্ত কিতাবের সত্যায়নকারী কোন নবী আসেননি। কারণ হুজুর আলাইহিস্ সালামই শেষনবী। সমস্ত নবী স্ব স্ব যুগ এবং পূর্ববর্তী নবীগণের সত্যায়নকারী ছিলেন এবং পরবর্তীদের সুসংবাদ দানকারী। হুজুর কোন নবীর সুসংবাদদানকারী নন। করণ সুসংবাদ তো পরবর্তী নবীরই হয়ে থাকে আর হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সর্বশেষ নবী। প্রমাণিত হল–এই অঙ্গীকারে হুজুর আলাইহিস সালাম অন্তর্ভুক্ত নন। তা ছাড়া সমসাময়িক নবী তাঁর সমসাময়িক অন্য নবীর উজির ছিলেন। যেমন হযরত য়াহয়া ও হযরত হারূন হযরত মূসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামের উজির ছিলেন। উজির অপেক্ষা সোলতান শ্রেষ্ঠতম। কিন্তু এখানে তো হুজুরের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক। এই বিষয়টা কেবল হুজুরের মধ্যেই রয়েছে যে, তিনি সবার সত্যায়নকারী এবং সবার ইমাম। তিনি নিজেই ইরশাদ করেন, لَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا مَا وَسِعَهٗ اِلَّا اتِّبَاعِىْ (যদি হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম জীবদ্দশায় থাকতেন তা হলে আমার অনুসরণ ব্যতীত তাঁর কোন গত্যন্তর ছিল না)। তা ছাড়া আপত্তিকারীর উক্তিতে 'দাওর' (ঘুর্ণন) অবধারিত হচ্ছে যে, সমসাময়িক নবীগণের প্রত্যেক নবী অপর নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম হবেন। কারণ এই নির্দেশ হবে তাদের সবার জন্য যে, অপর নবীর উপর ঈমান আনয়ন কর এবং তার প্রতি বিশ্বাসী হও।

তৃতীয় আপত্তি হল এই যে, খোদার জানা ছিল যে, এই নবীগণের কেউই হুজুরের যমানা পাবে না, সুতরাং অঙ্গীকার নিয়ে কি লাভ? এর দু'টি উত্তর তো পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় উত্তর হল এই যে, শরীয়তের বিধানাবলীতে এই নিয়ম রয়েছে যে, যদি সুযোগ হয় এবং ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী পাওয়া যায় তখন আমল অপরিহার্য হয়। নচেৎ তার প্রতি আক্বীদা রাখতে হয়। যাকাত, হজ্ব ইত্যাদির শর্তাবলী পূর্ণ হলে ওগুলোর উপর আমল কর নচেৎ কেবল তা ফরয হওয়ার আক্বীদা রাখাই যথেষ্ট। মি'রাজে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়েছে। পঁয়তাল্লিশ ওয়াক্ত আমল করার পূর্বেই রহিত হয়ে যায়। মুসলমানদের জন্য উম্মাহাতুল মো'মেনীনের হারাম হওয়া কেবল আক্বীদা হিসেবে রয়ে গেছে, নচেৎ বর্তমানে এর উপর আমল অসম্ভব। কেননা আমরা তাঁদের (ওফাতের) শত শত বছর পর জন্মগ্রহণ করেছি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনুরূপভাবে রহিত আয়াতসমূহের প্রতি আক্বীদা পোষণ ও তিলাওয়াত করার জন্য তা বাকী রাখা হয়েছে। নচেৎ হুকুম রহিত। অনুরূপভাবে যে নবীগণ হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের যমানা পাননি, তাঁদেরকে এই আক্বীদার উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, আমরা যদি তাঁর যুগ পেতাম অবশ্যই ঈমান আনয়ন করতাম এবং সমস্ত উম্মতের জন্য হুজুর আলাইহিস্ সালামের মাহাত্ম্য ও নবীগণের নবী (نبى الانبياء) হওয়ার আক্বীদা রাখা অপরিহার্য হয়ে যায়। এইজন্য সমস্ত কিতাবে এই ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। মোটকথা এ হল সংবিধিবদ্ধভাবে ভক্তির অঙ্গীকার।

সুবহানাল্লাহ! এই অঙ্গীকারের বিষয় বস্তু কতইনা প্রিয়, সেই দৃশ্য দেখার মত যে, নবীগণের সমাবেশ, সম্মুখে মিম্বরের উপর কালো যুল্‌ফধারী এক প্রেমাস্পদ উপস্থিত। আল্লাহ তায়া'লা ওই পবিত্র সমাবেশ হতে অঙ্গীকার নিচ্ছেন যে, হে নবীগণ! আমি তোমাদেরকে নবুওয়াতের আমানত প্রদানের জন্য নির্বাচিত করেছি, তোমাদের মাথায় রিসালতের রাজমুকুট পরাব, আমার বান্দাদের মুখে তোমাদের কলেমা পড়াব। কিন্তু আমার নিকট একটি অঙ্গীকার কর। তা হল এই- দেখ, তোমাদের সম্মুখে কালো কালো যুল্‌ফধারী আমার প্রেমাস্পদ উপস্থিত, তাঁকে চিনে নাও। যখন পৃথিবীতে তোমাদের ডঙ্কা বাজবে, মিম্বরগুলোতে তোমাদের খোৎবা পাঠ করা হবে, তোমাদের আনুগত্যের উপর মানুষের মুক্তি নির্ভর করবে সেই উত্থানের অবস্থায় যদি এই মাহবুব পৃথিবীতে তশরীফ আনেন তখন তোমরা এই প্রেমাস্পদের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে তাঁর খেদমতে আত্মনিয়োগ করবে। উত্তর দানের সুযোগ দেননি। ফরমালেন, বল, তোমরা কি স্বীকার করলে? এই সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? সবাই এক বাক্যে আরজ করলেন, মাওলা! আমরা স্বীকার করলাম। আল্লাহ ফরমালেন, আচ্ছা! পরস্পরে সাক্ষী হয়ে যাও, হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম নূহ, ইব্‌রাহীম ও মূসা আলাইহিমুস্ সালামের উপর এবং এই মহাত্মাগণ তাঁর উপর। আর তোমাদের সাক্ষ্যের উপর থাকছে আমার রাজ সাক্ষ্য। সুবহানাল্লাহ!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফযায়েলে কা'বা

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ. فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ إِبْرٰهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ط

মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায়, তা বরকতময় ও বিশ্ব জগতের দিশারী। তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইবরাহীম, এবং যে কেউ সেথায় প্রবেশ করে সে নিরাপদ। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৯৬, ৯৭)

এই আয়াতে করীমায় তিনটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক কি? এর অবতরণ কি প্রসঙ্গে হয়েছে? এ থেকে মুসলমানদের জন্য কি শিক্ষা পাওয়া গেল?

এক. পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুন্য লাভ করবেনা) যা থেকে প্রতীয়মান হলঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য ভালবাসার বস্তু ব্যয়ের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। জান, মাল, সন্তান সব কিছু ব্যয় কর।

هرچه داری صرف کن در راه او　　لن تنالوا البر حتى تنفقوا

তোমার যা কিছু আছে তাঁর পথে ব্যয় কর, কেননা ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনো পুন্য লাভ করতে পারবে না।

হজ্বের মধ্যে প্রিয় সম্পদও ব্যয় হয় এবং জানও যে, আরাম ত্যাগ, দেশ ত্যাগ, সন্তান-সন্ততি ত্যাগ সব কিছুই করতে হয়। এইজন্য সাদকার হুকুমের পর হজ্বের হুকুম দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের আলোচনা হয়েছে এখন কা'বার অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাতার পর প্রতিষ্ঠানের আলোচনা। মোটকথা, আয়াত পুরোপুরিভাবে পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্বন্ধযুক্ত।

দুই. ক্বিবলা পরিবর্তনের সময় য়াহুদ ও খ্রিষ্টানগণ সমালোচনার ঝড় তুলেছিল যে, মুসলমানগণ উত্তম ক্বিবলা অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসকে ত্যাগ করে নগণ্য

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ক্বিবলা কা'বাকে গ্রহণ করেছে। কারণ পৃথিবীর প্রথম গৃহ বায়তুল মুকাদ্দাস, আম্বিয়ায়ে কেরামের হিজরতের স্থান, রাসূলগণের সমাধিস্থল এবং এটাই হাশরের দিন মানুষের অবস্থান স্থল। কা'বা মুয়াযযমায় এই গুণাবলী নেই। সুতরাং উত্তমকে কেন ত্যাগ করল? উত্তম ক্বিবলার দিকে নামাযও উত্তম হয়ে থাকে।

এখানে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এই সমুদয় দলীলাদির জবাব দেয়া হয়েছে। إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ এর মধ্যে রয়েছে প্রথম আপত্তির উত্তর এবং فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ এর মধ্যে বাকীটার। অর্থাৎ সর্বপ্রথম গৃহ যা পৃথিবীতে নির্মিত হয়েছে তা হল কা'বাই। কয়েকদিক দিয়ে কা'বার প্রথম হওয়া প্রমাণিত। প্রথমতঃ এই স্থান হতেই পৃথিবী গঠিত হয়েছে। পানির উপর এখানেই বুদ বুদ সৃষ্টি হয়েছে। তারপর আসমান গঠিত হয়েছে। অতঃপর ওই বুদবুদকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। বুদবুদই পৃথিবীর মূল। এইজন্য মক্কা মুকাররমাকে উম্মুল কুরা এবং হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে উম্মী অর্থাৎ মক্কী (মক্কাবাসী) বলা হয়। উম্ (ام) শব্দের অর্থ মা- মায়ের মত এই শহর পৃথিবীর মূল এবং বাকী পৃথিবী সন্তানের মত শাখা।

দ্বিতীয়তঃ এইজন্য যে, হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের সৃষ্টির দু'হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীর কর্মনির্বাহী ফেরেশতাগণ যারা পৃথিবীর ব্যবস্থাপনার জন্য এখানে থাকতেন, যিয়ারত ও হজ্বের জন্য ওখানে তারা আল্লাহর নির্দেশে বায়তুল মা'মূরের সোজাসুজি একখানা গৃহনির্মাণ করেছেন। (রূহুল বয়ান) অতঃপর হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের তাওয়াফ ও ইবাদতের জন্য জান্নাত হতে একটি মাকাম এসেছে যা নূহ আলাইহিস্ সালামের তুফানে তুলে নেয়া হয়েছে হাজরে আসওয়াদ ব্যতীত। (বুখারী) তারপর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর নির্দেশে এখানে গৃহ নির্মাণ করেছেন এবং কা'বা তাঁরই নির্মাণ হিসেবে খ্যাত। তা ছাড়া এই স্থান পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। এইজন্য কা'বাকে পৃথিবীর নাভীও বলা হয়। যেমন হাদীস শরীফে রয়েছে। তা ছাড়া তাফসীরে হক্কানীর গ্রন্থকার জ্যামিতি শাস্ত্রের নিয়ম দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, কা'বা মুয়ায্যমা পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। হাদীসে রয়েছে-বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কা'বার চল্লিশ বছর পর হয়েছে। অতঃপর হযরত সোলায়মান আলাইহিস্ সালামের যুগে তাঁর তত্ত্বাবধানে জিনগণ নির্মাণ করেছে। কুরআন করীমে রয়েছেঃ يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ তারা সোলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী নির্মাণ করত প্রাসাদ।(রূহুল বয়ান) বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণকারীরা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ছিল জিন, নির্মাণের নির্দেশদাতা হযরত সোলায়মান আলাইহিস্ সালাম। কিন্তু কা'বা মুয়াযযমা নির্মাণের আদেশদাতা স্বয়ং আল্লাহ, তার ইঞ্জিনিয়ার হযরত জিবরীল রূহুল্লাহ, নির্মাণকারী খলীলুল্লাহ, তাঁকে সহায়তাকারী যবীহুল্লাহ এবং তাকে আবাদকারী হাবীবুল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আলাইহিমুস সালাম। অতএব বুঝতে হবে যে, এই নির্মাণ কেমন হবে? য়াহুদীদের প্রথম আপত্তির উত্তর তো اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ এ দেয়া হয়েছে। বাকীটার উত্তর فِيْهِ اٰيٰتٌ এ।

নিঃসন্দেহে বায়তুল মুকাদ্দাস আম্বিয়ায়ে কেরামের সমাধিস্থান কিন্তু মক্কা মুকাররমা সায়্যিদুল আম্বিয়ার জন্মস্থান। রাজধানী সেটাই যেখানে বাদশাহ থাকেন যদিও অপরাপর মন্ত্রী ও সচিবগণ অন্যত্র একত্রিত হন। নিঃসন্দেহে শাম দেশ মাহশরের স্থান। কিন্তু পৃথিবীর সূচনা অর্থাৎ রূহসমূহের অঙ্গীকার গ্রহণ, হযরত আদম ও হাওয়ার সাক্ষাৎ এখানে কা'বার আরাফাতে হয়েছে। মানব জাতির সূচনাকালীন ঘটনাবলী হিজাযে হয়েছে এবং সমাপ্তিকালীন বায়তুল মুকাদ্দাসে হবে। সূচনা মহৎ হওয়ায় সঙ্গতিপূর্ণ। রাজ্য প্রাপ্তিতে উল্লাস করা হয় সমাপ্তিতে নয়।

বাক্কা অর্থ-ভীড় অথবা ঘাড় দলিত করা প্রথম অর্থে মক্কা মুকাররমাকে এইজন্য বাক্কা বলা হয় যে, এখানে হাজীদের ভীড় হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অর্থে এইজন্য যে, কেউ তার উপর হামলা করলে তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। যেমন হস্তীবাহিনী। কিন্তু হাজ্জাজ ও ইয়াযীদ এইজন্য ধ্বংস হয়নি যে, তারা কা'বায় হামলা করেনি, তাদের হামলার লক্ষ্য বস্তু কা'বা ছিলনা বরং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও মক্কাবাসী। কা'বা গৃহ পার্থিব দিক থেকে এইভাবে বরকতময় যে, খেত-ফসল না হওয়া সত্ত্বেও ওখানে সব কিছু পাওয়া যায় এবং সব ধরনের ফল পৌঁছে যায়। ধর্মীয় দিক থেকে এইভাবে বরকতময় যে, ওখানে একটি পুন্যকাজের সওয়াব এক লক্ষ। মোটকথা, পার্থিব ও ধর্মীয় বরকতসমূহের কেন্দ্র।

এই কা'বা মুয়াযযমায় রয়েছে অনেক বৈশিষ্ট্য ও নির্দশন। এখানে রয়েছে মাকামে ইবরাহীম, যে পাথরখানা হযরত খলীলের পদচিহ্ন নিজের মধ্যে সংরক্ষণ করেছে। তার হেরেম রয়েছে, এখানে কিয়ামত পর্যন্ত হজ্ব হতে থাকবে। এখানে রয়েছে দাজ্জাল, মহামারী, কুষ্ঠরোগ ও আল্লাহর আযাব হতে নিরাপত্তা, খুনীর জন্য ক্বিসাস (মৃত্যুদণ্ড) হতে নিরাপত্তা, শিকারযোগ্য প্রাণীদের শিকার হওয়া থেকে নিরাপত্তা, বৃক্ষরাজির জন্য কর্তিত হওয়া থেকে নিরাপত্তা এমনকি এই হেরেমের স্থানে হরিণ ও নেকড়ে বাঘ এক স্থানে বিশ্রাম করে। পশুরা বাহির থেকে পলায়ন করতঃ এখানে আসে কিন্তু এখানে এসেই ভয়শূন্য হয়ে যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তা ছাড়া পাখিরা কাতার বেঁধে কা'বাগৃহের উপর দিয়ে অতিক্রম করে না বরং ডান বা বামদিক হয়ে চলে যায়। যে পাখি রোগাক্রান্ত হয় সেটা ওখানে গিয়ে বসে এবং আরোগ্য লাভ করে। হযরত যবীহুল্লাহর বদান্যতার যমযম এখান থেকে সারা পৃথিবীতে পৌঁছে, যাতে রয়েছে রোগমুক্তি। পাত্রের মধ্যে বন্ধাবস্থায় থেকেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্বাদ ধারণ করে। এগুলোর মধ্যে একটাও বায়তুল মুকাদ্দাসে নেই। তা ছাড়া এখানে রয়েছে হাজরে আসওয়াদ যা বেহেশতী পাথর।

তিন. এ থেকে কতিপয় বিষয় প্রতীয়মান হল। প্রথমতঃ কা'বা মুয়াযযমা মানুষের হজ্বের স্থান। কিন্তু বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে আনওয়ার ফেরেশতাদের হজ্বের স্থান। এখানে বৎসরে একবার পৃথিবীবাসী হজ্ব করে, পবিত্র মদীনায় প্রত্যেক দিন দু'বার আসমানবাসী হজ্ব করে।

হাদীস শরীফে রয়েছে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা সত্তর হাজার ফেরেশতা দরূদ ও সালাম পেশ করার জন্য মদীনা শরীফে হাজির হন। যারা একবার এসেছে তারা কিয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয় বার আসার সুযোগ পাবে না। মীযাবে রহমত অবিকল রওযার বিপরীতে, সেটাও হাজীদেরকে মদীনার পথ প্রদর্শন করছে। যেমন গলির ভিতরের দোকানের প্রতি নির্দেশ করে সড়কের উপর স্থাপিত তীরচিহ্ন। যেন কা'বা হাজীদেরকে ইঙ্গিত করছে যে, গৃহ তো দেখেছো, এবার দুলা দেখ মদীনায় শুয়ে আছেন।

غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا
میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو

হে আহমদ রেজা! গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনো, কা'বা হতে ধ্বনি আসছে যে, আমার নয়নে আমার প্রিয়তমের রওযাও দেখে আস।

তা ছাড়া ধর্মীয় ব্যাপারে কাউকে ছাড় দেয়া ঈমানের দুর্বলতা। যদি কেউ তার সত্তা কিংবা তার ঘর কিংবা তার কোন বস্তুকে আমাদের সত্তা বা ঘর ইত্যাদি থেকে উত্তম বলে, আমরা তার সাথে ঝগড়া করব না কিন্তু যদি তার ধর্ম কিংবা তার নবীকে আমাদের ধর্ম বা নবী অপেক্ষা উত্তম বলে তা হলে এর উপর নীরব থাকা অপরাধ। কারণ, বনী ইস্রাঈল বায়তুল মুকাদ্দাসকে কা'বা হতে উত্তম বলেছে, উত্তর দেয়া হয়েছে কখনো না, কা'বাই উত্তম। কাদিয়ানীরা কাদিয়ানের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাটিকে হেরেম অপেক্ষা উত্তম মনে করে এবং বলেঃ

زمین قادیاں اب محترم ہے یہاں کی ہر گلی رشک حرم ہے

কাদিয়ানের ভূমি এখন সম্মানিত, এখানকার প্রত্যেকটা গলি হেরেমের জন্য ঈর্ষার পাত্র (নাউযুবিল্লাহ)।

সম্পূর্ণ ধর্মহীনতা। যখন বায়তুল মুকাদ্দাস যেখানে হাজারো নবী আরাম করছেন তা মক্কার মাটি থেকে উন্নত হয়নি তা হলে কাদিয়ানের মাটি যেখানে কাদিয়ানের দজ্জাল সৃষ্টি হয়েছে কিভাবে হেরেমের সমকক্ষ হতে পারে? তা ছাড়া কাদিয়ানীরা কাদিয়ানে বেহেশতী কবরস্থান তৈরী করেছে যেখানে কবর দেয়ার বিনিময়ে টাকা গ্রহণ করে এবং জান্নাতের টুকরার মত বিক্রয় করে, এটাও ধর্মহীনতা। এ থেকে এও প্রতীয়মান হল যে, ইসলামের মধ্যে যেমনিভাবে সকল ইসলামী বিষয়াবলী স্বীকার করে নেয়া আবশ্যক তেমনিভাবে ওগুলোর মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্যও স্বীকার করে নেয়া অপরিহার্য। تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ [এই রাসূলগণ, তাদের মধ্যে কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি] মর্যাদাগত পার্থক্য না করা ধর্মহীনতা। যে ব্যক্তি সকল নবীগণকে সমান মর্যাদাসম্পন্ন মানে এবং যে ব্যক্তি কোন নবীকে হুজুর আলাইহিস্ সালাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম মানে উভয়ই বেদ্বীন। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কেরামের পদমর্যাদায়ও, যদি কেউ কোন সাহাবী বা আহলে বায়তকে হযরত সিদ্দীক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বা সমকক্ষ মানে সেও পথভ্রষ্ট। বরং ধারাবাহিকতা হল এই-

اَفْضَلُ الْبَشَرِ بَعْدَ الْاَنْبِيَاءِ بِالتَّحْقِيْقِ اَبُوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ ثُمَّ وَثُمَّ

অর্থাৎ নবীগণের পর সর্বোত্তম মানব হযরত আবু বকর সিদ্দীক তারপর উমর, তারপর উসমান তারপর আলী তারপর অপরাপর সাহাবীগণ। যেমনিভাবে বায়তুল মুকাদ্দাসকে কা'বা অপেক্ষা উত্তম মান্যকারী বেদ্বীন তেমনিভাবে কোন সাহাবীকে সিদ্দীকে আকবর (রা.) অপেক্ষা উত্তম মান্যকারীও গোমরাহ।

অতঃপর যেমনিভাবে বায়তুল মুকাদ্দাস ও খানায়ে কা'বার মধ্যে শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে তেমনিভাবে স্বয়ং মসজিদে হারামের স্থানসমূহের মধ্যেও শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে। মাত্বাফ শরীফ যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদ ছিল তা বাকী অংশ থেকে উত্তম যা পরবর্তীতে মসজিদ আকারে বর্ধিত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করা হয়েছে। হাত্বীম শরীফ সর্বাপেক্ষা উত্তম, কারণ তা কা'বার অংশ। মসজিদে নববীর মধ্যে মিম্বর ও রওযা পাকের মধ্যবর্তী অংশ উত্তম কারণ তা জান্নাতের উদ্যান। মসজিদের সেই সীমানা যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল তা বাকী অংশ থেকে উত্তম যা পরে যুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর যতই রওযার নিকটবর্তী হবে ততই মর্যাদা বেশী। অন্যান্য মসজিদে কাতারের ডান অংশ বাম অংশ হতে উত্তম। কিন্তু মসজিদে নববীতে বাম অংশ ডান অংশ থেকে উত্তম। কেননা রওযা পাক রয়েছে বাম দিকে। যেমন ক্বলব রয়েছে শরীরের বাম পার্শ্বে।

অন্যান্য মসজিদেও শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে। সর্বাপেক্ষা উত্তম মসজিদে কা'বা, তারপর মসজিদে নববী, তারপর নিজ শহরের জামে মসজিদ, তারপর বাজারের মসজিদ। মসজিদের মধ্যেও সর্বাপেক্ষা উত্তম ইমামের স্থান। অতঃপর ইমামের পিছনের স্থান তারপর প্রথম কাতারের ডান অংশ, তারপর বাম। অতঃপর পরবর্তী কাতারগুলো। কিন্তু জানাযার নামাযে শেষের কাতারই উত্তম, তারপর ইমামের নিকটবর্তী। দেখুন, শামী ইত্যাদি।

যে সমস্ত বিষয়ে শরীয়ত শ্রেণী বিন্যাস করেনি তাতে নিজের পক্ষ হতে শ্রেণী বিন্যাস আবিষ্কার করা ঠিক নয় বরং ওগুলো শ্রেণী বিন্যাস ছাড়াই মেনে নিন। শামী বাবুল কাফাআত ইত্যাদিতে একটি পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে যে, খাতূনে জান্নাত উত্তম না সিদ্দীকাতুল কুবরা? কিন্তু সিদ্ধান্ত দিয়েছেন উভয়কে মেনে নাও, একজন হুজুরের কলিজার টুকরা আরেকজন হুজুরের প্রিয়তমা। তাঁদের শ্রেণী বিন্যাস করা আমাদের জন্য জরুরী নয়। অনুরূপভাবে চিশ্‌তী, কাদেরী ইত্যাদি সিলসিলায় কোনটা উত্তম? তা নিয়ে আলোচনা করা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। সিলসিলা চতুষ্টয় একটি সাগরের চারটি নদী, যে নদীতেই আপনি নৌকা ফেলবেন সাগরে পৌছে যাবেন।

তবে যদি কোন পুকুরে নৌকা ফেলে দেন অর্থাৎ সিলসিলা বিচ্ছিন্ন পীরের হাতে হাত রাখেন তা হলে নবী মোস্তফার নবুওয়াতের সাগরে পৌছতে পারবেন না। অনুরূপভাবে অলিগণ বা আলেমগণের মধ্যে নিজের পক্ষ হতে মর্যাদাগত পার্থক্য আবিষ্কার করা অর্থহীন। ইমাম আবু হানিফা (রা.) ও গাউসুল আযম (রা.)'র মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য নির্ণয় ফলদায়ক নয়। কারণ এই দু'মহাত্মা এক বিভাগের অফিসার নন। তিনি ওলামা বিভাগের সরদার এবং ইনি আউলিয়া বিভাগের প্রধান। আউলিয়া ও মাশায়েখকে আলেমদের ছাত্র হতে হয় এবং আলেমদের জন্য রয়েছে মাশায়েখদের প্রয়োজনীয়তা। কালেক্টর এবং

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সিভিল সার্জনের মধ্যে তুলনা ঠিক নয়। কারণ তাদের লাইন ও বিভাগ আলাদা আলাদা। এটা স্মরণ রাখা জরুরী।

এও স্মর্তব্য যে, কা'বা মুয়াযযমা বায়তুল মুকাদ্দাস হতে এইজন্য উত্তম যে, ওটা সর্বপ্রথম নির্মিত। ওখানে কা'বা, মাকামে ইব্রাহীম, হাজরে আসওয়াদ ইত্যাদি রয়েছে। অনুরূপভাবে আশেকদের দৃষ্টিতে মদীনা নগর মক্কা নগর অপেক্ষা উত্তম। কেননা কা'বা, মাকামে ইবরাহীম, আরাফাত, মিনা ইত্যাদি বরযাত্রী এবং মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম হলেন বর যার উপলক্ষে এই বরযাত্রী। মক্কায় রয়েছে আল্লাহর ঘর, মদীনায় রয়েছে আল্লাহর নূর। মক্কায় রয়েছে প্রথম ঘর, মদীনায় রয়েছে প্রথম নবী-যার নবুওয়াত আদম আলাইহিস্ সালামের সৃষ্টিরও পূর্বে। মক্কাকে আবাদ করেছেন খলীলুল্লাহ এবং মদীনাকে আবাদ করেছেন হাবীবুল্লাহ।

মক্কায় আরাম করছেন বিবি হাজেরা এবং মদীনায় আরাম করছেন বিবি ফাতেমা ও আয়েশা। মক্কায় পৃথিবীবাসীদের বাৎসরিক হজ্ব হয়, মদীনায় হয় আসমানবাসী তথা ফেরেশতাদের দৈনিক হজ্ব। মক্কার দিকে উতলা হয়ে পৃথিবীর ফল আসে, মদীনার দিকে শামের যমীনকে আকৃষ্ট করে আনা হয়েছে। যেমন হাদীসে রয়েছে। মক্কার দিকে মো'মিনদের মাথা ঝুকে পড়ে, মদীনার দিকে আশেকদের জান, মাল ও অন্তর ঝুকে পড়ে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মীলাদ শরীফ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَّاٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَوْلِيَاءِ مِلَّتِهٖ وَعُلَمَاءِ اُمَّتِهٖ الرَّاشِدِيْنَ الْمُرْشِدِيْنَ اَمَّا بَعْدُ. فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَا فِىْ شَانِ حَبِيْبِهٖ تَعْظِيْمًا لَّهٗ وَتَشْرِيْفًا اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ.

صَلٰوةٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ.

کروں کیا میں بیاں شان محمد خدا خود ہے ثنا خوان محمد صلوٰۃ---

فلک ہے زیر فرمان محمد بڑی ہے عرش سے شان محمد صلوٰۃ---

بیان ان کا بیان کبریا ہے کلام حق ہے فرمان محمد صلوٰۃ---

دیکھا جائے اگر تفسیر لولاک تو ہر شی پہ ہے احسان محمد صلوٰۃ---

دو عالم کو بنایا ان کے خاطر دو عالم پہ ہے فیضان محمد صلوٰۃ---

کھوں کیو نکر نہ میں رضوان کو دربان کہ جنت ہے گلستان محمد صلوٰۃ---

چلیں جنت میں درباں سے یہ کہکر نہ رو کو ہم غلامان محمد صلوٰۃ---

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَمَا اَرْسَلْنٰکَ اِلَّا رَحْمَۃً لِّلْعَالَمِیْنَ.

مَرْحَبًا یَا مَرْحَبًا یَا مَرْحَبًا   رَحْمَۃٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ مَرْحَبًا

خاتم پیغمبراں پیدا ہوئے   افتخار انس و جاں پیدا ہوئے   مرحبا---
جن کے آنے کی خبر عیسی نے دی   وہ نبی باعزوشاں پیدا ہوئے   مرحبا---
تشنہ لب موسی تھے جن کی بات کا   وہ لب کوثر نشاں پیدا ہوئے   مرحبا---
امت آخر زماں کے واسطے   موجب امن واماں پیدا ہوئے   مرحبا---
وہ ہوئے پیدا کہ جن کے واسطے   سب زمین و آسماں پیدا ہوئے   مرحبا---
کیوں نہو افلاک پر نازاں زمیں   مرجع قدوسیاں پیدا ہوئے   مرحبا---
ہے محمد اور احمد جن کا نام   وہ شفیع مجرمان پیدا ہوئے   مرحبا---

ندا از حاملاں عرش آمد   کہ بر خیزد پے تعظیم احمد

یَا نَبِیْ سَلَامٌ عَلَیْکَ   یَا رَسُوْلْ سَلَامٌ عَلَیْکَ
یَا حَبِیْبْ سَلَامٌ عَلَیْکَ   صَلَوٰتُ اللّٰہِ عَلَیْکَ.

رحمتوں کے تاج والے   دو جہاں کے راج والے
عرش کی معراج والے   عاصیوں کی لاج والے   یانبی---

جان کر کافی سہارا   لے لیا ہے در تمہارا
خلق کے وارث خدا را   لو سلام اب تو ہمارا   یانبی---

آپ کے ہو کر جئیں ہم   نام نامی پہ مریں ہم
جب قیامت میں اٹھیں ہم   عرض اسطرح کریں ہم   یانبی---

بحر عصیاں میں سفینہ   آگیا مشکل ہے جینا
پار ہونیکا قرینہ   ہو عطا شاہ مدینہ   یانبی---

عرض ہے ہمارے آقا   جانکنی کا ہو یہ نقشہ
سامنے ہو پاک روضہ   [illegible]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مَوْلَایَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا   عَلٰی حَبِیْبِکَ خَیْرِ الْخَلْقِ کُلِّہِمِ

بَلَغَ الْعُلٰی بِکَمَالِہٖ   کَشَفَ الدُّجٰی بِجَمَالِہٖ
حَسُنَتْ جَمِیْعُ خِصَالِہٖ   صَلُّوْا عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ.

اے چہرۂ زیبائے تو رشک بتاں آزری
ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں بالا تری   بلغ العلی---
تو از پری چابک تری وز برگ گل نازک تری
وز ہر چہ گویم بہتری حقا عجائب دلبری   بلغ العلی---
ہر گز نیاید در نظر صورت ز رویت خوب تر
شمس ندانم یا قمر یا زہرۂ یا مشتری   بلغ العلی---
آفاقہا گردیدہ ام مہر و بتاں و رزیدہ ام
بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری   بلغ العلی---
عالم ہمہ نغمائے تو خلق خدا شیدائے تو
آن نرگس بے رعنائے تو آوردہ رسم دلبری   بلغ العلی---
من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی
تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری   بلغ العلی---
خسرو غریب است و گدا افتادہ در شہر شما
باشد کہ از بہر خدا سوئے غریباں بنگری   بلغ العلی---

تمت بالخیر

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.comwww.AmarIslam.com

মাওয়ায়িয-ই নঈমিয়্যাহ

দ্বিতীয় খণ্ডের

বিষয়াবলী ঃ

- উম্মতে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফযায়েল
- মীলাদ শরীফের বর্ণনা
- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রকাশের বর্ণনা
- তাওবার বর্ণনা
- ইলমে গায়ব
- নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা
- ফযায়েলে নববী
- রাসূলের আনুগত্য
- তাবাব্রুকাতের তা'যীম
- ফযায়েলে আউলিয়া
- মুনাফিকদের অবস্থা
- হুজুরের সত্তা আল্লাহরই দলীল
- ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন
- অসীলার বর্ণনা
- রাসূলের অন্তরে কষ্ট দেয়ার পরিণাম।
- ইস্তিগফারে নবী
- পৃথিবীর স্থায়িত্বহীনতার বর্ণনা
- আখলাকে রাসূল (প্রিয় নবীর মহান চরিত্র) ইত্যাদি।

www.AmarIslam.comwww.AmarIslam.com